লৌহকপাট

জরাসন্ধ

লৌহকপাট

(তৃতীয় পর্ব)

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৬৫

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

মুদ্রক—ক্ষীরোদচন্দ্র পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭ ভীম ঘোষ লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ-চিত্র
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই
বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

পাঁচ টাকা

উৎসর্গ

লৌহকপাটের অন্তরালে যারা শেষ নিশ্বাস রেখে গেল
সেই সব বিস্মৃত মানুষের উদ্দেশে

এই লেখকের

তামসী ৫·০০

লৌহকপাট ১ম ৩·৫০, লৌহকপাট ২য় ৩·৫০

এক

সংসারে 'শেষ' বলে যে একটা কথা আছে, সে শুধু কথার কথা। আসলে শেষ হয় না কিছুই। বীজের মধ্যে যেমন নবাঙ্কুর, শেষের মধ্যে তেমনই নবারম্ভ। জীবনটাকে নাটক বলতে চান, বলুন। আমার আপত্তি শুধু এক জায়গায়—সে নাটকে 'মূর্ছা ও পতন' যতই থাক, যবনিকা-পতন নেই। তার অগণিত দৃশ্য জুড়ে কেবল অন্তহীন 'প্রবেশ' ও 'প্রস্থান'।

এই আমাকে দিয়েই দেখুন। জেলখানার লোক আমি। কারা-রক্ষা এবং কয়েদি-শাসন আমার একমাত্র পবিত্র ধর্ম। একদিন কী দুর্মতি হল! শাসন-দণ্ড সরিয়ে রেখে তুলে নিলাম লেখন-দণ্ড। তারপর যেদিন ভুল ভাঙল, দেখলাম, আগাগোড়া সবটাই আমার লোকসানের পালা। না পেলাম লেখকের খ্যাতি, না জুটল শাসকের খেতাব। শুধু কি তাই? সরকারী আপিসের সতীর্থেরা হুঁকো বন্ধ করলেন, সাহিত্য-বাসরের স্বজাতিরা জাতে তুললেন না। বাঁয়ে ভ্রূকুটি, ডাইনে নাসিকা-কুঞ্চন। হাড়ে হাড়ে বুঝলাম, সরকারী চাকরির তকমা বুকে ঝুলিয়ে লক্ষ্মীর উপাসনায় বাধা নেই, কিন্তু সরস্বতীর কমলবনে প্রবেশ-নিষেধ। গিরীনদা বলতেন, বক আর কচ্ছপে কোনোদিন মিল হয় না। জোর করে মেলাতে গেলে যা দাঁড়ায়, সুকুমার রায় তার নাম দিয়েছেন বকচ্ছপ। সে এক আজব জীব, নাইদার বার্ড নর বীস্ট। কোনো দলেই তার জায়গা নেই।

তাই মনে মনে স্থির করেছিলাম, এইখানেই শেষ হোক। আমার এই তামস-লোকের অন্তরাল থেকে যে দু-চারটি বর্ণহীন ছবি নিতান্ত খেয়ালের বশে একদিন তুলে ধরেছিলাম মুক্ত দুনিয়ার মানুষের কাছে, তার উপর নেমে আসুক সমাপ্তির যবনিকা। যে পথ ধরেছিলাম, সেটা আমার নেশাও নয়, পেশাও নয়, ক্ষণিকের খেয়াল মাত্র। তার মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। ফলও পেয়েছি হাতে হাতে। অতএব রইল আমার লেখনী। ব্যাটনের জয় হোক।

কিন্তু হল না। আবার আমাকে আসতে হল। আবার এসে খুলতে হল লৌহকপাটের নিষিদ্ধ অর্গল। কেন? তা আমি জানি না। নিজেকে বারংবার প্রশ্ন করেও কোনো সদুত্তর পাই নি। এইটুকু শুধু জানি, যে কথা প্রথমেই বলেছি—অবসান বলে কোনো শব্দ নেই বিধাতার অভিধানে।

প্রত্যক্ষ কারণ না থাক, একটা কিছু আছে, যাকে উপলক্ষ করে এই পুনশ্চের আবির্ভাব। আপাতদৃষ্টিতে সেটা একখানা চিঠি। 'চিঠি' বললে তাকে বাড়িয়ে বলা হবে। খাতা-থেকে ছিঁড়ে-নেওয়া এক টুকরো কাগজে কয়েকটি মাত্র লাইন। তার মধ্যে—

যাক; সে কাহিনী যথাস্থানে বলব। আপাতত গুরুদাসবাবুর প্রসঙ্গ দিয়েই শুরু করা যাক।

গুরুদাস সমাদ্দার ছিলেন কোর্ট-ইন্সপেক্টর। অর্থাৎ পদে পুলিস, পেশায় মোক্তার। কোমরে রিভলবার বেঁধে ঘোড়া বা জীপ ছুটিয়ে ডাকাত ধরার ব্যর্থ চেষ্টা কিংবা ডজন খানেক কাঁদুনে গ্যাস নিয়ে ইষ্টকবর্ষী জনতার উপর লাফিয়ে পড়া—এই সব বড় বড় পুলিসী

ব্যাপার তাঁর কার্য-তালিকার বাইরে। তাঁর একমাত্র লড়াইয়ের ক্ষেত্র ফৌজদারী কোর্ট এবং হাতিয়ার ইণ্ডিয়ান পিনাল কোড। আসল উকিল-মোক্তারদের সঙ্গে কোর্টবাবুর তফাত শুধু পোশাকের। তাঁদের সাদা পেন্টুলন, কালো কোট, আর ওঁর ছিল খাকী টিউনিকের উপর শ্যাম-ব্রাউন বেল্‌ট্‌, তার উপরে ক্রাউন-মার্কা হেলমেট। এই জাঁদরেল পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে পালিশ-উঠে-যাওয়া নড়বড়ে টেবিলের উপর বিপুল মুষ্ট্যাঘাত করে যখন হুঙ্কার ছাড়তেন—ইওর অনার, কে বলবে ল কলেজ দূরে থাক, একটা সাধারণ কলেজের চৌকাঠও কোনোদিন লঙ্ঘন করেন নি সমাদ্দার সাহেব। সাবেকী আমলের এনট্রান্স-ফেল। ভগ্নীপতি ছিলেন দারোগা। তাঁরই তদ্‌বিরের জোরে এল. সি. অর্থাৎ লিখিয়ে কনস্টেবল-রূপে প্রথম প্রবেশ। তারপর ক্রমে ক্রমে জমাদার এবং ছোট ও বড় দারোগার সিঁড়িগুলো অতিক্রম করে কাঁচাপাকা গোঁফ এবং মাথাজোড়া টাক নিয়ে কোর্টবাবুর গদি। সংক্ষেপে এই হল সমাদ্দার সাহেবের চাকরি-জীবনের ইতিবৃত্ত।

কোর্ট-পুলিসের দপ্তরে বড় থেকে ছোট সকলেই ইন্সপেক্টরবাবুর মতো হাফ-পুলিস! পোশাক আছে, প্রতাপ নেই। হাবিলদার বা সিপাই যে কজন থাকে তাদের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে, রিজার্ভ লাইনের ধাক্কা কিংবা কোতোয়ালি থানার ধকল সইতে পারে নি বলেই ওইখানটা ওদের শেষ পরিণতি। একজন সুরসিক হাকিমকে একবার বলতে শুনেছিলাম, কোর্ট-পুলিসের ক্যাম্প হল পুলিস-ফোর্সের পিঁজরাপোল। কথাটার মধ্যে অতিভাষণ হয়তো কিছু আছে, কিন্তু সত্যের অপলাপ নেই।

কোর্টবাবুর এই ক্ষুদ্র বাহিনীই হচ্ছে জেল আর পুলিসের ভিতরকার সূক্ষ্ম হাইফেন। নটা বাজবার আগেই কোনোরকমে একটা উর্দি চড়িয়ে হাবিলদার আর তার জনকতক অনুচর জোড়া কয়েক হাতকড়া এবং দড়ি হাতে নিতান্ত ঢিলেঢালা মেজাজে পান চিবোতে চিবোতে উঠবে গিয়ে জেল-আফিসের বারান্দায়। কেউ কেউ আবার সেইখানেই একটু গড়িয়ে নেয়। মাঝে মাঝে রাইটারদের* তাগিদ দেয়, লাট সাহেবদের খানা হল? লাট সাহেব মানে ওইদিন যারা কোর্টে যাবে সেই সব হাজতী আসামী। হাজতের মেট যথাসময়ে তাদের হাজির করবে জেল-ডেপুটিবাবুর সেরেস্তায়। নাম ডাকা হবে ওয়ারেণ্ট ধরে ধরে। তারপর একটা হাতকড়ায় দুজন দুজন করে গেঁথে কোমরে মোটা দড়ি বেঁধে হাবিলদার সাহেব সদলবলে যাত্রা করবেন কাছারির উদ্দেশে। এই বিচিত্র প্রসেশন যখন রাস্তা দিয়ে চলে, কৌতূহলী পথিক পাশ কাটিয়ে যাবার সময় একটু মুচকি হেসে মন্তব্য করে তার সঙ্গীর কানে কানে, কতগুলো চোর যাচ্ছে দেখেছ? 'চোরে'রা সে সব বড় একটা গায়ে মাখে না। গল্প করতে করতে এগিয়ে যায়। বড় জোর গায়ের চাদর দিয়ে মাথাটা ঢেকে নেয়, চেনা লোকের চোখ এড়াবার জন্যে।

কোর্ট-হাজতের খবরদারি এবং দরকারমত সেখান থেকে আসামী-দের নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন কোর্টের কাঠগড়ায় তোলা—-সে-সবও ওদের কাজ—ওই হাবিলদার আর তার দলবল। তারপর দিনের শেষে ওরাই আবার দড়ি-বাঁধা প্রসেশন নিয়ে জেলখানার পথ ধরে।

---

*Writer অর্থাৎ লেখাপড়া-জানা কয়েদি, যারা আপিসের কাজে সাহায্য করে।

শোভাযাত্রা এক হলেও, যাত্রীরা সব এক নয়। সকালবেলা যারা এই পথ ধরে গিয়েছিল, তাদের কারও কারও ভাগ্যে জুটেছে মুক্তি, তার জায়গা পূরণ করেছে নতুন মুখ। এ দৃশ্য অনেক দিন আমার নজরে পড়েছে, এবং প্রতিবারই নিজের মনকে প্রশ্ন করেছি, চোর ডাকাত খুনী বদমাশ পকেটমারদের এই যে বিচিত্র মিছিল, এদের চেয়ে শান্তিপ্রিয় জীব আমাদের সভ্য এবং ভদ্রসমাজে আছে কি? ইচ্ছা করলেই যে-কোনো মুহূর্তে গুরুদাসবাবুর পিঁজরাপোলের ওই কৃষ্ণের জীব কটিকে ধূলিসাৎ করে ওরা মুক্ত বিহঙ্গের মতো উধাও হয়ে যেতে পারে। যায় না কেন? তার কারণ বোধ হয় ওই নিরীহ মানুষ কটার উপর এদের এক ধরনের অদ্ভুত অনুকম্পা। এই 'চোর'-গুলোর হাতেই যে তাদের প্রহরীবাহিনীর অন্নের থালা।

সেইদিনকার কথাই বলি। সাতটা বেজে গেছে। জেলখানার নৈশ আপিস সরগরম। ডেপুটি জেলার রতনবাবুর হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে—নাম কেয়া? বাপকা নাম? কাঁহা ঘর? চীজ বাতাও—। নবাগত আসামী এবং কয়েদীদের নাম-ধাম মিলিয়ে নিচ্ছেন ওয়ারেণ্টের সঙ্গে, এবং তারই উপরে লিখে নিচ্ছেন ওদের চীজ অর্থাৎ কাপড়-চোপড় জিনিসপত্রের তালিকা। পাশের ঘরে বসে আমি ক্যাশবুক চেক করছি। টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে হেডক্লার্ক এগিয়ে ধরছেন ভাউচার এবং অন্যান্য কাগজপত্র। 'সুপার'-এর রবারস্ট্যাম্প যেখানে যেখানে আছে, তার নীচে ছোট্ট করে লিখে দিচ্ছি একটা করে এম. সি.—মলয় চৌধুরীর সংক্ষিপ্তসার। কাল সকাল-বেলা সই করবার সময় ওই ধোবী-মার্কটুকু না দেখলে আমার মেজর আই. এম. এস. মনিব ওই মোটা খাতাটা ছুঁড়ে মারবেন হেডক্লার্কের

মুখের উপর! হাজার দেড়েক টাকার বিনিময়ে এই জেলখানার কর্তৃত্ব গ্রহণ করেই তিনি আমাদের কৃতার্থ করেছেন। তার উপরে আবার দায়িত্ব? অসম্ভব। সে বোঝা বইবে এই তিন শো টাকার জেলার। তারই নিদর্শন ঐ এম. সি.। ওই দুটো তুচ্ছ অক্ষরের খুঁটির উপর ভর করেই তিনি অন্ধবেগে চালিয়ে যাবেন তাঁর মূল্যবান স্বাক্ষরের এঞ্জিন! ওইটুকু দেখতে পেলেই তিনি নিশ্চিন্ত। জানবার, বুঝবার, ভাববার তাঁর কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই।

গুড্ ঈভনিং, মিস্টার চৌধুরী।

গুড্ ঈভনিং। আসুন, আসুন। এত রাত্তিরে কী ব্যাপার?

গুরুদাসবাবু চেয়ারটা টেনে নিয়ে তার উপর গা এলিয়ে দিয়ে মুখে একটা শব্দ করে বললেন, পুলিসের আবার রাত্তির! আসামী নিয়ে এলাম।

আসামী নিয়ে! আসামীরা আজকাল ইন্সপেক্টরের কাঁধে চড়ে আসে নাকি?

ইন্সপেক্টর তো ছার! তেমন তেমন আসামী আই. জি. পুলিসের ঘাড়েও চড়ে।

উত্তরে একটা কী বলতে যাচ্ছিলাম। দরজার দিকে নজর পড়তে থেমে গেলাম। হাবিলদারের সঙ্গে যাকে ঢুকতে দেখলাম, তিনি আসামী নন—আসামিনী। চলবার ভঙ্গীটা বেশ সপ্রতিভ। বেশ-ভূষা সাধারণ, কিন্তু তার মধ্যে রুচির পরিচয় আছে। স্ত্রী-জাতির বয়স নির্ধারণে আমি চিরদিনই ভুল করে থাকি। তবে এই মেয়েটির তারুণ্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। সমাদ্দার বসে ছিলেন দরজার দিকে পেছন করে। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে মাথা

ঘুরিয়ে তাকালেন এবং বিরক্তির সুরে বললেন তাঁর হাবিলদারকে লক্ষ্য করে, এখানে আনতে কে বলল তোমাকে ? ও-ঘরে নিয়ে যাও।

ওরা সরে যাবার পর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলাম সমাদ্দারের দিকে। উনি জবাব দিলেন—একরারী আসামী। থানা থেকে পাঠিয়েছিল কন্‌ফেশন রেকর্ড করবার জন্যে। করে ফেললেই চুকে যেত। কিন্তু আমার এস. ডি. ও. সাহেব এক ফ্যাকড়া তুললেন। কোথায় নাকি কী গোলমাল আছে ! যে অপরাধ ও নিজের ঘাড়ে নিতে চাইছে আসলে সেটা ও করে নি ! আমার ওপর হুকুম হল, নিজে সঙ্গে করে রেখে আসুন জেলখানায়। আরও খানিকটা ভাবতে দিন। আপনাকেও বলতে বলেছেন সাবধানে-টাবধানে রাখতে, কেউ আবার বিগড়ে না দেয় !

গলা খাটো করে চোখে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়ে যোগ করলেন গুরুদাসবাবু, আসল ব্যাপার তো বুঝতেই পারছেন। সেই চিরন্তন রূপের খেলা। কিন্তু বাইরে যারা ভোলায় ভেতরে তারা ফাঁসায়—এ জ্ঞান তো এখনও হয় নি। হাকিম হলেও বয়স অল্প।

কেসটা কী ?—খুন-টুন নাকি ?- -মাঝখানে প্রশ্ন করে বসলাম।

খুন না হলেও তার চেয়ে এককাঠি সরেস। ব্ল্যাকমেলিং। রূপের ফাঁদ পেতে রুপো ধরার ফন্দি।

ভালো ব্যবসা। কিন্তু কন্‌ফেস্‌ করছে কেন ?

কী জানি, মশাই ! জড়িয়ে-টড়িয়ে পড়েছে হয়তো কারও সঙ্গে। যাক, আপনি কাজ করুন। আমি উঠি। হাকিম না ছাড়লে কাল সকালেই আবার ছুটতে হবে তো। চাকরি মন্দ হয় নি। কী

বললেন ?—মুখে বিরক্তি দেখিয়ে খুশী মনেই প্রস্থান করলেন সমাদ্দার সাহেব।

মিনিট কয়েক পরেই সেই হাবিলদার এসে জানাল, মেয়েটি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আনতে বলে দিলাম। স্বচ্ছন্দ লঘু পায়ে এগিয়ে এসে, বাধা দেবার আগেই আমার পায়ের ধুলো নিয়ে হাসিমুখে বলল, আপনি এখানে কবে এলেন ?

তুমি চেন নাকি আমাকে ?—বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করলাম।

বাঃ, চিনি না ! সে চেহারা নেই। তবু ঘরে ঢুকেই আমি চিনতে পেরেছি।

একটু থেমে আবার বলল, আপনার নিশ্চয়ই মনে নেই আমার কথা। কেমন করে থাকবে ? কত বচ্ছর হয়ে গেল !—কেমন একটা উদাস সুর লাগল ওর শেষের কথাটায়। মুখের উপর ঘনিয়ে এল কোন্ দূরাগত অতীত দিনের ছায়া। আমি তখন প্রাণপণে হাতড়ে চলেছি মনের মধ্যে, কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না—কবে কোথায় যেন দেখেছি, ওই টানা ভ্রূর তলায় ভাসা-ভাসা চঞ্চল দুটি চোখ, বাঁ দিকের গালে ছোট্ট সুন্দর একটি তিল, পাতলা ঠোঁটের নীচে অপরূপ চিবুকের রেখা।

কয়েক মূহূর্ত অপেক্ষা করল মেয়েটি। হয়তো বুঝতে চাইল, আমি চিনতে পেরেছি কি না। তারপর বলল, তখন আপনি কুমিল্লায়। সভাপতি হয়ে গিয়েছিলেন মণিমেলার উৎসবে। একটা মেয়ে কপালে চন্দন আর গলায় বেলফুলের গোড়ে দিয়ে বরণ করেছিল মনে পড়ে ? তারপর আপনার পাশটিতে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করেছিল—"বন্দী বীর"। খুব সুখ্যাতি করেছিলেন আপনি।

ও-ও, তুমি সেই অপর্ণা ?

নামটা এখনও মনে আছে আপনার !—বিস্ময়ে আনন্দে উচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠল মেয়েটি।

অথচ মানুষটাকে ভুলে গেছি। তাই হয়। নাম ঠিকই থাকে, মানুষ বদলে যায়।···কী করব, বলো ? কোথায় সেই রোগা ছিপছিপে দশ-এগারো বছরের ফ্রকপরা মেয়ে, আর কোথায়—

পূর্ণাঙ্গ-যৌবনা অপর্ণার দিকে চেয়ে কথাটা শেষ না করেই থেমে গেলাম। সুন্দর মুখখানা নেমে এল নীচের দিকে, এবং তার উপর হঠাৎ ছুটে এল এক ঝলক রক্তের আভা। প্রসঙ্গটার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, এবার সবটাই মনে পড়েছে। সভার মাঝখানে হঠাৎ ঝড় এসে পড়ায় খুব বেঁচে গিয়েছিলাম সেদিন। সভাপতির ভাষণটা আর দিতে হয় নি।

তা হয় নি ; তবে তার বদলে একদল শ্রোতাকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিতে হয়েছিল।—বলে খিলখিল করে হেসে উঠল অপর্ণা।

তাতে বরং লাভই হয়েছিল সভাপতির। চা আর গরম গরম পাঁপরভাজা খাইয়েছিলেন তোমার মা।

ঈশ! মার কথায় বুঝি রাজী হয়েছিলেন আপনি ? কত সাধাসাধি! কিছুতেই খাবেন না। তারপর বলে বসলেন, অপর্ণা যদি করে দেয়, তবে খেতে পারি। আমি তো ভয়ে মরি। চা করতে কি শিখেছি তখন! দুধ আর চিনি দুটোই বেশী দিয়ে ফেলেছিলাম। আপনি কিন্তু বলেছিলেন, খুব সুন্দর হয়েছে।

বলেছিলাম নাকি ?

আরও কী কী বলেছিলেন, সব আমার মনে আছে। কাছে ডেকে আমার পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন, বড় হয়ে কী হতে চাও? আমি সঙ্গে সঙ্গে জোর গলায় জবাব দিয়েছিলাম, ডাক্তার। আপনি আমার মুখের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে বলেছিলেন, ডাক্তার কেন, তুমি হবে রাজরানী। হেসে উঠেছিলাম, রাজরানী! হ্যাঁ, এমনই একটা ছোট্ট রাজ্যের রানী—বলে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন কিন্তু আপনার কথার ঠিক মানেটা ধরতে পারি নি। তবু ভারি মিষ্টি লেগেছিল, ছোটদের জন্যে লেখা আপনার সেই গল্পগুলোর মতো। আমার চেয়েও খুশী হয়েছিল মা। আস্তে আস্তে কেমন ধরা-ধরা গলায় বলেছিল, সেই আশীর্বাদ করুন। আমি যেন দেখে যেতে পারি। বড় হয়ে বুঝলাম, আমার মনের কথাই বলেছিলেন সেদিন। বোধ হয় সব মেয়ের মনের কথা। একটি ছোট্ট রাজ্য, একান্তভাবে আমার; আমি তার রানী। এর চেয়ে বড় সাধ আর কী আছে মেয়েদের জীবনে! কিন্তু কই, আপনার সে আশীর্বাদ তো ফলল না! —অপর্ণার মৃদুকণ্ঠ ভারী হয়ে উঠল। ভিজে উঠল চোখের পাতা। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে মুখে মৃদু হাসি টেনে এনে বলল, আপনার কাজের ক্ষতি হল। এবার আমি যাই। কাল সকালে আসতে পারব একবার?

বললাম, সকালে আমি বড্ড ব্যস্ত থাকি।

তা হলে বিকেলে?

কাল তো তোমার কোর্টে যাবার দিন।

তা হোক, তবু আপনার কাছে আসতেই হবে একবার। আমার যে অনেক কথা বলবার আছে।

একটুখানি অপেক্ষা করল। তারপর, বোধ হয় আমার কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে তরল কণ্ঠে বলল, আচ্ছা, সত্যি বলুন তো, দশ বছর আগে সেই যে আমাকে দেখেছিলেন, তারপর কেমন করে কোন্ পথ ধরে এখানে এসে দাঁড়ালাম, সে-সব কথা জানতে আপনার একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না ?

তোমার বাবা কোথায় আছেন ?

জানি না।

মা ?

মা নেই ।

দেখে মনে হচ্ছে, তুমি খুব ক্লান্ত। এখন যাও, যা হোক কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়ো গে।

আমার কথার জবাব না দিলে আমি কখ্খনো যাব না।—ছেলেমানুষের মতো মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে অভিমানের সুরে বলল অর্পণা।

হাসবার চেষ্টা করে বললাম, কী জবাব দেব, বলো ? এটা তো বুঝতেই পারছি, এখানে যখন এসে পড়েছ, যে পথ দিয়ে এসেছ সেটা সরল নয়, সুখেরও নয়। তার বেশী জেনে আর কী লাভ ?

উত্তরে একটা কী বলতে যাচ্ছিল অপর্ণা। পিছনে বুটের আওয়াজ শুনে থেমে গেল। সশব্দে ঘরে ঢুকল চীফ হেডওয়ার্ডার। বুট এবং সেলাম ঠুকে রিপোর্ট দাখিল করল—বাবাট্ আদমি কাছারিসে আয়া। একষাট্ বন্ধ্ হো গিয়া। আউর—। রিপোর্ট অসমাপ্ত রেখে তাকাল অপর্ণার দিকে। বললাম, ওকেও নিয়ে যাও। জমাদারনীকে একবার—

জমাদারনী হাজির হ্যায়, হুজুর।

সিনিয়র ফিমেল ওয়ার্ডার পিছনেই ছিল। এগিয়ে এসে সেলাম করল। জিজ্ঞাসা করলাম, খাবারদাবার আছে তো?

আছে, বাবা। এক ফাইল ভাত, দুটো কম্বল, থালা বাটি সব ঠিক আছে।

অপর্ণার দিকে তাকালাম। ইঙ্গিত বুঝতে পারল এবং আর কোনো কথা না বলে, ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল জমাদারনীর সঙ্গে।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত দশ- বছর পিছনে ফেলে-আসা একটি কালবৈশাখী সন্ধ্যা আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল। মণিমেলার বার্ষিক উৎসব। প্রধান উদ্যোক্তা একদল কিশোর-কিশোরী। নিমন্ত্রণ-পত্রে সময় রয়েছে চারটে। সওয়া চারটেয় গিয়ে দেখি, সভামণ্ডপের সাজ-সজ্জা সবে শুরু হয়েছে। সভাপতির আসনের চারদিকে রঙিন কাগজের শিকল জড়ানো তখনও শেষ হয় নি। অগত্যা কাছাকাছি এক ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় আশ্রয় নিলাম। ছেলেমেয়েদের অবাধ্যতা এবং সেই সঙ্গে জিনিসপত্রের দুর্মূল্যতা সম্বন্ধে গবেষণা চলতে লাগল। ঘণ্টাখানেক পরে ডাক পড়ল। যথারীতি মাল্যদান এবং বরণ ইত্যাদির পর কার্যসূচীর প্রথম দফা ঘোষণা করতে যাচ্ছি, একটি পাণ্ডা-স্থানীয় ছেলে কানে কানে জানিয়ে দিল, উদ্বোধন-সঙ্গীত গাইবে যে মেয়েটি, হঠাৎ সর্দি লেগে তার গলাটা বসে গেছে, আধ ঘণ্টা সময় নিয়েছেন ডাক্তার। বিকল্প হিসাবে আর কাউকে পাওয়া যাবে কি না, প্রস্তাব করতেই ছেলেটি

হেসে বলল, তা কী করে হয়, স্যার? এক মাস ধরে কত আশা করে রিহার্সাল দিচ্ছে নমিতা! অতএব নিরুপায়। গায়িকার গলা বসে গিয়ে সভাকেও একেবারে বসিয়ে দিয়ে গেল।

আধ ঘণ্টা পরে নমিতার গলায় সুরের আলো যেমন জ্বলে উঠেছে, বিদ্যুতের আলো গেল নিবে। শুরু হল হট্টগোল। তার মধ্যে নিঃশব্দে বসে আছি। সেই ছেলেটি এসে বার বার বিনয় প্রকাশ করতে লাগল, আপনার বড় কষ্ট হল, স্যার। আর পাঁচ মিনিট। হঠাৎ পাশ থেকে কলকণ্ঠে বলে উঠল একটি কিশোরী, তাতে আর কী হয়েছে! সেবার তো এর চেয়েও কষ্টে পড়েছিলেন বর্ধমানে। খবরটা জানা ছিল না। জানতে চাইলাম, কোন্ বার?

কেন, আপনার গল্পেই তো আছে। পাঁচটায় সভা; গিয়ে দেখেন, কেউ নেই; সব লোক গেছে সার্কাস দেখতে। প্রথম শো ভাঙবার পর নটার সময় শুরু হল ফাংশান। তারপর—বেশ লিখেছেন কিন্তু,—'সারা রাত আর কোনও খাবার না জুটলেও একটা জিনিস প্রাণভরে খেয়েছিলাম। সেটা হচ্ছে মশার কামড়।'

চপল কণ্ঠের মিষ্টি হাসির রোল ভরে দিল অন্ধকার সভামঞ্চ। মনে পড়ল, উত্তম পুরুষের জবানিতে এইরকম একটা গল্প লিখেছিলাম বটে ছেলেদের মাসিক পত্রে। কিন্তু গল্প যে শুধু গল্প, সেটা আর যেখানেই হোক, এই বয়সের ছেলেমেয়েদের বোঝাতে যাওয়া বিড়ম্বনা। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, কোথায় যেন পড়েছিলাম, একজন খ্যাতনামা আধুনিক সাহিত্যিকের কথা। বলছেন, নিজেকে নায়ক করে প্রেমের গল্প লেখার বিপদ অনেক। বন্ধুরা একবর্ণও বিশ্বাস করে না, কিন্তু গৃহিণী সবটাই বিশ্বাস করে বসেন। এ বিষয়ে আমার

নিজের অভিজ্ঞতাও কম করুণ নয়। সাম্প্রতিক ঘটনা। প্রৌঢ় বয়সে যৌবনের স্মৃতি মন্থন করতে গিয়ে একটি চঞ্চলা পাহাড়ী কিশোরীকে আশ্রয় করে কিঞ্চিৎ রোমান্স-সৃষ্টির চেষ্টা করেছি। বন্ধুরা অনেকে অনেক সরস মন্তব্য করেছেন। সহাস্যে উপভোগ করেছি। হঠাৎ একদিন আমার কলেজ-গামী পুত্রের জনৈক সহপাঠী এসে সাগ্রহ প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা জ্যাঠামশাই, কার্শিয়ং স্টেশনে সেই যে চলে গেল, তারপর কাঞ্চির সঙ্গে আর আপনার দেখা হয় নি ?'

তাই বলছিলাম, উত্তম পুরুষের বিপদ সর্বত্র। যাক সে কথা।

যথাসময়ে, অর্থাৎ বিজ্ঞাপিত সময়ের ঘণ্টা দুই পরে সভার কাজ শুরু হল। দেড়-হাত-লম্বা ঠাসবুনানী প্রোগ্রাম। মাঝামাঝি পৌঁছবার আগেই চারদিক আঁধার করে এল ঝড়। সঙ্গে সঙ্গে আর-এক দফা আলো নেবার পালা। উঠব কি উঠব না স্থির করবার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ল বৃষ্টি। আমার আসন ছিল একটা বারান্দায়। তার সামনে খোলা উঠানে শামিয়ানা টাঙিয়ে শ্রোতাদের বসবার জায়গা। কড়কড় শব্দে কোথায় বাজ পড়ল। তার সঙ্গে সঙ্গে চোখ-ঝলসানো বিদ্যুৎচমক। সেই আলোতে দেখলাম, মণিমেলার চিহ্ন-মাত্র নেই। কয়েকটি মণি-ভাইবোন শুধু বসে আছে আমার চারদিক ঘিরে। বাজ পড়ার শব্দে একেবারে গা ঘেঁষে এগিয়ে এল। এরাই বোধ হয় সভার উদ্যোক্তা। তাই সভাপতিকে ফেলে পালাতে পারে নি, কিংবা দূরের বাসিন্দা বলে পালানো সম্ভব হয় নি। সেই ছেলেটিকে লক্ষ্য করলাম। তার দায়িত্বই তো সবচেয়ে বেশী। কী একটা বলতে এসেছিল, এমন সময় ডান দিক থেকে কিশোর কণ্ঠের অনুরোধ —একটা গল্প বলুন না ? চারিদিক থেকে সমবেত সমর্থনে আমার

ক্ষীণ আপত্তি তলিয়ে গেল। শুধু সমর্থন নয়, তার সঙ্গে সংশোধন—বেশ বড় গল্প কিন্তু, আর বেশ মজার। অতএব শুরু হল গল্প। অন্ধকারে শ্রোতৃবৃন্দের মুখ দেখা গেল না, কিন্তু আমার মুখের উপর অনুভব করলাম তাদের উজ্জ্বল চোখের নীরব স্পর্শ।

গল্প যখন শেষ হল, ঝড় পড়ে গেছে, কিন্তু বৃষ্টি বন্ধ হয় নি। আমার সঙ্গে একটা ঘোড়ার গাড়ি ছিল। ভুলেই গিয়েছিলাম এতক্ষণ। এবার গাড়োয়ানের তাগিদে সজাগ হয়ে উঠলাম। সেই ছেলেটি, বোধ হয় ওদের মধ্যমণি, সবিনয়ে প্রস্তাব করল, আমার পাড়ার কাছাকাছি থাকে এমনি গুটিকয়েক ছেলেমেয়েকে পৌঁছে দেবার ভার আমাকে বহন করতে হবে। না করে উপায় কী? কিন্তু গাড়োয়ান বেঁকে বসল, এবং ডবল বকশিশ কবুল না করা পর্যন্ত সোজা হল না। দুর্গা বলে রওনা দেওয়া গেল। তখন খেয়াল হয় নি, গাড়ি তো গাড়োয়ান একা চালায় না! আরও দুটি প্রাণী আছে তার সহচর। তাদের সঙ্গে কোনো বন্দোবস্ত হয় নি। ফলে খানিকক্ষণ চলবার পর তারা হঠাৎ নিশ্চল হয়ে গেল; খবরের কাগজের ভাষায় যার নাম 'অবস্থান ধর্মঘট'। শাসন এবং তোষণের মিলিত প্রয়োগ নিষ্ফল হবার পর বকশিশের মাত্রাটা আর-এক টাকা বাড়িয়ে দিলাম। চালকের মুখ থেকে সে কথা শোনামাত্র তার বাহনযুগল আবার সচল হলেন। তাদের এই প্রভুভক্তিটা এমন অর্থপূর্ণ যে আমার কিশোর সহযাত্রীদের কলহাস্যে অন্ধকার নির্জন পথ মুখর হয়ে উঠল।

সবাইকে পৌঁছে দেবার পর শেষ বাড়িটি অপর্ণাদের। ওর মা বাইরে এসে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। তার পরের কথা আগেই বলা হয়েছে। ওর বাবা ছিলেন ওখানকার জজ কোর্টের উকিল।

পসার এবং প্রতিষ্ঠা প্রথম শ্রেণীর। ভদ্রলোক বাড়ি ছিলেন না। আমাদেরই মতো কোথাও বোধ হয় আটকা পড়ে গিয়েছিলেন। মহিলাটির দেহের স্বাস্থ্য, শ্রী এবং অলংকার লক্ষ্য করবার মতো। বিশেষভাবে নজরে পড়েছিল তাঁর মুখের সেই পরিতৃপ্ত হাসিটুকু। এক মুহূর্তেই বুঝেছিলাম, পরিবারটি শুধু সম্পন্ন নয়, সুখী। অপর্ণা ওঁদের একমাত্র সন্তান। মায়ের মতো সেও একদিন এমনি একটা সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্যভরা সংসারের রাজ্যভার হাতে তুলে নেবে, সেইটাই সহজ এবং স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল। ডাক্তারের মতো পরের ঘরের স্বাস্থ্য নিয়ে স্বাস্থ্যক্ষয় নয়, তার হাতে থাকবে নিজের ঘরের স্বাস্থ্য এবং শ্রী ফুটিয়ে তোলার পবিত্র ভার। তাই বোধ হয় আমার মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে গিয়েছিল, ডাক্তার নয়, তুমি হবে রাজরানী। তার মা খুশী হয়েছিলেন। সে নিজেও কম খুশী হয় নি। কিন্তু আমাদের সেদিনকার সেই সমবেত শুভকামনা সফল হয় নি। রাজ্যপাট পায় নি অপর্ণা। পেলেও কেড়ে নিয়ে গেছে কোন্ অলক্ষ্য অদৃষ্টের অভিশাপ! হারিয়ে গেছে রানীর সিংহাসন! ছন্নছাড়া রিক্ত বেশে আজ সে আমার দুয়ারে প্রবেশপ্রার্থিনী!

জেলখানার লোক আমি। এই পাষাণ-পুরীর পাঁচিলের মধ্যে কাটিয়ে দিলাম সারাজীবন। এক জেল থেকে আর-এক জেলে ঘুরেছি, আর দেখেছি মসী-কলঙ্কিত মানুষের মিছিল—জীবনের রাজপথ যাদের ডাক দেয় নি, কিংবা ডাক দিয়েও সাড়া পায় নি; রিপুর তাড়না অথবা ভাগ্যের প্রতারণা যাদের টেনে নামিয়ে নিয়ে গেছে এমন এক আঁধার সর্পিল পিচ্ছিল পথে, যার শেষ প্রান্ত এই লৌহতোরণ। সে পথে চলতে গিয়ে কারও গায়ে লেগেছে পাঁক,

কারও পায়ে ফুটেছে কাঁটা, নর্দমার বিষ-বাষ্পে কারও বা বিষিয়ে গেছে নিশ্বাস। সমাজ ও সভ্যতার লৌহ-পেষণ তাদের দেহ থেকে নিংড়ে নিয়েছে স্নেহ প্রীতি দয়া মায়া; ঘৃণা লাঞ্ছনা, আর শাসনের সাঁড়াশি চালিয়ে বুকের ভিতর থেকে উপড়ে নিয়েছে মানবতার শেষ অঙ্কুর। সেই বিবর্তনের গভীর চিহ্ন আমি দেখেছি ওদের মুখের প্রতিটি রেখায়। কিন্তু আমার অন্তরে আজ আর তার ছাপ পড়ে না। তার পিছনে যে ইতিহাস, তার জন্যেও জাগে না কোনো কৌতূহল। অভ্যাসের বশে সেই কথাটাই জানিয়ে দিয়েছি অপর্ণার প্রশ্নের উত্তরে। মনে মনে বলেছি, যে পথ দিয়ে তুমি এসেছ, তার সাধারণ চেহারাটা আমার চেনা। বিশেষ যেটুকু, তা দিয়ে আমার প্রয়োজন নেই। সে কাহিনী তোমার শুনতে চাই না।

কিন্তু এইটাই কি আমার অন্তরের কথা? গভীর রাত্রির অন্ধকারে নিজের মনের সঙ্গে যখন মুখোমুখি হবার অবসর হল, পরম বিস্ময়ে দেখলাম, ওই মেয়েটার ক্লান্ত ম্লান চোখ দুটো কোথায় যেন একটু দাগ রেখে গেছে আমার শুষ্ককঠিন অন্তস্তলের কোণে। দশ বছর আগে যে সুস্থ সুন্দর পরিবেশে তাকে প্রথম দেখেছিলাম, সেই ছবিটা আজ চোখের উপর থেকে কিছুতেই নড়তে চাইল না।

পরদিন সকালেই আবার এলেন গুরুদাসবাবু। সঙ্গে নিয়ে এলেন অপর্ণাকে কোর্টে হাজির করবার হাকিমী ওয়ারেণ্ট। আমদানী-সেরেস্তার ডেপুটিবাবু যথারীতি তার ব্যবস্থা করলেন। অর্থাৎ যথাসময়ে সে চলে গেল কোর্টে। সঙ্গে গেল আমাদের একজন ফালতু ফিমেল ওয়ার্ডার। নারী-আসামীকে জেল থেকে কোর্টে

পাঠাতে হলে পুরুষ-পুলিসের সঙ্গে নারী-পাহারার বিধান দিয়েছেন জেল-কোড। সে শুধু প্রহরিণী নয়, সঙ্গিনী। কিন্তু ওই আসামী যখন প্রথম আসে জেলখানায়, এবং তার আগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে কোর্ট-হাজতের নির্জন কোণে, তখন তার সঙ্গদান এবং নিরাপত্তার সবটুকু ভার নেয় পুরুষ-কনস্টেবল।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল, কোনো জেলের ফিমেল ওয়ার্ডে একটি সদ্য-আমদানী মুখরা মেয়ের পাল্লায় পড়েছিলাম। কাহিনী যা শুনিয়েছিল, এমন কিছু নতুন নয়। বাংলা কাগজ খুললে ওই-জাতীয় ঘটনা রোজ না হলেও প্রায়ই চোখে পড়ে থাকে। ভোরবেলা ঘুম থেকে জাগিয়ে গ্রামের বাড়িতেই ওকে গ্রেপ্তার করা হয়, কী এক বাসন-চুরির মামলায়। দশ-বারো মাইল দূরে থানা। জনবিরল মাঠের মধ্য দিয়ে পথ, মাঝে মাঝে জঙ্গল। বাউরীদের ঘরের কুমারী মেয়ে। বয়স পনেরো-ষোলো। কোনোদিন গ্রামের বাইরে যায় নি। ওর বাপ বা ভাই একজন কেউ সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু পুলিসের জমাদার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নি। ওই জমাদার এবং তার একটি সিপাইয়ের হেফাজতে পড়ন্ত বেলায় যখন সে থানায় গিয়ে পৌঁছল, তখন আর তাকে কুমারী বলা চলে না। তারপর কোর্ট-হাজত। চারদিকে লালসাদীপ্ত শতচক্ষুর অভিনন্দন। একটি নিতান্ত জৈব প্রয়োজনের তাগিদ তীব্রভাবে অনুভব করলেও মুখ ফুটে বলতে পারে, এমন একখানা মুখও তার চোখে পড়ে নি। কোর্ট থেকে পায়ে হাঁটিয়ে যখন তাকে জেলের দিকে নিয়ে যাওয়া হল, তার আগেই সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। অন্ধকারের সুযোগ পেয়ে সেই বিশেষ প্রয়োজনটি তাকে মাঠের মধ্যেই সেরে নিতে হয়েছিল। সঙ্গের পুলিসটিকে একটু সরে

যেতে অনুরোধ করেছিল কিন্তু চুরির আসামীকে অরক্ষিত অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া যায় কেমন করে? তাই সরে যাওয়া দূরে থাক, একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পুরুষ রক্ষী তাঁর পৌরুষ রক্ষা করেছিলেন। বাকী রাস্তাটুকু আরও যে-সব ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কুমারী-জীবনের চরম অভিজ্ঞতার পর সেগুলো নেহাত উপরি-পাওনা।

ওর সামনেই আর-একটি মেয়ে-আসামী তখন কোর্টে যাবার আয়োজন করছিল। জেলখানার ফালতু জমাদারনী অপেক্ষা করছে তাকে নিয়ে যাবার জন্যে। সেই সব লক্ষ্য করে বলেছিল মেয়েটি, এই যে বন্দোবস্ত আপনারা করে দিলেন বাবু, এমনি একটা মেয়েছেলে যদি সেদিন আমার সঙ্গে থাকত, তা হলে বোধ হয় ওরা আমার—

কথাটা তার মুখে বেধে গিয়েছিল। চোখের জলও সামলাতে পারে নি।

আমি বলেছিলাম, এ বন্দোবস্ত তো আমরা করি নি। এটা বরাবরকার সরকারী ব্যবস্থা।

এর পরেই জিজ্ঞাসা করেছিল মেয়েটি, কিন্তু ওখানে কি সরকার নেই?

সে প্রশ্নের জবাব সেদিনও দিতে পারি নি, আজও পারি না।

সেদিন সন্ধ্যা হবার আগেই ফিরে এল অপর্ণা। এবার সে দস্তুরমত confessing accused বা একরারী আসামী। ওয়ারেণ্টের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা—To be kept segregated. সবার থেকে আলাদা রাখার নির্দেশ। যে স্বীকারোক্তি সে করে এসেছে

৬

হাকিমের কাছে হলপ করে, অন্য কারও প্রভাবে পড়ে পাছে সেটা প্রত্যাহার করে বসে, তাই এই হুঁশিয়ারির ব্যবস্থা। আইনমত একটি নির্জন সেল-এ তাকে বন্ধ করা হল। বেঁচে গেল অপর্ণা। সহবন্দিনীদের সরব ও নীরব কৌতূহল তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

পরদিন ছিল রবিবার। কিন্তু জেলখানার আপিসে রবিবার বলে কোনো বস্তু নেই। আসতে হবেই। তবে খানিকটা বেলা করে ঢিলেঢালা বেশে ধীরে সুস্থে আসেন বাবুরা। দুধের সাধ মেটাতে চান ঘোল দিয়ে। আমার বেলায় সেদিন রুটিন বদল হল। সকাল সকাল হাজিরা দিলাম, এবং গিয়েই ডেকে পাঠালাম অপর্ণাকে।

কাছে এসে যখন দাঁড়াল, মুখে শুধু এক ঝলক টেনে-আনা নিষ্প্রভ হাসি। ক্লান্তির মধ্যেও যে উচ্ছলতা দেখেছিলাম সেই প্রথম রাতটিতে, তার জায়গায় কেমন এক গভীর অবসাদ! আমার টেবিলের পাশে একটা টুল ছিল। তার উপর বসতে বলে ফিমেল ওয়ার্ডারটিকে বিদায় করে দিলাম। অপর্ণা কয়েক মিনিট নিঃশব্দে বসে রইল। তারপর হঠাৎ মনে পড়েছে, এমনি ভাবে আঁচলের খুঁট থেকে খুলে ফেলল এক টুকরো হলদে রঙের কাগজ। আমার সামনে রেখে বলল, এটা জমা দিতে ভুল হয়ে গেছে কাল। আপনার কাছে দিলে হবে তো? পড়ে দেখলাম কোর্ট-পুলিসের রসিদ। পাঁচ শো টাকার প্রাপ্তি-স্বীকার। টাকার অঙ্কটা দেখে বিস্ময় লাগল। বললাম, এটা কী ব্যাপার?

তা তো দু-এক কথায় বোঝানো যাবে না। বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়।

অনেক কথা শুনব বলেই তো এই সাতসকালে আপিসে এসে বসলাম।

চকিত দৃষ্টি মেলে আমার মুখের দিকে তাকাল অপর্ণা। বোধ হয় বুঝতে চেষ্টা করল—যা বলেছি সেটা নিছক পরিহাস, না, সত্য! আমি হালকা সুরেই বললাম, কী করব, বলো? তোমাদের সেই সভার সভাপতিগিরি করতে গিয়ে যে মারাত্মক ভুল করেছিলাম, তার শাস্তি না নিয়ে যাই কোথায়? তা নইলে জেলর-মানুষ আমি, এ-সব দিকে মন দেবার সময় নেই, প্রবৃত্তিও নেই। তোমার মতো মক্কেল তো আমার ছুটো চারটে নয় যে, বসে বসে তাদের লম্বা কাহিনী শুনব।

অপর্ণার মুখখানা কেমন করুণ হয়ে উঠল। মনে হল যেন ভিতরকার কোনো অবরুদ্ধ উচ্ছ্বাস ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে। ছদ্ম আপসোসের সুরে বললাম, কী কুক্ষণেই সেদিন জেল থেকে বেরিয়েছিলাম!

ম্লান হেসে বলল অপর্ণা, কিন্তু আপনার সেই কুক্ষণ আমার কাছে যে কী ক্ষণ নিয়ে এসেছিল, তা তো আপনি জানেন না। কতদিন ভেবেছি, আপনি আবার আসবেন। মাকে কত বিরক্ত করেছি, উনি আর আসছেন না কেন? মা বলত, তুই পাগল হয়েছিস! কিন্তু আমি জানি, মুখে যাই বলুক, মাও আশা করত আপনি আসবেন। কতদিন অপেক্ষা করে, যখন আর এলেন না, বারীনদাকে বলে-কয়ে তার সঙ্গে ভয়ে ভয়ে একদিন উঠলাম গিয়ে আপনার জেলখানায়। শুনলাম, আপনি বদলি হয়ে গেছেন। কী যে মনে হয়েছিল সেদিন! সত্যিই আর দেখা হল না!

মনে মনে বললাম, এ দেখা না হলেই বোধ হয় ভালো হত।

অপর্ণা আমার মুখের দিকে চেয়ে বোধ হয় অনুমান করল আমার মনের কথা। তারপর আবদারের সুরে বলল, আচ্ছা, সত্যি বলুন তো, আমার কথা একদিনও আপনার মনে হয় নি?

উত্তর পাবার আগেই হেসে ফেলল, শুনুন কথা! আমার মতো কত ভক্ত আছে আপনার। কত সভায় কত মেয়ে মালা আর চন্দন দিয়ে বরণ করেছে আপনাকে। সবাইকে মনে রাখা কখনও সম্ভব? তবু—

কথাটা তার শেষ হল না। আমি অন্য কথা তুললাম, তোমাদের বাড়ির খবর কী বলো? কী হয়েছিল তোমার মার?

ধরা গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে সহজ সুরেই বলল, মা মারা যায় নি। তাকে মেরে ফেলা হয়েছিল।

চমকে উঠলাম: বল কী!

চলতি কথায় যাকে খুন বলে, তা কেউ করে নি। এক কোপে মারা নয়, মাসের পর মাস ধরে তিল তিল করে মারা। তার চেয়ে গলা টিপে কিংবা গুলি করে একদিনে শেষ করে দিলেই অনেক ভালো হত। যেতেই যখন হল, তখন এত দিন ধরে এত দুঃখ পেয়ে যাবার কী দরকার ছিল!

এর পরে আর কোনো প্রশ্ন করা যায় না। ওর মায়ের মুখের সেই পরিতৃপ্ত ভাবটি চোখের উপর ভেসে উঠল। মনে মনে আমিও সেদিন তৃপ্তি পেয়েছিলাম এই ভেবে, এতদিনে একটি সুস্থমনা সুখী পরিবারের দেখা পেলাম, সংসারে যা অত্যন্ত বিরল। তবে কি সবটাই আমার ভুল! অপর্ণার কথাতেই যেন তার উত্তর পাওয়া গেল: আপনি যখন আমাদের দেখেছিলেন, তখনকার কথা নয়। তখনও আমরা

বড়লোক হই নি। কিন্তু বড় সুখ ছিল সংসারে। তার বছর দুই পরে বাবার ওকালতির পসার হঠাৎ বেড়ে গেল। অনেক টাকা পেলাম আমরা, কিন্তু বাবাকে আর পেলাম না। দিনকে দিন তাঁর নতুন রূপ। রাত করে ফেরেন। প্রায়ই তখন জ্ঞান থাকে না। মাকে দেখলেই অকথ্য গালাগালি, মাঝে মাঝে মারধোর। কোনোদিন একেবারেই ফেরেন না। যেখানে রাত কাটে, মেয়ে হয়ে সে কথা আর কেমন করে বলি ? পাড়ায় কান পাতা যায় না। ইস্কুল ছেড়ে দিলাম। চেনাশোনা কাউকে দূর থেকে আসতে দেখলেই জানলা বন্ধ করি। মার মুখে একটি কথা নেই। খাওয়া গেল, ঘুম গেল। তারপর আর চেনা যায় না। ডাক্তার দেখানো দরকার। কে দেখায় ? তারপর আমিই গেলাম একদিন ডাক্তার নন্দীর কাছে। বাবার বন্ধু। সবই জানতেন উনি। ডাকতেই এলেন। দেখে-শুনে ওষুধ একটা লিখে দিলেন। কিন্তু যাবার সময় আমাকে ডেকে বলে গেলেন, ওতে বিশেষ কাজ হবে না, বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়া দরকার। দেখি তোমার বাবাকে বলে। কী বলেছিলেন, তিনিই জানেন। বাবা ভীষণ রাগারাগি শুরু করলেন কদিন। মা বকতে লাগল আমাকে। কিন্তু বেশী দিন আর বকুনি খেতে হল না। মাসখানেকের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল।

অপর্ণার মৃদুকণ্ঠ কখন হঠাৎ থেমে গেছে, টের পাই নি। অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম।···একটি বর্ষণমুখর রাত। রাস্তার ধারে একখানি প্রশস্ত ঘর। আসবাবের বাহুল্য নেই। যে কখানা আছে বেশ পরিপাটি করে সাজানো। একখানা গোল টেবিলের এ-পাশে বসে আছি। ও-পাশটিতে সুদৃশ্য-ঝালর-পরানো সোফার উপর একটি

সুরূপা মহিলা। কপালের উপর পর্যন্ত ঘোমটা টানা। বাঁকা ভ্রু দুটির মাঝখানে একটি উজ্জ্বল সিঁদুরের টিপ। স্বাস্থ্য এবং আনন্দে ঝলমল করছে মুখখানা। ডান পাশে আমার কৌচের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একটি দশ-বারো বছরের ছিপছিপে মেয়ে। কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।...

অপর্ণার কথা কানে যেতেই মিলিয়ে গেল ছবিখানা। চমক ভাঙতেই ওর দিকে তাকালাম। আঁচলে চোখ মুছে ও আবার শুরু করল, মরবার দু দিন আগে দুপুরবেলা শিয়রে বসে হাওয়া করছিলাম। ইশারায় আমাকে কাছে এসে বসতে বলল। আমার একটা হাত বুকের উপর টেনে নিয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। আমি আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলাম। একটু শান্ত হলে আস্তে আস্তে বলল, আমি তো চললাম, মা। তোর যে কী হবে এই ভেবেই শুধু যেতে আমার মন সরছে না। কিন্তু ভগবানের ডাক তো এড়াবার উপায় নেই!

আমি প্রাণপণে বলতে চেষ্টা করলাম, মা গো, তোমার পায়ে পড়ি; তুমি চুপ করো। কিন্তু গলা দিয়ে আমার স্বর ফুটল না। ওই কটা কথা বলেই মা হাঁপিয়ে পড়েছিল। একটু দম নিয়ে আবার বলল, আমার গয়নাগুলো সব তোর। ওতে আর কারও অধিকার নেই। ওইটুকু বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করিস। পারবি কিনা ভগবানই জানেন।

তারপর একটা নিশ্বাস পড়ল। আর কিছু বলতে পারে নি মা। তখন থেকেই কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

তখন তুমি কত বড়?—অপর্ণা একটু থামতেই ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলাম।

সেই বছরই আঠারোয় পা দিয়েছি। শেষের দিকটায় মার যখন খুব বাড়াবাড়ি, সারাক্ষণ প্রায় তার কাছেই কেটে যেত। এবার একেবারে ছুটি পেয়ে গেলাম। করবার কিছুই রইল না। মার ঘর ছেড়ে নিজের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। পড়াশুনো তো আগেই ছেড়েছি। ঠাকুর চাকর দুই-ই পুরনো। সংসার তারাই দেখে। খাবার দিয়ে যখন ডেকে পাঠায়, খেয়ে এসে আবার ঢুকে পড়ি নিজের কোটরে। পারতপক্ষে বাবার সামনে বেরোই না। তাঁর রুটিন সেই আগের মতোই চলছে। সকালে মক্কেল, খেয়েদেয়ে কাছারি, ফিরে এসে কাপড়চোপড় ছেড়ে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়া। তারপর কখন ফেরেন জানি না। মাঝে মাঝে শুনতে পাই, এটা-সেটা নিয়ে খিটখিট করছেন। ডালে নুন পড়ে নি, টাই কোথায় গেল, কলতলায় সাবান নেই কেন? একদিন কোর্টে যাবার আগে ডেকে পাঠালেন। রুক্ষ মেজাজে বললেন, কী কর সারাদিন? জামা-কাপড়গুলোও একটু গুছিয়ে রাখতে পার না? নিঃশব্দে চলে আসছিলাম। আবার ডেকে ফেরালেন। একটু নরম সুরে বললেন, মা-বাপ কি লোকের চিরদিন থাকে? চুপ করে শুয়ে-বসে না থেকে একটু-আধটু কাজকর্ম করলেই বরং ভুলে থাকা যায়। ইস্কুলে যাবি আবার? বললাম, না।—বলেই চলে এলাম নিজের ঘরে।

মাঝে মাঝে পাড়ার গিন্নীরা কেউ কেউ এসে হা-হুতাশ করতেন, বড় বড় উপদেশ দিতেন। চুপ করে শুনে যেতাম আর ভাবতাম, কখন উঠবেন এঁরা! সমবয়সী মেয়েরাও আসত। কাউকে কাউকে মন্দ লাগত না। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকলে মনটা পালাই-পালাই করত। এমন সময় আর-এক উৎপাত শুরু হল। মাসের মধ্যে তিন-চার দিন

সেজেগুজে দাঁড়াতে হত গিয়ে বসবার ঘরে। ভাবী শ্বশুর-ভাশুরের দল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, কী পড়ি, কী কী রান্না জানি, গান গাইতে পারি কি না! যা খুশি জবাব দিতাম। তারপর কী হত জানি না। আভাসে আন্দাজে বুঝতাম, আমাকে বোধ হয় পছন্দ করেছেন; কিন্তু আমার সঙ্গে আর যা যা চাই, সেই ফর্দটা পছন্দ হয় নি। সে দিকে ক্রমেই মুশকিল দেখা দিল। টের পাচ্ছিলাম, আমাদের অবস্থায় ভাটার টান শুরু হয়ে গেছে। বাবার বৈঠকখানায় মক্কেলের ভিড় আর তেমন জমছে না।

এমনি সময় এল বারীনদা। তাকে আপনি দেখেছেন। মনে নেই নিশ্চয়ই। ও ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় পাণ্ডা, যাকে বলে মধ্যমণি।

আমি বললাম, মনে আছে বইকি। সেদিনকার সভায় মোড়লগিরি করছিল যে চশমা-পরা ছেলেটি, সেই তো? ফরসামত গাট্টা-গোট্টা চেহারা?

অপর্ণা হেসে ফেলল: ঠিক ধরেছেন। আপনার দেখছি কিছুই ভুল হয় না। খালি আমাকেই চিনতে পারেন নি।

প্রতিবাদ করলাম, কে বলে চিনতে পারি নি? নামটা তো ভুল হয় নি! ওইটাই আসল পরিচয়। নাম বাদ দিয়ে মানুষের আর থাকে কী? যাক, এবার বারীনদা কোন্ ভূমিকা নিয়ে এলেন, সেই কথা বলো।

বারীনদাকে তুচ্ছ করবেন না। আমার এই কাহিনীর অনেকখানি জায়গা সে জুড়ে আছে। কিন্তু আপনি যা ভাবছেন, তা নয়।

ওর সলজ্জ হাসিটির দিকে চেয়ে বললাম, কই, আমি তো কিছুই ভাবি নি।

তা বই কি! আমি আপনার মুখ দেখেই বুঝেছি। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, সত্যিই তা নয়। বারীনদার সঙ্গে অনেক মিশেছি। আপনি যখন দেখেছেন, তখন তো বটেই, তার পরেও চার-পাঁচ বছর। শুধু আমি নই, আমার মতো আরও তিন-চারটি মেয়ে। কিন্তু নিতান্ত কাজের কথা ছাড়া আর কোনো কথা ওর মুখে কেউ শোনে নি। এমন কিছু ওর চোখে কোনোদিন দেখা যায় নি, যেটা বিশেষ করে মেয়েদের চোখে পড়ে। একটি পনেরো-ষোলো বছরের মেয়ে আর একটি ওই-বয়সী ছেলে বারীনদার কাছে একেবারে এক। শেষ পর্যন্ত দেখেছি, সংসারে মেয়ে বলে যে একটা জাত আছে সেটা যেন ও কোনোদিন টের পায় নি। সে কথা এখন থাক। যা বলছিলাম।

বারীনদা এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। ওর মাকে আমি মাসীমা বলতাম। বড্ড ভালোবাসতেন আমাকে। তাঁর কাছেই সব কথা শুনেছিল। মা যখন মারা যায়, তার বছর দুই আগে থেকেই ও কলকাতা চলে গেছে। কালেভদ্রে আসত কুমিল্লায়। কী করত, জানি না। জিজ্ঞেস করলে খালি হাসত, বলত না কিছুই। যারা ওর ওপরে খুশী নয় তারা বলত, কিছু করে না, আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। যাই করুক, মাসীমাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাত, যদিও টাকার দরকার তাঁর ছিল না বললেই হয়।

বারীনদা এল দুপুরবেলা। বাবা কাছারিতে। দুজনে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করলাম। চা আর খাবার করে খাওয়ালাম। বললাম, জান বারীনদা, মা চলে যাবার পর এই প্রথম ঢুকলাম রান্নাঘরে। তুমি এলে, তাই। চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে ও গম্ভীর হয়ে বলল,

পড়া ছেড়ে দিয়ে ভালো করিস নি পরী। আমি বলি, আবার তুই ভর্তি হয়ে যা।

পরী আমার ডাকনাম। একটুখানি ভেবে বললাম, পড়তে আমারও ইচ্ছে করে বারীনদা। কিন্তু এখানকার স্কুলে আর হয় না।

বেশ তো, কলকাতায় গিয়ে পড়।

খরচ ?

মেসোমশাই দেবেন না ?

খুব সম্ভব, না। না দিলেও সে ব্যবস্থা আমি করতে পারব।

তুই কী করে করবি ?

মার গয়না আছে কী করতে ?

উঁহু, সেটা ঠিক হবে না।

ওগুলো দিয়ে তবে হবে কী ?

বারীনদা ভাবতে লাগল। আমি বললাম, খরচটা আসল সমস্যা নয়। সমস্যা হল, থাকব কোথায় ?

কেন, হস্টেলে ?

না, বারীনদা, মানুষ দেখলেই আমি কেমন হাঁপিয়ে উঠি। হস্টেলে আমার থাকা হবে না। তার চেয়ে এক কাজ করো না কেন ? ছোট দেখে একটা বাসা নাও। তুমিও থাকবে, আমিও থাকব। মাসীমাও যেতে পারেন মাঝে মাঝে। খান তিনেক ঘর হলেই আমাদের চলে যাবে।

দূর, তাই কখনো হয় ?

কেন হবে না ?

বারীনদা যেন আরও গম্ভীর হয়ে গেল। খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর বলল, দেখ্ পরী, আমাদের দুজনকে আমরা এত বেশী জানি যে, সেদিক থেকে ভাববার কিছু নেই। তবু লোকের কথাও একটু ভাবতে হয়।

তুমিও যেমন।—কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিয়ে বললাম আমি, লোকের কথায় আমাদের কী এসে যায়?

আচ্ছা, ভেবে দেখি।—বলে উঠে পড়ল বারীনদা। দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললাম, ফিরছ কবে?

হপ্তাখানেক আছি। এর মধ্যে আর-একদিন আসব।

বারীনদা এল না। চার-পাঁচ দিন পরে গেলাম ওর মায়ের কাছে। শুনলাম, আমার সঙ্গে দেখা হবার পরের দিনই টেলিগ্রাম পেয়ে চলে গেছে কলকাতায়। মাসীমা দুঃখ করতে লাগলেন, ছেলে সংসারী হল না, কী যে করে তাও বলে না। এদিকে তিনি আর কদিন?

সেই দিন রাত্রে কী মনে করে মার ঘরে গিয়ে সিন্দুকটা খুললাম। দেয়ালে-গাঁথা লোহার সিন্দুক। দুটো মাত্র তাক। উপরের তাকে একটা ক্যাশবাক্সে মার গয়না থাকত আর নিচের তাকে থাকত বাবার কী সব দলিলপত্তর। খুলেই দেখলাম, নীচেটা সব খালি। বুকটা কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি ক্যাশবাক্সে চাবি লাগাতে গিয়ে দেখি, গা-তালাটা খোলা। ডালা তুলেই মাথা ঘুরে গেল। সেই-খানেই বসে পড়লাম। অনেক গয়না ছিল মার। সবটাই প্রায় গিয়েছে, পড়ে আছে মাত্র চার-পাঁচখানা। দু চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। আমারই দোষ। সিন্দুকের একটা চাবি যে বাবার

কাছে ছিল সেটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। মারও তো খেয়াল হয় নি। অথচ এই গয়না নিয়ে শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না।

বাবা বাড়ি নেই। ফিরতে রাত হবে। তা হোক; যত দেরিই হোক, আমাকে জেগে থাকতেই হবে। ঠাকুর ভাত দিয়ে ডাকতে এল। ফিরিয়ে দিলাম। তখন কি আমার খাবার মতো অবস্থা? বাবা যখন ফিরলেন, রাত প্রায় বারোটা। শোবার ঘরেই ওঁর রাতের খাবার চাপা দেওয়া থাকত। ঢুকতেই দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। উনি অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, এ কী! এখনও শুতে যাস নি? সে কথার উত্তর না দিয়ে বললাম, আপনি গয়না নিয়েছেন মার সিন্দুক থেকে?

চড়া সুরে জবাব এল, সে কৈফিয়ত কি তোমার কাছে দিতে হবে?

ও গয়না তো আপনার নয়।

বাবা কী যেন ভাবলেন। তারপরে একেবারে অন্য সুরে বললেন, ও-সব সেকেলে সোনার পিণ্ডি দিয়ে তো তোমাকে পার করা যাবে না। স্যাকরাকে দিয়েছি; ভেঙে হাল ফ্যাশানের নতুন গয়না গড়ে আসবে।

কথাটা যে নির্জলা মিথ্যা, বলবার ধরন দেখেই বুঝলাম। বললাম, আমাকে একবার জানালেন না কেন? নতুন গয়নার কোনো দরকার ছিল না।

বাবা চটে উঠলেন: বড্ড জ্যাঠা হয়েছ তুমি। যাও, শুতে যাও।

বড় অসহায় মনে হল নিজেকে। বারীনদাও নেই যে তার পরামর্শ নেব। এ-সব তো আর-কাউকে বলা যায় না। যে কখানা ছিল, আপাতত সরিয়ে রাখলাম একটা কাঠের আলমারিতে, যার মধ্যে মার কাপড় থাকত। তার চাবিটা আমার কাছেই ছিল।

সেই সময়টা বারবার করে আপনার কথা মনে হত। ভাবতাম, আপনি থাকলে নিশ্চয়ই এ বিপদে আমাকে রক্ষা করতেন। সারাদিন কাটল ছটফট করে। কত সব আজগুবি প্ল্যান আসত মাথায়। তখন ওখানকার জজ সাহেব ছিলেন বাঙালী। তাঁর কাছে গিয়ে যদি কেঁদে পড়ি, তিনি কি এর একটা বিহিত করবেন না? আবার ভাবতাম, কী করবেন তিনি? বাপ যার শত্রু, কে বাঁচাবে তাকে?

একদিন সকালে উঠে দেখলাম, বাবার বিছানাপত্তর বাঁধা হচ্ছে। কলকাতা যাবেন। রওনা হবার মিনিট কয়েক আগে আমাকে ডেকে বললেন, চার-পাঁচ দিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। সাবধানে থেকো। রাধার মাকে বলেছি, কটা রাত শোবে তোমার ঘরে।

রাধার মা আমাদের পুরনো ঝি। মা মারা যাওয়ার পর ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

চার-পাঁচ দিনের জায়গায় সাত-আট দিন কেটে গেল। তারপর ফিরলেন বাবা। রাত তখন আটটা কি সাড়ে আটটা। আমি নিজের ঘরেই ছিলাম। চাকর এসে বলল, বাবু ডাকছেন। বাবার ঘরে গিয়ে দেখলাম, উনি বসে আছেন একটা চেয়ারে, আর ওদিকের জানালার ধারে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে একটি মহিলা। আমার সাড়া পেয়ে মুখ ফেরালেন। ব্লাউজের গলাটা অনেকখানি খোলা। তার ওপরে ঝলমল করছে জড়োয়া নেকলেস। দেখেই চিনলাম। সারা

দেহে যেন আগুন জ্বলে উঠল। বাবা বললেন, পরী, তোমার মাকে প্রণাম করো।

আমার মা! সংসারে মা কি লোকের দুবার হয়? বিষিয়ে উঠল সমস্ত অন্তর। কোনো উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে চলে এলাম। পেছন থেকে শুনলাম, বলছেন আমার নতুন মা, মেয়েটা তো বড্ড অসভ্য দেখছি। তুমি বলেছিলে, ছেলেমানুষ। এ যে দেখছি হাতি। বাবার কথা শোনা গেল না। শোনবার প্রবৃত্তিও ছিল না।

এর পর যে দিন শুরু হল, বলতে গেলে মহাভারতকেও ছাড়িয়ে যাবে। সে-সব থাক। যেটুকু না বললে নয়, তাই শুধু –

এক বাণ্ডিল ইনটারভিউ-পিটিশন নিয়ে ঢুকলেন কিরণ হালদার, আমদানী-সেরেস্তার দু নম্বর কেরানী। হঠাৎ খেয়াল হল আজ রবিবার। কয়েদীদের মোলাকাতের দিন। এসব দরখাস্ত এসেছে তাদেরই আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে। গেটের বাইরে তারা অপেক্ষা করছে। আপাতত আমার কাজ হল ওই কাগজগুলোর উপর একটা করে 'এম. সি.' লিখে দেওয়া। সেটা হয়ে গেলেই সংশ্লিষ্ট কয়েদীদের নামের তালিকা তৈরি করবেন কিরণবাবু। তাই দেখে বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে খুঁজে খুঁজে লোকগুলোকে কুড়িয়ে এনে আপিসের সামনে বসিয়ে দেবে লাল-ব্যাজ-ওয়ালা রাইটারের দল। তারপর তাদের জেল-টিকেট পরীক্ষা করে দেখবেন ডেপুটি জেলর, এবং আইনানুসারে যারা মোলাকাতের হকদার, তারাই শুধু দাঁড়াবে গিয়ে ইণ্টারভিউ-রুমের 'খাঁচা'র পাশে। গেটের পাশে ছোট্ট একখানা ঘর। মাঝখানে সূক্ষ্ম জালের বেড়া। তার ভিতরের দিকে দাঁড়াবে কয়েদীর

লাইন, পাশাপাশি তিন-চার জন ; আর বাইরের দিকে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবে তাদের স্ত্রী পুত্র ভাই বোন, মা মাসী, শ্যালক ভাগনের দল। তু প্রস্থ মিহি জালের ফাঁক দিয়ে চেনা মুখখানা দেখবার জন্যে দু তরফের কী ব্যর্থ প্রয়াস ! যেটুকু দেখা গেল, ঠিক চেনা গেল না। যাদের চোখের জোর কম, তাদের সার হল শুধু চোখের জল। তবু চলতে থাকে উঁকিঝুঁকি। তারপর শুরু হবে কথাবার্তা, অর্থাৎ বেপরোয়া কোরাস চিৎকার। একটি অল্পবয়সী বউ কী বলতে এসেছে তার সদ্য-জেলে-আসা স্বামীকে। বলা হল না। বললেও, যাকে বলা সে শুনতে পেল না তার ভীরু কণ্ঠ। কেমন করে শুনবে ? তারই ঠিক গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বাজখাঁই হুঙ্কার ছাড়ছে কোন্ গ্রামের মোড়ল, জানিয়ে দিচ্ছে তার একদা-প্রতিবেশী অধুনা-জেলখাটা বন্ধুটিকে : তোমার বাড়িঘর সব নিলাম হয়ে গেছে। ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে নিয়ে গেছে আব্বাস সরদারের ছেলেগুলো। কী করবে বলো ? উত্তর শোনা গেল না। ওদিকে কোণের দিকে কোনো রকমে একটু জায়গা পেয়েছে একটি তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলে। পাড়ার কার সঙ্গে এসেছিল কয়েদী বাবাকে জানাতে : তিন মাস মাইনে দিতে পারে নি বলে ইস্কুলের খাতা থেকে নাম কেটে দিয়েছেন হেডমাস্টার। তার অশ্রুভেজা কথাগুলো ডুবিয়ে দিয়ে ঠিক পাশ থেকে ফেটে পড়ল একটা মোটা ভাঙা গলা—"মজাসে রহ ভাইয়া। ইধার সব ঠিক হ্যায়।" স্বনামধন্য গ্যাঙ-সরদার। ডাকাতি মামলায় বেরিয়ে গেছে আইনের ফাঁক দিয়ে। কিন্তু জনকয়েক অনুচরকে বাঁচাতে পারে নি। তাদেরই একজনকে আশ্বাস দিয়ে গেল : ওদিকে সব ঠিক ; মজাসে রহ।

কয়েদী আর তাদের আত্মীয় বন্ধু—এই দুই দলের মাঝখানে ঘড়ি ধরে বসে আছেন ডেপুটি জেলার। তাঁরই নির্দেশে একজন সিপাই পাঁচ-সাত-দশ মিনিট পর পর বাইরের দিক থেকে সরিয়ে দিচ্ছে এক-এক দল দর্শনার্থী। নতুন দল এসে দখল করছে তাদের শূন্য স্থান। যারা চলে যাচ্ছে, তাদের অনেকেরই চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা। তার সবটাই কি প্রিয়জন-মিলনের আনন্দাশ্রু? হয়তো তা নয়, আরও কিছু আছে। যাকে দেখতে এলাম, ভালো করে দেখা হল না, শোনা গেল না তার গলার স্বর, শোনানো গেল না আমার যা বলবার ছিল। তবু হয়ে গেল ইণ্টারভিউ। রবার স্ট্যাম্পের ছাপ পড়ল কয়েদীদের টিকিটে। আবার দেখা হবে সেই দু মাস পরে যদি পরিষ্কার থাকে টিকিটের পাতা, অর্থাৎ কারাঅপরাধের কোনো শাস্তির আঁচড় না লাগে তার গায়ে।

কিরণবাবু বিদায় নেবার পর অপর্ণার দিকে যখন তাকাবার ফুরসত হল, সেও দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল, দশটা বাজে। আজকের মতো উঠি। আপনারও কাজের সময়, আমারও আজ কাপড় কাচার ফাইল। আসবার সময়েই মনে করে দিয়েছেন জমাদারনী।

আমিও সায় দিলাম: বেশ, তাই এসো। আমার কাজ না হয় কিছুটা ঠেকিয়ে রাখা যেত, কিন্তু ওই কাপড় কাচা, মানে জেলের রুটিন ঠেকানো যাবে না।

আর একটু পরিষ্কার করে বললাম, তুমি হয়তো ভাবছ, আমি ময়লা কাপড় পরে থাকব, তাতে সরকারের কী আসে-যায়? কিন্তু না; ওটা একটা অপরাধ, যাকে বলে জেল অফেন্স, তার আবার শাস্তি আছে নানা রকম।

আমাকে শাস্তি দিতে পারবেন আপনি?—কৌতুকভরা সুরে জিজ্ঞাসা করল অপর্ণা।

কেন পারব না?

একদিন পরীক্ষা করে দেখতে হবে।—বলে হাসতে হাসতে উঠে পড়ল।

পরের সপ্তাহে তিন বারে, অর্থাৎ পুরো তিনটে সিটিং দিয়ে অপর্ণা তার কাহিনী শেষ করল। জেলখানার আপিস। মাঝে মাঝে খাতাপত্র-ফাইল হাতে বাবুদের আনাগোনা, যখন-তখন সিপাই-সান্ত্রীদের বুটের ঠকাস। তারই মধ্যে বসে একটি মেয়ে বলে যাচ্ছে তার ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের দীর্ঘ ইতিহাস। সে কাহিনী সবাইকে বলবার মতো নয়। তার মধ্যে দুঃখ আছে, লজ্জা আছে, আর আছে তার তরুণ-হৃদয়ের কত সাধ ও স্বপ্ন। স্থান কাল পরিবেশ কোনোটাই তার প্রকাশের অনুকূল নয়। তাই হয়তো সব কথা সে বলতে পারে নি। যেটুকু বলেছিল, দীর্ঘদিনের ব্যবধানে তার অনেকখানি আজ হারিয়ে গেছে আমার মন থেকে। তা ছাড়া, যে ভাষায়, অন্তরের যে উত্তাপ দিয়ে সে একটার পর একটা ঘটনা তুলে ধরেছিল আমার চোখের উপর, তার যথার্থ রূপায়ণ আমার এ লেখনীর পক্ষে ব্যর্থ প্রয়াস। তবু যে লিখছি, তার কারণ সেই চিঠি। সে কথা আসবে আরও অনেক পরে।

অপর্ণার নতুন মা এসেই সংসারের ভার নিলেন, এবং তাঁর প্রথম কাজ হল অনেক কালের ঠাকুরের জবাব। বললেন, তিনটে লোকের সংসার; তার মধ্যে দুটো মেয়েছেলে। ঠাকুর দিয়ে কী হবে? নিজেই এগিয়ে গেলেন উনুনের ধারে। অপর্ণাকেও যেতে হল তাঁর সাহায্যে। এটা তোলা, ওটা নামানো, হাতের কাছে এগিয়ে দেওয়া যখন যা দরকার। না গেলে চলবে কেন? দু দিন যেতে না যেতেই চাকা উলটে গেল। তখন ওই সাহায্যটাই পড়ল গিয়ে গৃহিণীর হাতে আর অর্পণার হাতে উঠল হাতা বেড়ি ডেকচি আর কড়া। মা থাকতে এবং তার পরেও মাঝে মাঝে দু-একবার শখ করে ছাড়া রান্নাঘরে সে কখনও যায় নি। দরকার হয় নি, অভ্যাসও ছিল না। তাই আজ পদে পদে তার ত্রুটি, এবং তার নগদ পাওনাও হাতে হাতে: কী করেছ এতদিন! সামান্য দুটো ভাত ফোটাতেও শেখায় নি তোমার মা? বিয়ে দিলে তো তিন ছেলের মা হতে! খেতে বসে ফেটে পড়েন কোনো কোনো দিন: এটা কী রেঁধেছ; ডালনা, না গোরুর জাবনা? মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করত অপর্ণা। কিন্তু সে শুধু মনে মনে। এ কথা সে জানত, একটা কিছু বলতে গেলেই অনেক কিছু বলতে হয় এবং তার পরে আর তার খেই থাকে না। হাতিয়ার দিয়ে যে লড়াই তার শেষ আছে; কিন্তু কথার লড়াই একবার শুরু হলে আর থামতে জানে না। সেইটাই সে প্রাণপণে এড়িয়ে চলতে চায়। মাকে দেখেছে, কথা যত তিক্ত, যত রূঢ়ই হোক, উত্তরে কোনোদিন মুখ না-খোলা, এই যেন ছিল তাঁর পণ! জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে পণ তাঁর অটুট ছিল। কিন্তু সবাই কি সব পারে, না, এড়াতে চাইলেই সব জিনিস এড়ানো যায়?

একদিন সন্ধ্যার আগে নিজের ঘরে বসে চুল বাঁধছিল অপর্ণা। নতুন মা এসে বললেন, আলমারির চাবিটা একটু দাও তো।

কোন্ আলমারি?

ওই যে, ও-ঘরে যেটা আছে।

অপর্ণা বুঝল, একে একে সবটাই দখল হয়ে গেছে, এবারকার লক্ষ্য তার মায়ের কাপড়ের আলমারি, যার মধ্যে সেদিন সে সরিয়ে রেখেছে লুটের হাত থেকে বাঁচানো সেই ছুখানা অলঙ্কার। ওটুকু যেমন করে হোক রক্ষা করতেই হবে। নতুন মা অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন: কী ভাবছ এত?

ওতে তো সংসারের কোনো জিনিস নেই।

তবে কী আছে?

আছে মার খানকয়েক কাপড় আর সামান্য দু-একটা গয়না।

সেইগুলোই দেখতে চাই!

অপর্ণা একটু ভেবে নিয়ে বলল, থাক না। ও দিয়ে আর কী দরকার আমাদের?

তোমার দরকার না থাক, আমার থাকতে পারে।

মাথার ভিতরটা জ্বলে উঠল অপর্ণার। নিজেকে যথাসাধ্য সংযত রেখে সহজ সুরেই বলল, ওগুলো মা আমাকে দিয়ে গেছে।

এবার রুখে উঠলেন নতুন মা: তোমাকে দিয়ে গেছে মানে! কী অধিকার ছিল তার দিয়ে যাবার? এ সংসারের যা কিছু সব এখন আমার। এইটুকু বোঝবার বয়স তোমার হয় নি, তা নয়।

অপর্ণা চুল বাঁধতে লাগল। কোনো জবাব দিল না। তিনি বীরদর্পে এগিয়ে এসে বললেন, চাবি দেবে কি না, জানতে চাই।

অপর্ণা তেমনই নিরুত্তর। নতুন মা গর্জে উঠলেন : এত সাহস তোমার! আচ্ছা, আসুক ও, দেখি কোথায় থাকে তোমার তেজ! ঘাড় ধরে যদি না—

বলতে বলতে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই অপর্ণার কানে গেল নতুন মার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর এবং সঙ্গে সঙ্গে চাপা কান্নার আওয়াজ। বুঝল, বাবা আপিস থেকে ফিরেছেন। মিনিট কয়েক যেতেই তিনি এলেন ওর ঘরে। বিরক্তির সুরে বললেন, গয়না কাপড় নিয়ে কী সব ঝঞ্ঝাট বাধিয়েছিস তোর মার সঙ্গে? চাবি চেয়েছিল, দিয়ে দিলেই তো পারতিস।

কোনো উত্তর না পেয়ে আর একটু এগিয়ে এসে নরম গলায় বললেন, আহা, তোকে যা দেবার সে আমি দেব। ওই তোর সম্বল, আর কিছু পাবি না—এ কথা মনে করিস কেন? মা নেই, আমি তো রয়েছি।

অপর্ণার চোখে জল এসে গেল। বাবার নজরে পড়তেই বলে উঠলেন, এই দেখো, কাঁদবার কী হল! বলছি তো, আমি যখন রয়েছি, গয়না-টয়না যা তোর চাই—

কিছু চাই না আমি।—অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল অপর্ণা : যা পরে আছি, সব খুলে দিচ্ছি, নিয়ে যান। কিন্তু ওইটুকু আমার মার হাতের শেষ চিহ্ন। ও আমি কিছুতেই দেব না।

উচ্ছ্বসিত কান্নার বেগ আর রোধ করতে পারল না। তার বাবা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন বিহ্বলের মতো। তার পর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

অপর্ণা বলেছিল, এর পর কী রকম ছটফট করে যে আমার

দিনরাতগুলো কাটত, আপনাকে বোঝাতে পারব না। আমি জানতাম, বাবার এ যাওয়া শুধু দুদিনের জন্যে। ওদিকের তাড়নায় আবার তাঁকে আসতে হবে। এ তো শুধু গয়না-কাপড়ের লোভ নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী, অনেক গভীর। মাকে শেষ করেই এদের আশ মেটে নি, তার সমস্ত চিহ্ন এরা মুছে ফেলতে চায়। আমাকে এরা দাসীর মতো খাটিয়ে নিচ্ছে, উঠতে বসতে লাঞ্ছনার শেষ নেই। তাও হয়তো সয়ে যেত। কিন্তু আমার মায়ের সেই চরম মৃত্যু সইব কেমন করে? কেমন করে দেখব, দু দিন আগে যে সব ছিল, সবখানে ছিল, জুড়ে ছিল এই বাড়ির প্রতিটি কোণ, এই খাট-পালঙ আসবাব-পত্তর, আজ সে কোনোখানে নেই! এ যে আবার তাকে নতুন করে হারানো। তারপর এ বাড়িতে আমি থাকব কেমন করে? তাই স্থির করলাম, আমাকে যেতে হবে। কোথায় যাব, কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব, জানি না। এইটুকু শুধু জানি, আমাকে যেতেই হবে। যত বিপদ, যত দুঃখই আসুক, না গিয়ে আমার উপায় নেই।

স্বীকার করতে বাধা নেই, কারণ যত বড়ই হোক, অপর্ণার এই চলে যাবার সংকল্প হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা দিয়েছিল মনের মধ্যে। ওই বয়সের একটি সাধারণ গৃহস্থ ঘরের কুমারী মেয়ের মুখে এই ধরনের উক্তি আমাদের অভ্যাসে বাধে। তার মূলে হয়তো বহু যুগের সংস্কার, কিংবা আরও কিছু। ঠিক কী যে মনে হয়েছিল, বলতে পারব না। কেমন একটা অস্বস্তির মতো। বোধ হয় সেই মনোভাব থেকেই প্রশ্ন করেছিলাম, তোমার বাবা যে পাত্র দেখছিলেন তোমার জন্যে, তার কী হল? অপর্ণা হেসে ফেলল। মাথা নেড়ে বলল, আপনার মনের কথা আমি বুঝতে পেরেছি। তারই কোনো একটি

যদি জুটে যেত আমার কপালে, আপনি নিশ্চিন্ত হতেন। আমিও কি হতাম না? কোন্ মেয়ে চায় নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়াতে? কিন্তু সে রাস্তা আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমার নতুন মা আসবার পর ও নিয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য শোনা যায় নি। যাওয়া ছাড়া আমার আর কোনো পথ ছিল না।

কিন্তু দিন কয়েক পর একদিন গভীর রাত্রে সত্যি সত্যিই যখন বেরিয়ে পড়লাম, পা দুটো আর চলতে চায় না। বুকের মধ্যে সে কী কাঁপুনি! একবার মনে হল ফিরে যাই। যে ঘর ছেড়ে এলাম, তার মধ্যে যত কষ্ট যত লাঞ্ছনাই থাক, তবু সে তো নিশ্চিত আশ্রয়। যে পথে চলেছি, সেখানে যে শুধু অজানা অনিশ্চয়। বুক চেপে ধরে আড়ষ্ট পা দুটোকে আবার চালিয়ে দিলাম। মাথা নেড়ে বললাম, না, যে ঘর ছেড়েছি সেখানে আর ফিরে যাওয়া যায় না। যেতে আমাকে হবেই।

বাবা গিয়েছিলেন চাঁদপুর না নোয়াখালি, একটা কী মামলায়। আমার নতুন মা-ও সকাল সকাল দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছিলেন। সেই হল আমার সুযোগ। সঙ্গে সামান্য কটা টাকা, দু-চারখানা কাপড়-জামা, আর সেই কখানা গয়না। কেবলই ভয় হচ্ছিল, কেউ যদি চিনে ফেলে! মেয়েদের গাড়িতে উঠি নি। বড্ড ফাঁকা। ভিড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে চলে এলাম কলকাতায়।

অনেক ঘোরাঘুরির পর বারীনদার নতুন বাসায় যখন পৌছলাম, সে অবাক হল নিশ্চয়ই। কিন্তু চোখে মুখে তার কোনো আভাস পাওয়া গেল না। ওর স্বভাবই ছিল অমনি। সামান্য একটু হেসে জিজ্ঞেস করল, কার সঙ্গে এলি?

কার সঙ্গে আবার ? একলা।

ঠিকানা পেলি বুঝি মার কাছ থেকে ?

তা ছাড়া আর কোথায় পাব ? তুমি তো একটা চিঠি দিয়েও খোঁজ নিলে না !

এ অনুযোগের কোনো উত্তর দিল না বারীনদা। ছু মিনিট কী ভাবল, তারপর ধীরে ধীরে বলল, ওখানকার সব কথাই শুনেছি। তারপর থেকেই বাড়ি খুঁজছিলাম। এই কদিন হল পেয়েছি। ভাবছিলাম এবার একবার যাব। তার চেয়ে এই ভালো হয়েছে। কিন্তু—

আবার কিন্তু কিসের ?

ভাবছি, সত্যিই ভালো হল কি না ! কেমন উদাস সুরে বলল বারীনদা। তারপর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, চল, তোর ঘর দেখিয়ে দি। চান-টান কর। ভাত আসবে কিন্তু হোটেল থেকে।

কাল থেকে আর আসবে না।—গম্ভীরভাবে বললাম আমি। বারীনদা হঠাৎ বুঝতে না পেরে একটু অবাক হয়ে তাকাল। বললাম, বাঃ, এত কষ্ট করে ছু বেলা হাত পুড়িয়ে রান্না শিখলাম কি হোটেলের ভাত খাবার জন্যে ?

ও !—হেসে উঠল বারীনদা। মনে হল, খুশীই হয়েছে প্রস্তাব শুনে। পুরুষমাত্রেই বোধ হয় হয়ে থাকে।

বাগবাজারের একটা গলির মধ্যে একতলায় তিনখানা ঘর নিয়ে বাসা। বাকী অংশে থাকে বাড়িওয়ালা। সে দিকটা একেবারে আলাদা। বারীনের ঘরখানা বড়। তার পরেরটা তালাবন্ধ। ওর কী সব জিনিসপত্র থাকে। কোণের দিকের ছোট ঘরখানা অপর্ণার। এইখানেই শুরু হল তার নতুন জীবন।

দু-তিন দিন পরে দুপুরবেলা ঘরের মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে ছিল অপর্ণা। বারীন বাইরে থেকে বলল, পরী আছিস?

না; উড়ে গেছি। এসো না।

কয়েকখানা বই নিয়ে এলাম তোর জন্যে। নতুন বছর না পড়লে তো ইস্কুলে ভর্তি হওয়া যাবে না। তদ্দিন বসে না থেকে একটু-আধটু পড়াশুনা কর।

পড়াবে কে?

যেখানটা না বুঝবি, আমিই না হয় চেষ্টা করে দেখব।

চেষ্টাটা করবে কখন? সারাদিনই তো খালি বাইরে আর বাইরে। আচ্ছা বারীনদা, মাসীমাকে নিয়ে এলে হয় না?

বড্ড একলা লাগছে, না?

না, তা কেন? উনি এলে বেশ হয়। গঙ্গাস্নানটান করতে পারেন।

বারীন আগের কথার জের টেনেই বলল, বেশী দিন আর একলা লাগবে না। ভাবছি, তোকেও আমাদের কাজে লাগিয়ে দেব।

কী কাজ তোমাদের?

যখন দেব, তখনই দেখতে পাবি।

সকালের দিকে নানা দেশের লোক আসত বারীনের ঘরে। বেশীর ভাগই ওর বয়সী ছেলে। পাজামা ধুতি লুঙ্গি কোট প্যাণ্ট— বিচিত্র পোশাকে ভরে যেত ঘর। দরজা বন্ধ করে কী সব কথাবার্তা হত নানা ভাষায়। অপর্ণা সে সময়টা থাকত প্রায়ই রান্নাঘরের দিকে। ওদের টুকরো টুকরো কথা কানে যেত। যাবার-আসবার পথে হঠাৎ কেউ হয়তো সামনে পড়ে যেত এবং সঙ্গে সঙ্গে সসম্ভ্রমে

সরে দাঁড়াত। বেশ মজা লাগত অপর্ণার। একদিন এমনি একটা দলকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসছিল বারীন। অপর্ণা হাসিমুখে তাকিয়ে ছিল সেই দিকটায়। বারীনের মুখে চিন্তার রেখা। হয়তো যে আলোচনা শেষ হয়েছে, তারই জের চলছিল মনের মধ্যে। কাছে এসে অপর্ণার দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল। ম্লান হেসে বলল, কী দেখছিস?

দেখছিলাম, এত জাতের মানুষও আছে কলকাতায়।

বারীন তেমনই হেসে উত্তর দিল, এত জাত কোথায় দেখলি? ওরা সব একজাত।

একজাত মানে?

মানেটা না হয় আর-একদিন শুনিস!

না, এখখুনি বলতে হবে।—মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠল অপর্ণা।

বলবার মতো নতুন কিছু নয়। সেই পুরনো কথা। দুনিয়ায় জাত আছে দুটো, হ্যাভ্‌স্ আর হ্যাভ্-নট্‌স্। যাদের আছে, আর যাদের নেই। তুই, আমি আর এরা সব সেই নেই-এর জাত।

অপর্ণার মনে পড়ল, এই ধরনের কথা আগেও বলত বারীন। বলত, সব মানুষ সমান। দেশের ধন-দৌলত জমি-জমা কলকারখানায় সক্কলের সমান অধিকার। সমিতির ছেলেমেয়েরা চুপ করে শুনত আর আড়ালে বলত—বারীনদা কমিউনিস্ট। কমিউনিস্ট কাকে বলে অপর্ণা জানত না, (এখনও জানে না), এইটুকু শুধু বুঝত, যারা খেটে খায় অথচ অনেক খেটেও খেতে পায় না, তাদের উপর ওর গভীর টান, আর যাদের আমরা বলি বড়লোক, তাদের উপর ও খুশী নয়।

সেই দিন বিকালের দিকে নিজের ঘরে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল অপর্ণা। রাস্তার মোড়ে ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ নজর পড়তেই ছুটতে ছুটতে এল বারীনের ঘরে : সর্বনাশ হয়েছে বারীনদা !

কী হল ?

বাবা আসছেন। দেখে মনে হল রাস্তার নম্বর খুঁজছেন।

বারীন মুহূর্তকাল কী ভাবল। তার পর ওর মুখের উপর গভীর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, আমার দিকে নয়, নিজের মনের দিকে বেশ করে চেয়ে দেখ পরী, তার পর বল্, থাকবি, না, ফিরে যাবি।

তুমি খেপেছ ! ফিরেই যদি যাব, তা হলে এলাম কেন ? তবে তুমি যদি তাড়িয়ে দাও—বাকীটুকু আর বলতে পারল না। বড় বড় জলের ফোঁটা বেরিয়ে এল চোখ ছাপিয়ে।

বারীন হেসে ফেলল : পাগল কোথাকার ! যা, তোর ঘরে যা। আমি ওঁকে এখান থেকেই বিদায় করে দেব।

যদি খুঁজে দেখতে চান ?

বারীনের মুখে পড়ল চিন্তার ছায়া। বিড়বিড় করে বলল, অসম্ভব নয়…আচ্ছা,…বাইরে তোর কাপড়-জামা জুতো-টুতো যা কিছু আছে সব নিয়ে আয়।

কী হবে ?

নিয়ে আয় ; তার পর বলছি।

দরজার উলটো দিকে ও-দিকের দেওয়ালে ছিল একটা কাঠের কপাট-দেওয়া দেয়াল-আলমারি। বেশ খানিকটা উঁচু ; গভীরও অনেকখানি। তালাটা খুলে ফেলল বারীন। জিনিসপত্র যা ছিল সরিয়ে ফেলল। ঘুণে-ধরা দুটো তাক একটু টানতেই খুলে এল।

ততক্ষণে বাইরে কে কড়া নাড়ছে। অপর্ণাও এসে গেছে তার জামা-কাপড় নিয়ে। বারীন খোলা আলমারিটা দেখিয়ে বলল, ঢুকে পড়।

ও মা! ওর মধ্যে বন্ধ করবে না কি!

তা না হলে আর ঢুকতে বলছি কিসের জন্যে?

দম আটকে মরি যদি?

সে তখন দেখা যাবে। আর দেরি করিস না। ওদিকে শুনছিস তো কড়া-নাড়ার শব্দ?

অপর্ণা জামা-কাপড় নিয়ে ভয়ে ভয়ে সেই আলমারির গর্তে ঢুকতেই বারীন আস্তে আস্তে পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিল। ছোট তালাটা সরিয়ে একটা বড় তালা লাগিয়ে দিল, যাতে করে কপাট দুখানা এঁটে না বসে।

অপর্ণার বাবা এসে বসলেন সামনের বারান্দায়। কোনো রকম ভূমিকা না করেই বললেন, পরী কোথায়?

পরী!

হ্যাঁ। পরীকে চিনতে পারছ না?—শ্লেষতিক্ত উত্তর।

আজ্ঞে, তা পারছি বইকি! কিন্তু পরী কোথায় তা আমি কেমন করে জানব?

তুমি বলতে চাও, সে এখানে আসে নি?

কী আশ্চর্য! এখানে এলে আমি তাকে লুকিয়ে রাখব!

তা তুমি পার। আমি সমস্ত বাড়ি সার্চ করব।

বেশ তো, করুন না? পরী কি বাড়ি থেকে না বলে চলে গেছে?

হ্যাঁ, চলো। কখানা ঘর তোমার বাসায়?

এই তো তিনখানা।

সব ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলেন ভদ্রলোক। রান্নাঘর, কলতলা, বাথরুম। কয়লা রাখার ছোট্ট খুপরিটাও বাদ দিলেন না। অপর্ণার ঘরে গিয়ে বললেন, এখানে কে থাকে ?

আমার এক বন্ধু।

একটা মেয়েদের চিরুনি পড়ে ছিল তাকের উপর। সেটা তুলে নিয়ে বললেন, এটা কার ?

আজ্ঞে তারই। বড় চুল রাখে বলে—

ও-ও !—বলে চিরুনিটা রেখে দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

ফিরে এসে বারান্দায় সেই চেয়ারটায় যখন বসলেন, আলমারির ফাঁক দিয়ে যতটা দেখা যায়, অপর্ণার মনে হল অনেকখানি মুষড়ে পড়েছেন বাবা। বারীন দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক পাশেই। তার দিকে চেয়ে যখন বললেন, এক গ্লাস জল খাওয়াতে পার ?—গলাটাও বড্ড ক্লান্ত শোনাল। জলের গ্লাসটা এক নিশ্বাসে শেষ করে খানিকটা যেন দম নিয়ে বললেন, কী করি বল তো বারীন ? বড্ড আশা করে এসেছিলাম—তোমার এখানে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। দেখেছি তো, সেই ছোট থেকে তোমার ওপরে ওর বেজায় টান। বারীনদা বলতে অজ্ঞান। কোথায় গেল মেয়েটা !

অপর্ণার বুকের ভিতরটা একবার নড়ে উঠল। কিন্তু সে শুধু ওই একটি বার। পরক্ষণেই মনে পড়ল তার মায়ের জীবনের শেষ দিনগুলো। স্পষ্ট অনুভব করল, মুখের পেশীগুলো যেন কঠিন হয়ে উঠছে। বারীনের গলা শোনা গেল : মামার বাড়ি যায় নি তো ?

সেখানে যাবে কার কাছে ? সব মরে-হেজে গেছে। ছোট মামাটা

এখানেই থাকে, বেলেঘাটায়। তাকে বোধ হয় ওর মনেও নেই তবু, কথাটা যখন তুললে, ঘুরে যাই একবার।

উঠতে গিয়ে বারীনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা, তুমি কী বল, পুলিসে একবার—

অপর্ণা চমকে উঠল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে কান খাড়া করে রইল উত্তরের অপেক্ষায়। বারীন যেন অনেক ভেবেচিন্তে মাথা নেড়ে বলল, সেটা কি ভালো হবে?

বাবা সায় দিলেন: আমিও তাই ভাবছিলাম। কেলেঙ্কারি তাতে বাড়বে ছাড়া কমবে না। আর বসে কী হবে? উঠি। তুমি কিছু মনে কোরো না বারীন।

না, না, আমি কী মনে করব? ভাবছি, ভয়ানক কিছু একটা না ঘটলে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে, পরী তো সে রকম মেয়ে নয়।

অপর্ণার মনে হল, তার বাবা যেন হঠাৎ রুক্ষ চোখ তুলে বারীনকে একবার দেখে নিলেন। তার পর ছাতাটা তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

অপর্ণা ভেবেছিল, আলমারি খোলবার পর দুজনে মিলে খুব এক চোট হেসে নেবে। প্রাণভরে উপভোগ করবে এই প্রহসন-নাটকের সবটুকু রস। কিন্তু এ কী হল! দুজনে যেন চোখ তুলতেই পারল না দুজনের দিকে। বারীনের মুখে যে কুঞ্চনরেখা দেখা দিল, সেটা হাসি নয়, হাসির প্রয়াস। আড়চোখে একবার তাকিয়েই মাথা নীচু করে নিজের ঘরে চলে গেল অপর্ণা।

তাকের-উপর-রাখা ছোট আরশিটায় নজর পড়তেই চমকে উঠল, কেমন যেন থমথম করছে চোখ মুখ, সবটা জুড়ে ফেটে পড়ছে রক্ত।

সেই দিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর গয়নার পুঁটলিটা হাতে করে বারীনের ঘরে গিয়ে বলল, এটা রাখো।

কী ওটা ?

দেখোই না কী।

বারীন একবার উঁকি দিয়েই বুঝতে পারল এবং কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, দেখে আর কী করব বল ? গয়না পরবার ভাগ্যই যদি হবে, তবে কলিকালে না এসে জন্ম নিতাম রামায়ণের কালে। কেউ একজন এসে কেয়ূর-কুণ্ডল-কণ্ঠাভরণে সাজিয়ে দিত। ধনুকে টঙ্কার দিয়ে চলে যেতাম যুদ্ধে।

তার জন্যে আপসোস কিসের ? খোঁজ করলে 'কেউ একজন' তো এ কালেও পাওয়া যায়। কেয়ূর-কুণ্ডল নাই বা হল, এ যুগের যা সাজ—

এই যেমন, ময়লা ধুতির উপর ছেঁড়া শার্ট, তার নীচের পকেটে দুখানা শুকনো রুটি আর বুক-পকেটে একটা দু-টাকা দামের ফাউন্টেন পেন, কী বলিস ?

শুধু কি তাই ?

তা ছাড়া আর কী ? এই সাজে সাজিয়েই তো আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা বীর পুরুষদের যুদ্ধে পাঠাচ্ছেন প্রতিদিন বেলা দশটায়।

অপর্ণার দৃষ্টি হঠাৎ উদাস হয়ে এল। ধীরে ধীরে বলল, যারা পাঠাচ্ছে, আর যাদের পাঠাচ্ছে তারা হয়তো এতেই সুখী। তুমি তার কী বুঝবে !

হুঁ। সে সুখের চেহারাটা যদি দেখতিস একবার ?—কেমন একটা করুণ ছায়া পড়ল বারীনের মুখের উপর।

অপর্ণা বলল, সুখ জিনিসটা কি বাইরে থেকে দেখলেই চেনা যায় বারীনদা? থাক গে ও-সব বাজে কথা। ধরো তাড়াতাড়ি। ঘুম পেয়েছে; শুতে যাব।

কী হবে ও দিয়ে?

বাঃ, সব প্ল্যান ভুলে গেলে! খাওয়াটা না হয় তোমার হোটেলেই চলছে, আর সব খরচপত্তর? তার পর ইস্কুলে ভর্তি হলে তো এককাঁড়ি টাকা লাগবে মাসে মাসে!

আচ্ছা, সে যখন লাগবে, তখন দেখা যাবে।

এখন রেখে দিতে ক্ষতি কী?

বারীন যেন মুহূর্তমধ্যে বদলে গেল। খানিকক্ষণ কী ভাবল। তার পর শুষ্ক মুখে আস্তে আস্তে বলল, ক্ষতি হতে কতক্ষণ! আমার যে প্রতি মুহূর্তেই টাকার দরকার।

অপর্ণা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। এবার মেঝের উপর বসে পড়ে অন্তরঙ্গ সুরে বলল, বারীনদা, তোমার সব কথা আমাকে বলবে না?

কোন্ সব কথা? মৃদু হেসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল বারীন।

এক নম্বর হল, কিসের জন্যে তোমার টাকার দরকার।

কিসের জন্যে? প্রশ্নটা যে নেহাত বোকার মতো হল পরী। এ দরকারের কি আর শেষ আছে? যাদের অনেক আছে তাদেরই নেই, আর আমরা তো একেবারে হ্যাভ-নট্স্।

ও-সব যা-তা বলে বুঝিয়ে দিলে আমি শুনব না। তোমাকে বলতেই হবে তুমি কী কর, কোথায় যাও, কোত্থেকে তোমার টাকা আসে, আর সে সব যায় কোথায়!

বাপ রে, তুই দেখছি আমার রীতিমত গার্জেন হয়ে উঠলি!

ঠাট্টা রাখো। না বললে আমি উঠবই না এখান থেকে।

বলব রে বলব। এত ব্যস্ত কিসের? শুধু বলা কেন, তোকে বোধ হয় টানতেও হবে আমাদের দলে। কিন্তু—

আবার গাম্ভীর্যের ছায়া পড়ল বারীনের মুখের উপর। অপর্ণা অপেক্ষা করে রইল। ওর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল বারীন, কিন্তু সব কথা শুনে যখন মনে হবে, বারীনদা যা করে সে সব ভালো কাজ নয়, দেখে দেখে যখন ঘৃণা হবে আমার ওপর—

ঘৃণা!—বলেই বিস্ময়ে বেদনায় নির্বাক হয়ে রইল অপর্ণা। তারপর বলল, তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল না হতে পারে, কিন্তু তাই বলে ঘৃণা করব তোমাকে! আমি! এত বড় কথাটা তুমি মুখ ফুটে বলতে পারলে বারীনদা!—বলতে বলতে গলাটা তার করুণ হয়ে উঠল। বারীন কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তার মুখের পানে। তারপর তেমনি মৃদু হেসে বলল, আচ্ছা, আর বলব না। হল তো? যা, এখন শুতে যা। রাত হয়েছে।

ডান হাতখানা দিয়ে মৃদু আঘাত করল ওর পিঠের উপর। অপর্ণা আর কিছু বলতে পারল না। চোখ মুছতে মুছতে উঠে চলে গেল।

পরদিন ঘুম ভাঙতে বেলা হল। তার আগেই যথারীতি বেরিয়ে গেছে বারীন। মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে রান্নাঘরে যাবার আগে একটু পড়াশুনা নিয়ে বসে ছিল অপর্ণা। বাইরের দরজায় কড়া নড়ে উঠল। ঠিকা ঝি বাসন মাজছিল। উঠে গিয়ে খুলে দিতেই ভিতরে ঢুকল বারীনের পাঞ্জাবী বন্ধু শরণ সিং। অপর্ণা তাকে দেখেছে কয়েকবার। কিন্তু কথাবার্তা হয় নি। কী বলবে, কোন্ ভাষায় বলবে, তাই

ভাবছিল। ওকে ইতস্তত করতে দেখে নিজেই এগিয়ে এল শরণ, এবং পরিষ্কার বাংলায় বলল, এই সুটকেস আর এই টাকাটা বারীনকে দেবেন। বলবেন, দু জোড়া দুল ছাড়া আর কিছু বিক্রি হয় নি।

অপর্ণা সুটকেস আর খামটা ওর হাত থেকে নিয়ে বলল, আপনি একটু বসুন না। বারীনদা এখনি আসবে।

না। আমাকে এই সাড়ে নটার ট্রেনে বাইরে যেতে হচ্ছে। দশ-বারো দিন পরে ফিরছি। তারপর এসে দেখা করব।

চাবি সঙ্গেই ছিল। নিজের ঘরে গিয়ে অপর্ণা খুলে ফেলল সুটকেসটা। একরাশ জড়োয়া গয়না ঝলমল করে উঠল। নেকলেস, আর্মলেট, টায়রা, ব্রেসলেট। একটা একটা করে তুলে ধরল জানলার সামনে। এত সুন্দর আর এ রকম দামী জিনিস সে কোনোদিন দেখে নি। বাক্সটার কোণের দিকে কাগজে-জড়ানো এক বাণ্ডিল কার্ড। তার উপরে ইংরেজীতে লেখা—ঈস্ট ইণ্ডিয়া জুয়েলারি এম্পোরিয়ম ; নীচে রাস্তার নাম, নম্বর।

বারীন ফিরল এগারোটার পর। বাক্স আর টাকা বুঝিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল অপর্ণা, গয়নার দোকান আছে বুঝি তোমাদের ?

গয়নার দোকান কি রে! রীতিমত জুয়েলারি এম্পোরিয়ম। জিনিস দেখলি তো ?

দেখলাম।

কেমন লাগল ?

খুব সুন্দর।

নিবি নাকি দু-একখানা ?

রক্ষে করো বাপু।

রক্ষে করব? আচ্ছা, করলাম। কিন্তু সবাইকে রক্ষে করলে আমাদের চলে না। কাউকে না কাউকে না মেরে উপায় নেই।

তার মানে?

বারীন উত্তর না দিয়ে হাসতে লাগল। অপর্ণার কৌতূহল বেড়ে গেল। তাড়া দিয়ে উঠল, কী, খালি হাসছ! বলো না কী বলছিলে?

ধরতে পারিস নি তো? ও সব নকল। সোনাটা কেমিক্যাল, আর পাথরগুলো মেকী।

অ্যাঁ, তাই নাকি!

কিন্তু তোর মতো অনেকেই বলে, খুব সুন্দর। তারপরে আর তাদের রক্ষা করি কী করে?

এই সব জোচ্চুরি ব্যাবসা তোমাদের! দোকানে যেদিন পুলিস পড়বে তখন দেখো মজা।

দোকান কোথায়?

কেন, ওই যে কী একটা ঠিকানা দেখলাম।

তা একটা আছে বটে; তবে আসল দোকান হল এই সুটকেস।

তা হলে ওই কার্ডগুলোও ভুয়ো?

ভুয়ো বলি কেমন করে। একে ক্লাইভ স্ট্রীট, তায় ফার্মের নামটাও জমকালো। বড় বড় খদ্দের ঘায়েল হয়ে যায়।

কিন্তু এ-সব কি ভালো হচ্ছে বারীনদা? বিপদে পড়তে কতক্ষণ!

বিপদ কোথায় নেই পরী? তোরা যাকে সৎপথ বা ন্যায়ের পথ বলিস, সেখানেও পদে পদে বিপদ। তা ছাড়া, সে সব পথ তো আমাদের মতো মানুষের জন্যে খোলা নেই।

খোলা নেই বলছ কেন? চাকরি-বাকরি করে কিংবা কোনো একটা ব্যাবসা-ট্যাবসা করে কত লোক করে খাচ্ছে।

তা খাচ্ছে। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী লোক খাচ্ছে না। তার কারণ, যাকে আমরা বলি জীবন-সংগ্রাম সেখানে তোর ওই হাতিয়ারগুলো আর কাজে লাগছে না।

কেন?

সে 'কেন'র ঠিক উত্তর আমার জানা নেই। তার চেয়ে চোখের ওপর যা দেখেছি, তাই বলতে পারি।

কী দেখেছ চোখের ওপর?—বলে গুছিয়ে বসল অপর্ণা।

বারীন বলল, একটু চোখ খুললে তুইও দেখতে পাবি, আমরা যে দেশে বাস করছি, সেটা হচ্ছে মস্ত বড় একখানা তিনতলা ফ্ল্যাট, যার একতলার সঙ্গে আর-একতলার বিরোধ। একেবারে ওপরে যারা থাকে, তাদের অস্ত্র হল ধনবল; আর একদম নীচের তলায় যাদের বাস, তাদের সম্বল হচ্ছে বাহুবল। ছুনিয়ায় টিঁকে থাকতে হলে, এই ছুটোই হল আসল অস্ত্র। মাঝখানে আছি আমরা। আমাদের ওর কোনোটাই নেই। থাকবার মধ্যে আছে মাথায় কিঞ্চিৎ মগজ, যাকে একদিন গর্ব করে বলতাম, বুদ্ধিবল। এতকাল তাই ভাঙিয়ে খেয়েছি। কলম আর গলার জোর দেখিয়েছি ইস্কুলে আর আদালতে; চোখ বুজে করে গেছি ডাক্তারি মোক্তারি, মাস্টারি আর কেরানীগিরি, আর সে-সব যাদের জোটে নি, তারা করেছে—ওই, তুই যা বলছিলি, ছোটখাট দোকানদারি। এখন তার কোনোটাতে জায়গা নেই। তাই, ওই সোজা সরল প্রকাশ্য পথ ছেড়ে বুদ্ধিকে একবার নামতে হয়েছে এই সব আকাবাঁকা গোপন পথে।—বলে বাক্সটা দেখিয়ে দিল।

অপর্ণা নীরবে শুনে যাচ্ছিল। নীরব হয়েই রইল।

বারীন আবার বলল, লড়াই মাত্রেরই তিন হাতিয়ার—ছল, বল আর কৌশল। বল যাদের নেই, তাদের সম্বল ওই বাকি দুটো—ছল আর কৌশল। এখানে যা দেখছিস, সে হচ্ছে তারই একটা নমুনা।

কিন্তু এ দিয়ে আর কতদিন চলে?—এতক্ষণে সাড়া দিল অপর্ণা: ধরা একদিন পড়তেই হবে।

তা হয়তো হবে। তবু যতদিন চালানো যায়। তবে আমাদের তরফে সবচেয়ে বড় ভরসার কথা হচ্ছে এই যে, বলবান মাত্রেই কোনো একটা বিশেষ জায়গায় দুর্বল। অত বড় যে হাতি, তার চোখ দুটো দেখেছিস তো? তেমনি ওপরতলায় যারা থাকে, তাদের বড় বড় লোহার সিন্দুকগুলো নিরেট হলেও ঠিক নিশ্ছিদ্র নয়। খুঁজলে দেখা যাবে, কোথাও একটা দুর্বল ফাঁক রয়ে গেছে, যেখানে খোঁচা দিলে কিছু বেরিয়ে আসে। সেইটুকু আমরা কুড়িয়ে নিই।

কিছুই বুঝলাম না তোমার কথা।

আচ্ছা, এই যেমন ধর, স্বামী লাখপতি ব্যাবসাদার। পয়সা কুড়িয়ে কুড়িয়ে গড়ে তুলেছে টাকার পাহাড়। ভয়ানক হুঁশিয়ার, কোনো দিক দিয়ে কিছু বেরিয়ে না যায় এদিকে স্ত্রীটির নেশা হল, চারটির জায়গায় পাঁচটি নেকলেস, তিন সেটের ওপর আর-এক সেট জড়োয়া ব্রেসলেট। নেশামাত্রেই গোপন পথ ধরে চলে। সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ল শরণ সিং। জোগাতে লাগল নেশার উপকরণ। এই চমৎকার জড়োয়ার জোচ্চুরি।

কিন্তু সবার কাছেই কি আর জোচ্চুরি চলে?—সন্দেহ প্রকাশ করল অপর্ণা: ওরা তো আমার মতো বোকা নয় যে ঠকবে!

সকলে না হলেও, অনেকেই তোর মতো ঠকে। বোকা বলতে যা বোঝায়, এ ঠিক তা নয়। কবিরা বলেন, স্ত্রীজাতির নাকি একটা তৃতীয় নয়ন আছে। হয়তো আছে। তবে এই গয়নার বেলায় তার তিনটে নয়নই অন্ধ। তাই এক টুকরো কাচের মধ্যে তাঁরা দেখতে পান চুনি-পান্নার ঝিলিক। ফলে, আমাদের পকেটেও কিছু এসে যায়। একটা মুশকিল আছে।

কী মুশকিল?

ঢোকা বড় শক্ত। মহলটা দুর্ভেদ্য। শরণ সিং বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না।

অপর্ণা কী একটা বলতে যাচ্ছিল। বাইরের দরজায় আবার কড়া-নাড়ার শব্দ শোনা গেল। বারীন বেরিয়ে গেল খুলে দিতে। অপর্ণাও উঠে পড়ে বলল, ইশ, অনেক বেলা হয়ে গেছে। এখন আবার যেন আড্ডা দিতে বোসো না, চান করে তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। ও-বেলা বেরোতে হবে মনে আছে তো?

খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বেলা পড়তেই ওরা বেরিয়ে পড়ল। এর আগেও দু-তিন দিন বারীনের সঙ্গে বেরিয়েছে অপর্ণা। কিন্তু সে শুধু বেড়ানো, ঘুরে ঘুরে শহর দেখা। আজকের উদ্দেশ্য অন্য রকম। শ্যামবাজারের কাছাকাছি খাল পার হয়ে যে অঞ্চলে গিয়ে পড়ল তার নাম উল্টাডাঙা। খোয়া-ওঠা ধুলোয় ভরা রাস্তা। দু ধারে চওড়া খোলা ড্রেন। তার মধ্যে আলকাতরার মতো পাঁক। পাঁক বললে তাকে গৌরব দেওয়া হয়। বহু কাল থেকে সঞ্চিত বহু রকম কদর্য জিনিসের মিশ্রণে একটা আধা-তরল রাসায়নিক পদার্থ।

কোথায় নিয়ে এলে ?—নাকে আঁচল দিয়ে বিরক্তির সুরে বলল অপর্ণা।

বারীন হাসল তার সেই বাঁকা হাসি: আজব দেশ নয়। সেদিন যে-চৌরঙ্গী দেখে দিশেহারা হয়েছিলি—সেও যে শহর, এটাও সেই শহর। দুটোরই নাম কোলকাতা।

ময়লাগুলো সাফ করে না কেন ?

মাঝে মাঝে করে বইকি। খানিকটা খানিকটা তুলে সাজিয়ে রাখে রাস্তার ধারে। তারপর সবাই মিলে পায়ে পায়ে সেগুলো নিয়ে তোলে রান্না আর খাবার ঘরে, সেখান থেকে—

চুপ করো তুমি—ধমকে উঠল অপর্ণা। বারীন এবার গলা ছেড়ে হেসে উঠল। ততক্ষণে তারা বড় রাস্তা ছেড়ে ঢুকে পড়েছে গলির মধ্যে। এখানে ওখানে আবর্জনার স্তূপ। দু ধারে মাটির ঘর; উপরে খাপরা কিংবা টিনের ছাউনি। জাঁতার শব্দ কানে আসছে। কোনো কোনো বারান্দায় বসে ডাল ঝাড়ছে পশ্চিমী মেয়েরা। তারই ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গেছে গলিপথ। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। লোকগুলোর পরনে ঝুল-কালি-মাখা কাপড়। অপর্ণার হঠাৎ মনে পড়ল, এই রকম কাপড় দেখেছিল, ওদের বাসায় যায় যে ডালওয়ালা তার গায়ে। কী সুন্দর সোনামুগের ডাল! কিন্তু যে ন্যাকড়াটায় বেঁধে নিয়ে যায়, তার রঙও এই রকম। এইখানেই বোধ হয় থাকে সে লোকটা। বারীন বলল, এই হচ্ছে উল্টোডাঙার ডালপট্টি।

এবার তারা পড়ল গিয়ে আর-একটা গলির মুখে। ওরই মধ্যে একটু যেন পরিষ্কার ঘর-দোর। বাসিন্দারা প্রায় সবাই মেয়েছেলে। সায়া-সেমিজ-ব্লাউজ-জ্যাকেটের বালাই নেই। বসন বলতে একখানা

করে শাড়ি। সেটা অঙ্গাবরণ হলেও সর্বাঙ্গের আব্রু রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সেদিকে তাদের বিশেষ আগ্রহ আছে বলেও মনে হল না। অপর্ণা বুঝল, এরা সব, যাকে বলে, নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক। ফিসফিস করে বলল, এটা বোধহয় ঝি-পাড়া।

বলে দেখ না?—জবাব দিল বারীন: দল বেঁধে তেড়ে আসবে। বড় বড় ধানকলে কাজ করে এরা। ঝি নয়, মজুর, মানে মজুরনী। তা ছাড়া সন্ধ্যার পরে অন্য ব্যাবসা আছে।

সেটা আবার কী?

বারীন উত্তর দিল না, অন্য কথা পাড়ল। লজ্জায় মরে গেল অপর্ণা। আড়ালে জিভ কেটে মনে মনে বলল ছি-ছি, কী ভাবল বারীনদা!

একটা অপেক্ষাকৃত চওড়া গলিতে পড়তেই কানে এল তুমুল কোলাহল। নারী-পুরুষের মিলিত কণ্ঠ। তার ভাষাটা এমন স্তরের যে বারীনের সঙ্গে পাশাপাশি চলা বা তার মুখের দিকে তাকানো কঠিন হয়ে উঠল। কলহের উপলক্ষ্যটা এবার চোখে পড়ল। সামনেই একটা জলের কল। তখনও জল আসে নি। কিন্তু এরই মধ্যে নানা আকারের এবং নানা প্রকারের ভাণ্ড এসে জড়ো হয়েছে তার চার দিকে। তাদের মালিকরাও সশরীরে উপস্থিত এবং সকলেই ওই কল-সংলগ্ন জমিটুকুর প্রথম অধিকারের জন্য তৎপর। বিরোধের বিষয়টাও তাই। জনৈক রঙ্গরমণীর মাটির কলসি হটিয়ে দিয়ে কলের গায়ে বালতি বসিয়েছিল এক গামছা-সর্বস্ব বিহারী পুরুষ। বোধ হয় মনে করেছিল যে-হেতু তার গায়ের জোর বেশী, অতএব অধিকারটাও বড়। কিন্তু মুখের জোর বলে যে একটা মারাত্মক অস্ত্র আছে, এবং সত্যি

সত্যি আক্রমণ না করে কেবলমাত্র আস্ফালন দেখিয়েও যে যুদ্ধ জয় করা যায়—এই কঠিন সত্যটা তার জানা ছিল না। এইবার জানল এবং অতবড় দেহটা নিয়েও একটি তীক্ষ্ণ রসনার তোড়ে শেষ পর্যন্ত হটে আসতে হল। বালতিটা কয়েক ইঞ্চি সরিয়ে দিয়ে তবে রক্ষা।

হঠাৎ কলের মুখ থেকে প্রথমে শোঁ শোঁ আওয়াজ, তার পরেই পটপট শব্দে খানিকটা জল ছিটকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়ি কলসি ঘড়া বালতির দঙ্গলে এমন একটা জড়াজড়ি ঠেলাঠেলি এবং হুটোপাটি শুরু হল, যেটা অপর্ণার চোখে নতুন হলেও বস্তিবাসীদের জীবনে অতি সনাতন দৈনন্দিন ঘটনা। হঠাৎ নজরে পড়ল, এই যুদ্ধ-ক্ষেত্র থেকে খানিকটা দূরে বালতি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি দশ-বারো বছরের ছেলে। দেখলেই বোঝা যায়, সে তার খালি গা এবং ছেঁড়া হাফপ্যান্ট নিয়েও এদের সবার থেকে আলাদা। বারীন এগিয়ে গেল তার দিকে। চোখাচোখি হতেই ছেলেটির মুখে ফুটে উঠল একটুখানি সলজ্জ হাসি।

ইস্কুলে যাও নি হারু?

গিয়েছিলাম। ইতিহাসের স্যার আসেন নি; এক ঘণ্টা আগেই ছুটি হয়ে গেল।

এখন জল নেবে কেমন করে? আর একটু পরে এলে হত না?

দিদি বলল, একটুও জল নেই।

আচ্ছা, তুমি বাড়ি গিয়ে খবর দাও, আমি নিয়ে আসছি।

না না। আপনি নেবেন কেন?

বারীন ওর হাত থেকে বালতিটা নিয়ে বলল, বোকা ছেলে! তোমাকে যে এক ঘণ্টা এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

হারু ছুটতে ছুটতে চলে গেল। বারীন বালতি নিয়ে এগিয়ে যেতেই যারা একেবারে কল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ঠেলাঠেলি করছিল, সকলেই একটুখানি সরে গিয়ে পথ করে দিল। বারীন একজনকে বলল, কিছু মনে কোরো না ভাই, আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে।

বালতিটা কলের নীচে বসিয়ে দিয়ে বলল, আচ্ছা, তোমরা এ ধাক্কাধাক্কি না করে যদি একটা লাইন করে দাঁড়াও, তা হলে সকলেরই সুবিধে হয়। একজন বলে উঠল, তা তো হয়। কিন্তু শোনে কে? আরও দু-চার জনের কাছ থেকেও ওই কথারই একটা অস্পষ্ট সমর্থন শোনা গেল। বারীন আর কথা বাড়াল না।

কল থেকে খানিকটা এগিয়ে ডান দিকে আর-একটা গলি। দু ধারে তেমনই খাপরা বা টিনের চালা। তার কোলে খোলা নর্দমা। এখানে সেখানে জড়ো হয়ে আছে আবর্জনার পাহাড়। বাড়ি-ঘর এবং লোকজনের চেহারা দেখলে মনে হয়, গৃহস্থ-বস্তি। বাঙালী, হিন্দুস্থানী উড়িয়া নানা জাতের সংমিশ্রণ। বেশ খানিকক্ষণ চলবার পর একটা বাড়ির সামনে আসতেই একটি মধ্যবয়সী মহিলা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, ছি-ছি, এ কী কাণ্ড বলো দেখি! তুমি কেন এত কষ্ট করে জল টানতে গে—

বারীন হেসে বলল, যা কুরুক্ষেত্র চলছে কলের গোড়ায়, হারুর সাধ্যি কি ঢোকে তার মধ্যে?

মহিলাটি আর-একটা কী বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ অপর্ণার দিকে নজর পড়তেই বললেন, এটি কে বাবা?

আমার বোন।

তোমার নিজের বোন?

নিজের বইকি। মাসীমার মেয়ে।

বাঃ, খাসা মেয়েটি তো। দাঁড়িয়ে কেন মা ? এসো, ভেতরে এসো। আর আসবেই বা কোথায় ?—বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

নর্দমার উপরে একফালি তক্তা দিয়ে পারাপারের ব্যবস্থা। বারীনের হাত ধরে ধীরে ধীরে উঠে এল অপর্ণা। এক টুকরো বারান্দা, তার কোলে দুখানা ছোট ছোট ঘর। ভিতরটা রীতিমত অন্ধকার, তারই একখানার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা মোটা ভাঙা গলা : কে কথা বলছে ?

আজ্ঞে, আমি বারীন।

কখন এলে বাবা ?

এই আসছি।

আমার জিনিসটা এনেছ ?

বারীন জবাব দিল না। আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। মহিলাটি হাত নেড়ে কী একটা ইশারা করলেন। তারপর অপর্ণাকে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। মেঝের উপর ছেঁড়া একটা মাদুর পাতা। তার এক ধারে একরাশ দেশলাইয়ের কাঠি ; পাশে কতগুলো খালি খোল। দেখলেই বোঝা যায়, কে একজন এখানে বসে কাজ করছিল, এই মাত্র উঠে গেছে। মহিলাটি এদিক ওদিক চেয়ে বললেন, কই, রেখা কোথায় গেলি ?

পেছনের দরজায় একটা চটের পরদা। ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, অপর্ণারই বয়সী একটি মেয়ে কাপড় বদলাচ্ছে। সাড়া দিল, এই যে যাচ্ছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে পরদা সরিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। পরনে একখানা কালোপেড়ে কোরা শাড়ি। মহিলাটি বললেন, আবার সেই

ছেঁড়া কাপড়টা জড়িয়ে ছিলি! এত করে বললাম, ওটা পরিস না, ওতে গেরস্তের অকল্যাণ হয়! কেন, এই তো খাসা কাপড় এনে দিয়েছে বারীন।

রেখা মায়ের কথায় কান না দিয়ে অপর্ণার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বলল, বসুন ভাই। আমরা কাজ করতে করতে গল্প করি। এই আপদগুলো আধ ঘণ্টার মধ্যে বিদায় করতে হবে।—বলেই বসে পড়ে ক্ষিপ্রহাতে খোলের মধ্যে কাঠি পুরতে লেগে গেল। তারই ফাঁকে চোখ তুলে বলল, আপনাকে কিন্তু অনেকক্ষণ বসতে হবে। তাড়াতাড়ি চলে গেলে চলবে না।

অপর্ণা বলল, বেশ তো। কিন্তু আমিই বা চুপ করে বসে থাকব কেন? দিন না গোটা কয়েক বাক্স? দেখি, পারি কি না!

তা হলে তো ভালোই হয়। গুনে গুনে ষাটটা করে কাঠি পুরবেন। কম-বেশী হলে হিসেব মিলবে না কিন্তু।—বলে হেসে ফেলল তুজনেই। মিনিট খানেক পরে রেখা জিজ্ঞাসা করল, আপনি বুঝি কোলকাতাতেই থাকেন?

না, এই মাসখানেক হল এসেছি।

মায়ের সঙ্গে?

আমার মা নেই।

তু মিনিট ছেদ পড়ল কথায়। তারপর আবার প্রশ্ন করল রেখা, এখানে আসবার আগে আপনার দাদা আমাদের কথা কিছু বলেন নি?

অপর্ণা মাথা নাড়ল; এবং এই না-বলার জন্যে মনে মনে ভারি রাগ হল বারীনের উপর। রেখা বলল, বলবার আছেই বা কী! তা ছাড়া আমরাই তো শুধু নই, এ রকম কতো বাড়ি আছে, যেখানে ওঁকে

যেতে হয়, কতো লোককে দেখতে হয়। এই পাড়াতেই, ধরুন না, তিন-চার ঘর—

পাশের ঘর থেকে একটা হুঙ্কার এসে বাকী কথাগুলো ডুবিয়ে দিয়ে গেল। শুধু হুঙ্কার নয়, তার সঙ্গে কদর্য গালাগালি। লক্ষ্যটা যে রেখার মা, সেটুকু অপর্ণারও বুঝতে অসুবিধা হল না। রেখার মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল। হাতের কাজ থামিয়ে ওইখান থেকেই গলা চড়িয়ে ভর্ৎসনার সুরে বলে উঠল, বাবা!

সঙ্গে সঙ্গে ও-পক্ষের সুর নেমে গেল। অনেকটা যেন অনুযোগের ভঙ্গিতে বললেন ভদ্রলোক, অন্যায়টা কী বলেছি শুনি! তোমাদের সব হবে, আর আমার এক-ফোঁটা আফিম জুটবে না! আমি তো তোমাদের সংসার থেকে চাইছি না, বারীনের কাছে চাইছি। তাতে তোমাদের জ্বলুনি কিসের!

জ্বলুনি কি সাধে!—তিক্তস্বরে বললেন রেখার মা, তোমার এক দিনের নেশায় যে পয়সা যায়, সেটা যে ভরগুষ্ঠীর দু দিনের খোরাক, সে খবর রাখ? বারীন আর কত দেবে? তুমি কি কিছুই বুঝবে না?

শেষের দিকে গলাটা ভারী হয়ে উঠল। উত্তরে ভদ্রলোক বিড়বিড় করে কী বললেন, ঠিক বোঝা গেল না। রেখা মাথা নীচু করে হাত চালিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সামনের দিকে তাকাতেই চোখ দুটো যেন দপ করে জ্বলে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে অপর্ণার চোখে পড়ল, রাস্তার ওপারে দাওয়ায় বসে একজন মাঝবয়সী পশ্চিমা লোক একজোড়া কোটরগত ক্ষুধার্ত চোখ মেলে এই দিকে তাকিয়ে আছে। রেখা উঠে গিয়ে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আবার

এসে বসল তার নিজের জায়গায়। অনেকটা যেন নিজের মনে বলল, এক মিনিট দোরটা খুলে রাখবার উপায় নেই।

অপর্ণা বলল, আপনারা কদ্দিন আছেন এ পাড়ায় ?

তা, হল বছর দুই। বাবা বিছানা নিলেন। তার পরেই চলে আসতে হল এই নরকে।

কী অসুখ ওঁর ?

প্যারালিসিস। পা দুটো অচল হয়ে গেছে।

কাঠি ভরা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। অপর্ণার হঠাৎ খেয়াল হল, এসে অবধি বারীনের কোনো সাড়া পায় নি। বলল, বারীনদাকে দেখছি না তো! গেল কোথায় ?

আমাদের কাজেই গেছেন।—মৃদু হেসে জবাব দিল রেখা, তৈরী ঠোঙাগুলো পৌঁছে দিয়ে নতুন কাগজ আনতে গেছেন। এসেই আবার এই বাক্সগুলো নিয়ে যাবেন ম্যাচ ফ্যাক্টরিতে। আরও কিছু খোরাক আসবে আমার। যাবার সময় একবার উঁকি মেরে দেখে গেছেন, কদ্দূর হল!

তাই নাকি ? কই সাড়া পেলাম না তো ?

সাড়া দিলে তো পাবেন ? নেহাত দরকার না হলে উনি তো কথা বলেন না।

একটু ম্লান হাসি ভেসে উঠল রেখার আনত মুখের উপর। অপর্ণা বুঝতে পারল ; ব্যথিত হল, কিন্তু বিস্মিত হল না। বারীনকে আর কেউ না চিনুক, তার তো চিনতে বাকি নেই। সে আসে যায়, কাজ দেয়, কাজ নেয়, একটি দুঃস্থ পরিবারের অন্নবস্ত্র যোগায়। তার ফাঁকে কখন কার গোপন মনে কিসের মেঘ জমে উঠল, সে খবর সে রাখে

না। হয়তো রাখবার ক্ষমতাই দেন নি তার বিধাতাপুরুষ। খানিকক্ষণ পরে রেখা আবার একটা খাপছাড়া প্রশ্ন করে বসল, আচ্ছা, বলুন তো ভাই, আমি কি দেখতে খুব বিচ্ছিরি?

এ কথার কোনো উত্তর নেই। অসামান্য রূপসী না হলেও রেখা সুন্দরী, এবং নিজের সম্বন্ধে সে সচেতন ছিল না—এ কথা মনে করবার কারণ নেই। উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই সে বলে উঠল, এই দেখুন, কী সব বাজে বকছি পাগলের মতো! আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, মেয়েটা কী বেহায়া! নিজের অবস্থা ভুলে যাই। মনে থাকে না, আমরা কতো গরিব। শুধু গরিব নয়, গলগ্রহ।

অপর্ণা কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। অসংলগ্নভাবে শুধু বলে ফেলল, আপনি ওকে ভুল বুঝছেন। ও একটা আস্ত পাগল।

পাগল নয় ভাই, পাথর। যাক গে, ওই যে উনি এসে পড়েছেন।

বারীন এসেই দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমার হল, রেখা?

রেখা কোনো কথা না বলে দেশলাইয়ের বাক্সগুলো তুলে দিল ওর হাতে। চকিতে একবার ওর মুখের দিকে চেয়ে বলল, ঠোঙার কাগজ আনেন নি?

না, ওদিকটায় এখনও যাই নি। এবার আসবার সময় নিয়ে আসব। পরী, তোরা বসে গল্প কর। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসছি।

সন্ধ্যার পর বাড়ি ফেরবার পথে বারীনের পাশে চলতে চলতে অপর্ণা জিজ্ঞাসা করল, এ রকম মক্কেল তোমার আর কত আছে বারীনদা?

মক্কেল কী রে?

ওই হল। মক্কেলরা দেয়, এরা না হয় নেয়। তবে কেউ কেউ আবার দেয়ও—অনেক কিছু দেয়। অনেক সময় নিজের যা কিছু আছে সব। কিন্তু সে সব তুমি দেখেও দেখতে পাও না।

বারীন হেসে বলল, তোর কথাগুলো ঠিক বাংলা নভেলের মতো। খুব পড়েছিস বুঝি?

পড়েছি বইকি—উষ্মার সঙ্গে বলল অপর্ণা, তবে কি জান, মানুষকে দুটো খেতে-পরতে দিলেই যারা মনে করে সব হল, তার আর কোনো দুঃখ, কোনো অভাব থাকতে পারে না, তারাই তোমার মতো সব-কিছু নাটক-নভেল বলে উড়িয়ে দিতে চায়। আসলে সেটা জীবনকে এড়িয়ে চলা কিংবা তাকে ছোট করে দেখা।

হয়তো তাই। তবে ওই খাওয়া-পরার অভাবটা এত বড় যে, ওর কাছে অন্য কিছু চোখেই পড়ে না। তুই যে সব দুঃখের কথা বলছিস সে সব উৎপাত যে নেই, তা বলছি না। কিন্তু সে বিলাস তাদেরই মানায় ওই খাওয়া-পরার প্রয়োজন যাদের মিটে গেছে।

তুমি ভুল করছ বারীনদা। ওগুলো মোটেই বিলাস নয়। সব মানুষের জীবনেই আসে। যারা খেতে পাচ্ছে তাদেরই শুধু নয়, যারা পাচ্ছে না তাদেরও। তার চাক্ষুষ প্রমাণ তো এইমাত্র দেখে এলাম।

বারীন কোনো উত্তর দিল না। বোধ হয় এড়িয়ে গেল কথাটা। বুদ্ধিমান এবং চক্ষুষ্মান হয়েও ওই একটি জায়গায় সে অন্ধ। বুদ্ধি দিয়ে হয়তো বোঝে, হৃদয় দিয়ে বোঝে না।

কথা বলতে বলতে তারা সেই পুলের কাছে এসে পড়েছিল।

সেদিকে নজর পড়তেই বারীন বলে উঠল, ওই যাঃ, বুড়ীর বাড়ি তো ফেলে এলাম!

কোন্ বুড়ী?

আছে এক পৈতে-কাটা বুড়ী। গেল সপ্তাহের পৈতেগুলোও পড়ে আছে। চল্, একবার ঘুরে যাই।—বলে আবার সেই পথেই ফিরে চলল বারীন। অপর্ণাও চলতে চলতে বলল, তোমার টেবিলের ওপরে কাগজের ঠোঙায় কতকগুলো পৈতে পড়ে আছে দেখছিলাম। ওইগুলো বুঝি?

হ্যাঁ, ওইগুলোই। আজও বোধ হয় আর-এক ঠোঙা চাপবে।

বেশ মিহি আর মাজা সুতোর পৈতে। দেখে কিন্তু হাতে-কাটা বলে মনে হয় না।

তা হলে কী হবে? বিক্রি হয় না। কলের তৈরী পবিত্র জাপানী পৈতে না হলে তো আজকালকার সদ্-ব্রাহ্মণদের মন ওঠে না। কোন্‌দিন শুনব, নারায়ণ-পুজোর তুলসী আসছে জার্মানি থেকে।

অপর্ণা হেসে ফেলল, এত সব উদ্ভট কথাও যোগায় তোমার মাথায়?

একতলা পাকা বাড়ি। দেয়ালের চুন-বালি খসে পড়ছে। সামনের বারান্দায় কম্বলের আসনে বসে চোখে নিকেলের চশমা লাগিয়ে একজন বর্ষীয়সী বিধবা তকলি কাটছিলেন। পরনে পরিচ্ছন্ন সাদা থান। বারান্দাটি ধবধব করছে পরিষ্কার। বেশ একটি শুচিশুদ্ধ পরিবেশ। শীর্ণ মুখখানা ম্লান, কিন্তু কেমন একটা মমতা-মাখানো। একবার তাকালেই মাথা নুয়ে আসে। ওদের দেখেই ব্যস্ত হয়ে উঠে

পড়লেন। অপর্ণা এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল। মহিলাটি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বারীনের দিকে তাকালেন এবং পরিচয় পেয়ে সস্নেহে ওর চিবুক স্পর্শ করে আঙুল চুম্বন করলেন। বললেন, বড্ড ভালো দিনে এসেছ তোমরা। কালীঘাটে গিয়েছিলাম। মায়ের প্রসাদ রয়েছে ঘরে। এসো, ভেতরে এসো।

সামনেই একখানা মাঝারি আকারের ঘর। ওরা জুতো খুলে রেখে ভিতরে গিয়ে বসল। পাথরের রেকাবিতে করে সামান্য ফলমূল আর একটু সন্দেশ ওদের সামনে ধরে দিয়ে অপর্ণাকে উদ্দেশ করে বললেন, হাতে জল দিয়ে প্রসাদটুকু খেয়ে নাও মা। বারীন কিন্তু তোমার কথা একদিনও বলে নি। ও আমার ভারি চাপা ছেলে।

বারীন প্রতিবাদ করল না, নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

ও কি এখানেই থাকে?—প্রশ্ন করলেন মহিলাটি।

বারীন বলল, না, এই কিছু দিন হল এসেছে।

অপর্ণার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, আবার যেদিন আসবে, ওকে নিয়ে এসো। এক বেলা থাকবে আমার কাছে। বড্ড ফাঁকা লাগে একা একা।

শেষের দিকে কেমন কোমল এবং করুণ শোনাল কথাগুলো। বারীন বলল, বেশ তো, আর একদিন নিয়ে আসব। আপনার যতক্ষণ ইচ্ছা রাখবেন। আজ কিন্তু আর বসব না মাসীমা। হ্যাঁ, আপনার পৈতে এবার একটাও পড়ে নেই। বেশ ভালো দাম পেয়েছি।—বলে পকেট থেকে দুখানা এক টাকার নোট বের করে রাখল ওঁর পায়ের কাছে। উনি মনে মনে কী সব হিসাব করে মাথা

নেড়ে বললেন, কিন্তু এতটা তো হতে পারে না। কত করে বিক্রি করেছ?

বারীন যে রীতিমত বিপদে পড়েছে, তার মুখ দেখেই অপর্ণার বুঝতে বাকি রইল না। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে উনি বোধ হয় টের পেলেন না। সেই সুযোগ নিল বারীন। আমতা আমতা করে বলল, যাকে বেচতে দিয়েছিলাম সে ওই দু টাকাই তো দিয়ে গেল। হিসেব-পত্তর এখনও হয় নি। আজ কিছু দেবেন নাকি?

মাসীমা আর কিছু বললেন না। উঠে গিয়ে তাকের উপরে রাখা একটি ছোট্ট বাক্সের ভিতর থেকে কাগজে জড়ানো একটা প্যাকেট বের করে এনে ওর হাতে দিলেন। তার পর আগের জায়গায় বসে পড়ে বললেন, তোমাকে তো অনেকবার বলেছি বাবা, তুমি যা করছ, আমার পেটের ছেলের চেয়েও বেশী। যেদিন আর পারব না সেদিন তো মাসীমার বোঝা তোমাকেই টানতে হবে। সেটা যতদিন ঠেকিয়ে রাখা যায়। এ থেকে যা আসে, ঠিক তাই আমাকে দিও। তাতেই আমার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।—এই বলে নোট দুখানা তুলে নিয়ে আঁচলে বাঁধলেন।

বাইরে থেকে কে বলে উঠল, বারীনবাবু এসেছেন নাকি?

মাসীমার মুখখানা হঠাৎ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। চাপা গলায় বললেন, ওকে আর কিছু দিও না বাবা। সোজাসুজি ভিক্ষে চাইতে যার মানে বাধে অথচ ধার বলে হাত পাততে লজ্জা করে না, তাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। তোমার টাকা কি ও কোনোদিন ফিরিয়ে দেবে মনে কর?

বারীন হাসতে হাসতে বলল, ভরসা খুবই কম।

তবে ?

ততক্ষণে ভদ্রলোক বারান্দায় উঠে এসে ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়েছেন। বারীন এগিয়ে গিয়ে বলল, কী খবর আপনার।

খুব ভালো খবর ব্রাদার। ম্যাঙ্গো সায়েব ডেকে পাঠিয়েছিল সেদিন। বললে—বসাক, আমি খুব দুঃখিত। হেডক্লার্কের কথা শুনে হঠাৎ তোমাকে ছাড়িয়ে দিলাম। এইবার বুঝতে পারছি কত বড় ভুল করেছিলাম। এখন তো আমার হাতে কিছু নেই। তবে রেস্ট অ্যাসিওর্ড, কোনো সেকশনে জায়গা হলেই তোমাকে নিয়ে নেব। আরে বাবা! এইবার পথে এসো। জানতুম, ডাকতেই হবে। এই শর্মা না হলে সুইনবার্ন কোম্পানির একটি দিনও চলবে না। হেঁ-হেঁ—

বারীন বলল, আমি বলছিলাম, যদ্দিন ওটা না হয়, অন্য দিকেও চেষ্টা করতে ক্ষতি কি ?

আরে, না না। ওইখানেই হবে। আর শুধু একটা মাস। হ্যাঁ, আসল কথাই তো বলা হয় নি। আজ আবার সামান্য কিছু দিতে হবে ব্রাদার। ছোট ছেলেটা জ্বরে ভুগছে, গিন্নীর কাপড় নেই, ঘর থেকে বেরুতে পারে না। আসছে মাসেই আপনার সব টাকা শোধ করে দেব। এই চাকরিটা হতে যা দেরি।

আজ তো কিছু নেই। তিন-চার দিন পরে আবার আসব, তখন—

তিন-চার দিন! আচ্ছা, কাল সকালে যদি আপনার বাসায় যাই একবার ?

বারীন একটু ভেবে নিয়ে বলল, আজ্ঞে না, কাল পেরে উঠব না।

ভদ্রলোক যখন বারীনের সঙ্গে কথা বলছিল, অপর্ণা যতবার বাইরের দিকে তাকিয়েছে, প্রতিবারই চোখে পড়েছে একজোড়া কুৎসিত চোখের চুরি-করা চাউনি। এক সময় সেটা বোধ হয় মাসীমারও নজরে পড়ে গেল। উনি তখন ওর বাড়িঘরের খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। কথার মাঝখানে হঠাৎ বলে উঠলেন, চলো, আমরা রান্নাঘরে গিয়ে বসি।

ফেরবার পথে এই পাঁচ মিনিটের দেখা বিধবা মহিলাটিই অপর্ণার সমস্ত মন জুড়ে রইলেন। চলতে চলতে এক ফাঁকে প্রশ্ন করল, ওঁর বোধ হয় কেউ নেই ?

বারীন বলল, আছে বইকি। ছেলে আছে এবং সে যে উপযুক্ত নয়—সে কথাও কেউ বলবে না।

অপর্ণা বিস্ময়ের সুরে বলল, কী করে লোকটা ?

মস্ত লোক। ক্যালকাটা পুলিসের দারোগা। অ্যাদ্দিনে হয়তো ইন্সপেক্টর হয়ে গেছে, কিংবা হবো-হবো করছে।

মাকে দেখে না ?

সে তো দেখতেই চায়, উনি দেখা দিতে চান না।

দোহাই তোমার, হেঁয়ালি ছেড়ে সোজা ভাষায় একটা কথা বলো দিকিন।

বারীন হেসে ফেলল, ঘটনাগুলো কি সোজা রাস্তায় ঘটে যে, সোজা ভাষায় বলব ? এই ওঁদের বেলাতেই দেখ। দারোগা মানুষ। থানার ওপরে মস্ত বড় সরকারী বাসা। মা বউ নিয়ে স্বচ্ছল সংসার। একদিন দরজার আড়াল থেকে মায়ের নজরে পড়ল, একটা লোক

ছেলের পা জড়িয়ে ধরে কী সব বলছে, কিন্তু ছেলে মোটেই আমল দিচ্ছে না। তার পর বেরোল একটা নোটের বাণ্ডিল। চলে গেল প্যান্টের পকেটে। সঙ্গে সঙ্গে জল হয়ে গেলেন দারোগাবাবু। বাইরে আসতেই চেপে ধরলেন মা : কিসের টাকা তোর পকেটে? ছেলের উত্তরটা ঠিক জানা নেই। আমতা আমতা করে হয়তো বলে থাকবে কিছু। হুকুম হল : ফিরিয়ে দাও টাকা। লোকটা তত্ক্ষণে চলে গেছে। তা ছাড়া ফিরিয়ে দিতে গেলে ব্যাপারটা হয়তো অন্য দিক দিয়ে জটিল হয়ে দাঁড়াবে। কে শোনে সে কথা? প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, যে ছেলে ঘুষ খায়, তার মা নই আমি; তার বাড়িতে জলগ্রহণ করব না। দারোগার মেজাজ তো! উত্তরে হয়তো কড়া কিছু বলে থাকবে। তার সঙ্গে আবার একটু ফোড়ন মিশিয়েছিলেন বউমা। বাস। এক কাপড়ে উঠলেন এসে ওই স্বামীর ভিটেয়। তার পর অনেকবার এসেছে ছেলে-বউ। পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছে। কিন্তু মায়ের পণ ভাঙাতে পারে নি।

অপর্ণা একমনে শুনছিল। এবার প্রশ্ন করল, তুমি ওঁর দেখা পেলে কেমন করে?

ওই পাড়ায় আমার অন্য মক্কেল আছে তো। তাদের খোঁজে এসে। খাসা নামটা দিয়েছিস। মক্কেলই বটে।

ওই পৈতে ছাড়া কি ওঁর আর কোনো সম্বল নেই?

ছিল। খান দুই ঘর ভাড়া দিয়েছিলেন। কিছু কিছু আসত। এখন আর আসে না। ভাড়াটের অবস্থা তো দেখলি।

ওই ওঁর ভাড়াটে! ওই জোচ্চোরটা!

আহা, গালাগালি দিচ্ছিস কেন? জোচ্চুরি আবার করল কোথায়?

জোচ্চুরি নয়! ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা নেই, ইচ্ছেও নেই, তবু বলে ধার।

ওটা জোচ্চুরি নয়, চক্ষুলজ্জা। কী করবে বল? জাতটার নাম যে মধ্যবিত্ত—যাদের আদ্য-মধ্য কোনো বিত্তই নেই, অথচ ভদ্রতার খোলসটা ছাড়া চলে না। বিত্ত একেবারে নেই, তাই বা বলি কেমন করে? আছে এক ঝুড়ি অভিমান আর খানিকটা ফাঁকা মর্যাদাবোধ। তাই হাতটা সোজাসুজি না বাড়িয়ে একটু ঘুরপথে বের করে; যাকে বলে দেনার আড়াল দিয়ে দান গ্রহণ। সেটা তো শুধু ওর দোষ নয়, ওর জাতের ধর্ম। লোকটা যে ভদ্রলোক। তাই তো তোকে বলছিলাম সেদিন, এই মাঝের তলায় যারা থাকে, তাদের মতো দুঃখী আর নেই।

বারীন যখন যা কিছু বলে তারই মধ্যে থাকে একটা প্রচ্ছন্ন পরিহাসের সুর। এটা তার চিরদিনের স্বভাব। কিন্তু এই শেষের কথাটা কেমন গভীর শোনাল তার কণ্ঠে। মনে হল, যেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে গিয়েও ফেলল না। অপর্ণা একবার তার মুখের দিকে তাকাল। অস্পষ্ট আলোয় বিশেষ কিছু দেখা গেল না। বাকী পথটুকু দুজনে নীরবেই পার হয়ে এল।

পর পর তিন-চার দিন বারীনকে খুব ব্যস্ত দেখা গেল। সকালে বেরিয়ে যাচ্ছে, ফিরছে অনেক বেলায়। স্নানাহার এবং খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর আবার একদফা ঘুরে এসে দরজা বন্ধ করে রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত চলে ওদের গোপন আসর। তারই ফাঁকে ফাঁকে বন্ধুদের আনাগোনা। সবারই মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া।

একটা কিছু ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে, যার জন্যে সবাই উদ্বিগ্ন। অপর্ণার সঙ্গে দেখাশোনা যদিবা হয়, কথাবার্তা বিশেষ কিছুই হয় না।

সেদিন সকালে খানিকটা পড়াশুনা সেরে বারীনের ঘরের সুমুখ দিয়ে যেতে গিয়ে দেখল, সে চুপ করে শুয়ে আছে। অপর্ণা ঘরে ঢুকে বলল, ও মা, আমি মনে করেছি, তুমি বেরিয়ে গেছ! এ রকম অসময়ে শুয়ে যে? শরীর ভালো তো?

বারীন এতগুলো প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে উঠে বসল এবং অপর্ণার দিকে একদৃষ্টে কয়েক মিনিট চেয়ে থেকে বলল, তোকে একটা কাজ করতে হবে পরী।

কী কাজ?—উদ্বেগের সুরে জিজ্ঞাসা করল অপর্ণা।

মনে আছে, একদিন বলেছিলাম তোকেও আমাদের দলে আসতে হবে? সেদিনটা এতকাল ঠেকিয়ে ঠেকিয়েই এসেছি। আর বোধ হয় ঠেকানো গেল না।

কী হয়েছে, আমাকে খুলে বলো বারীনদা।—বলে অপর্ণা বসে পড়ল ওর তক্তপোশের এক পাশে। বারীন একটু যেন ইতস্তত করে কুণ্ঠার সুরে বলল, অনেকগুলো পরিবারের ভার পড়েছে ঘাড়ের ওপর, এদিকে টানবার ক্ষমতা নেই। খবর পেলাম প্রায় বাড়িতেই হাঁড়ি চড়ছে না। তার ওপর আর এক বিপদ। হাজার দুয়েক টাকার মাল ছিল আবদুলের কাছে। তারও কোনো খবর নেই। যদি ধরা পড়ে থাকে, তা হলেই সর্বনাশ।

অপর্ণা চমকে উঠল। আস্তে আস্তে বলল, কী মাল?

কোকেন।

অ্যাঁ!—একটা ভীতি-বিহ্বল অস্ফুট শব্দ শোনা গেল অপর্ণার মুখে। আর কোনো কথা বলতে পারল না।

বারীন বলল, সে যাক গে। তোকে যা বলছিলাম। সেই বাক্সটা তো দেখেছিস! নিয়ে বেরোবি একবার?

অপর্ণার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি বলে ফেলল, না না, ও-সব আমি পারব না। তার চেয়ে আমার গয়নাগুলো নিয়ে যাও। ওই দিয়ে যা হয় করো। তোমার ওই বাক্স নিয়ে ঘোরা আমাকে দিয়ে হবে না।

তোর ওই জিনিস কখানার কথাও আমি ভেবেছি। কিন্তু এ সময়ে ওটা আমরা হাতছাড়া করতে পারি না। ওর দরকার হয়তো পরে আসছে। আবদুল যদি ধরা পড়ে থাকে, ছাড়াতে হবে তো? তার মানে অনেক টাকার ব্যাপার।

একটু অপেক্ষা করে আবার বলল বারীন, তোকে আমি বলতাম না পরী। আমি নিজেই বেরোতাম সুটকেসটা নিয়ে। কিন্তু আমাকে আজ সারাদিন ওই আবদুলের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। কখন কী খবর আসে! তা ছাড়া তুই যা ভাবছিস, তেমন কিছু অন্যায় তো আমরা করছি না। লোক ঠকাতে হবে, তা ঠিক। কিন্তু ভেবে দেখেছিস ঠকছে কারা? যাদের অনেক আছে, অঢেল আছে। আর কাদের জন্য ঠকাচ্ছি? যাদের কিছুই নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো না খেয়ে ছটফট করছে। তাদের দুটো মুড়ি কি করে জুটবে সেইটাই ভাববার কথা, না, কোন্ রাজার নন্দিনী পাঁচ টাকার জিনিস পঁচিশ টাকায় কিনে একটু ঠকলেন, তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে! এর মধ্যে দোষটা কোথায় দেখলি?

অপর্ণা অনুনয়ের সুরে বলল, আমাকে ভুল বুঝো না বারীনদা। দোষ-গুণ বা ন্যায়-অন্যায়ের কথা আমি তুলি নি। ওসব আমি কী জানি? তুমি বলছ, এই আমার কাছে যথেষ্ট—সেই এতটুকু যখন ছিলাম, তখন থেকে এই কথাই তো জেনে এসেছি। তোমার সেই পরীকে আজ ভুলে গেলে?

স্বরটা কেমন বদলে গেল। শেষের দিকে রয়ে গেল বোধ হয় একটু অভিমানের রেশ। বারীন জবাব দিল না, হয়তো এটা প্রশ্ন নয় বলেই। ওর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে আবার বলল অপর্ণা, আমি ভাবছিলাম, কী বলতে কী বলব! কেউ যদি ধরে ফেলে? এমন কিছু জিজ্ঞেস করে, যা আমি জানি না? কী মুশকিল হবে তা হলে! না, লক্ষ্মীটি, ওসব তুমি আর কাউকে দাও।

বারীন হেসে ফেলল, আচ্ছা ভীতু দেখছি! ধরবে আবার কে? আমরা তো আর জোর করে চাপাতে যাচ্ছি না। যার খুশি কিনবে, না হয় কিনবে না।

ওর পিঠের উপর হাত বুলিয়ে বলল, কিছু ভয় নেই। যা বলতে হবে না-হবে, সব আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। বালিগঞ্জের দিকে বরং না গেলি। হঠাৎ-বড়লোক বাঙালী মহিলারা একটু বেশী সেয়ানা। তা ছাড়া নজরও ছোট। দু শো টাকার জিনিস কিনতে হলে দু টাকা থেকে দর করতে শুরু করবে। তার চেয়ে বড়বাজারে যা। মারোয়াড়ী-গিন্নীদের পটানো অনেকখানি সোজা।

কিন্তু আমি যে কোনো দিকই চিনি না।—নিরুপায় ভাবে বলল অপর্ণা।

চেনাবার ব্যবস্থা আগেই করে দিয়েছি। অমল যাবে তোর সঙ্গে।

বারীনকে যাই বলুক, ওর নির্দেশে একটু বিশেষ রকম সাজগোজ করে অমলের সঙ্গে যখন বেরিয়ে পড়ল অপর্ণা, যে কথাটা তার মনের মধ্যে তোলপাড় করে ফিরতে লাগল, সে হচ্ছে ওই ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব। একজন তার সরল মনের বিশ্বাস এগিয়ে দিচ্ছে তোমার কাছে; তুমি জেনেশুনে তার ওপরে ছুরি চালাচ্ছ। এ শুধু অন্যায় নয়, পাপ। সে লোকটা অনেক টাকার মালিক বলেই তোমার সব দোষ কেটে গেল, সব অন্যায় ঢেকে গেল—এ কথা কেমন করে মানবে সে? যা অন্যায় তা সব ক্ষেত্রে, সকলের বেলাতেই অন্যায়। পাত্র-বদল হলেই তার রূপ বদলায় না। গুরুত্বের হয়তো কিছু তারতম্য ঘটে; কিন্তু দোষ দোষই থেকে যায়।

অমল চলেছিল আগে আগে। তার হাতে সেই স্যুটকেস। সেই দিকে চেয়ে অপর্ণা একবার থমকে দাঁড়াল, তীব্র ইচ্ছা হল ফিরে যায়। মুখ থেকে বেরিয়ে গেল: শুনুন। অমল ফিরে তাকাল। কাছে এসে বলল, একটা রিকশা ডাকব? লজ্জিত হল অপর্ণা: না না, রিকশা কী হবে? চলুন। সেই মুহূর্তে তার চোখের উপর ভেসে উঠল, আজই সকালে দেখা বারীনের সেই চিন্তাকুল মুখ, কপালের ওপর স্পষ্ট হয়ে ওঠা উদ্বেগের রেখা; থেমে থেমে বলছে: অনেকগুলো পরিবারের ভার পড়েছে ঘাড়ের ওপর···খবর পেলাম প্রায় বাড়িতেই হাঁড়ি চড়ছে না। ফিরে যাওয়া হল না। ততক্ষণে ট্রাম-লাইন এসে গেছে। একটা স্টপেজের কাছে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল অমলকে, এর পরে আবার হ্যারিসন রোডে অন্য ট্রামে উঠতে হবে, তাই না?

অমল বলল, হ্যাঁ।

গেট-ওয়ালা চারতলা বাড়ি। বাইরে দাঁড়িয়ে দারোয়ান খইনি টিপছে আর কার সঙ্গে গল্প করছে। পিঠের ওপর ঝুলছে চামড়ার ফিতেয় বাঁধা বন্দুক। খানিকটা দূর থেকে অমল বলল, ওখানে একবার দেখলে হয়; বেশ বড়লোক বলে মনে হচ্ছে। অপর্ণার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল—এইবার শুরু হবে তার পরীক্ষা। কিন্তু বাইরে কোনো দুর্বলতা প্রকাশ পেতে দিল না। সহজভাবেই বলল, বেশ তো। বাক্সটা দিন তা হলে। ঘুরে আসি একবার।—বলেই কোনো দিকে না তাকিয়ে গম্ভীরভাবে ভিতরে ঢুকে পড়ল। দারোয়ান এল ছুটতে ছুটতে। অপর্ণা তার সদ্যোলব্ধ হিন্দী ভাষায় জানাল, সে জুয়েলারি এমপোরিয়মের প্রতিনিধি, খোদ 'মালকিনী'র সঙ্গে ভেট করতে চায়। গয়নার 'ফরমাজ' আছে। দারোয়ান একজন চাকরকে ডেকে হাত পা নেড়ে কী সব নির্দেশ দিল। চাকর ওকে সসম্ভ্রমে নিয়ে গেল তেতলায় এবং ঝিয়ের জিম্মায় রেখে সরে পড়ল। ঝিয়ের প্রশ্নের উত্তরে ওই একই কথা জানাল অপর্ণা, এবং তাকে অনুসরণ করে অনেকগুলো ঘর পেরিয়ে অন্দর-মহলে গিয়ে পৌঁছল।

সেটা বোধ হয় গৃহিণীর বিশ্রামকক্ষ। মাঝখানে অনেকটা জায়গা মূল্যবান পুরু কার্পেটে ঢাকা। দু-তিনটা বিশাল তাকিয়া গড়াগড়ি যাচ্ছে। তারই একটার গায়ে ততোধিক বিশাল দেহ এলিয়ে দিয়ে পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন মারোয়াড়-মহিষী। একজন দাসী পদসেবায় নিযুক্ত। আর একজন দাঁড়িয়ে আছে শিয়রের কাছে, বোধ হয় হঠাৎ কোনো হুকুমের প্রতীক্ষায়। পা দুটো টেনে নিয়ে ওরই মধ্যে একটু সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করলেন এবং অপর্ণাকেও বসবার ইঙ্গিত করলেন। তারপর জানতে চাইলেন ওর আসবার উদ্দেশ্য। দু-চার

কথায় তারই একটু আভাস দিয়ে অপর্ণা স্যুটকেসটা খুলে ধরল। গিন্নী সেদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মাথার-কাছে-দাঁড়ানো ঝিটাকে কী বললেন, এবং সে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুটি তরুণী এক রকম ছুটতে ছুটতে এসে বসে পড়ল সেই কার্পেটের উপর। চেহারা এবং বেশভূষা দেখে অপর্ণা অনুমান করল এরা এ বাড়ির বউ। এসেই একজন তুলে নিল একটা নেকলেস, আর একজন, আর্মলেট। দুজনেরই চোখে মুখে ফুটে উঠল খুশির ঝলক। তার পর গিন্নীর সঙ্গে চলল তাদের কথাবার্তা, যার প্রায় সবটুকুই অপর্ণার কাছে একেবারে দুর্বোধ্য। গিন্নী গয়না দুখানা ওদের হাত থেকে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে, আলোর দিকে ধরে গভীরভাবে পরখ করতে লাগলেন। তারই ফাঁকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে জেনে নিলেন, দোকানটা কোথায় এবং সেখানে গেলে আরও জিনিস দেখতে পাওয়া যাবে কি না! দোকানের উল্লেখে অপর্ণা একবার চমকে উঠল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কার্ডগুলো দেখিয়ে জবাব দিল, ওঁদের কষ্ট করে যাবার দরকার কী; যে যে জিনিস চাই, বলে দিলে সে নিজেই আর একদিন নিয়ে আসতে পারে। আরও কিছুক্ষণ কী সব আলোচনা হল বউদের সঙ্গে। কথাগুলো না বুঝলেও মোটামুটি ধরতে পারল অপর্ণা, গিন্নীর ইচ্ছা জিনিসগুলো সরকার মশাইকে দিয়ে যাচাই করে দেখা। কিন্তু বউ দুটির ধারণা, এ ব্যাপারে সরকার যদি নাক গলায়, তার পর কর্তাদের কান এড়ানো যাবে না, এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত হয়তো সবটাই ফেঁসে যাবে। মহিলাটি তা সত্ত্বেও জিদ করতে লাগলেন, এবং ঝিকে দিয়ে সরকারকেই বোধ হয় ডেকে পাঠালেন। বউরা ক্ষুণ্ণ মনে উঠে চলে গেল।

মারোয়াড়-গৃহিণী এবার অপর্ণার দিকে নজর দিলেন। জানতে চাইলেন কোথায় দেশ, কে কে আছে তার, বিয়ে হয়েছে কি না? তার পর যোগ করলেন, তার বয়সী একটি মেয়ের পক্ষে এতগুলো দামী গয়না নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ক্যানভাসিং করতে বেরুনো একেবারেই ঠিক হয় নি। এই কলকাতার শহরে রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে আছে গুণ্ডা আর বদমাশ। বিপদ ঘটতে কতক্ষণ!

অপর্ণা ওঁর ভাষাটা ঠিক বুঝল না। কিন্তু একটি অনাত্মীয় বিদেশিনী মহিলার এই আন্তরিক উৎকণ্ঠার সুর তার অন্তর-স্পর্শ করল। জবাব দেবার মতো বিশেষ কিছুই ছিল না। মাথা নীচু করে শুনে গেল। একবার শুধু বলল, সে একা আসে নি, সঙ্গে লোক আছে, এবং সে বাইরে অপেক্ষা করছে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই সরকার-জাতীয় একটি প্রৌঢ় মারোয়াড়ী ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে এসে পড়লেন এবং মনিবপত্নীর সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে গয়না দুখানা নিয়ে চলে গেলেন। অপর্ণার বুক টিপটিপ করতে লাগল। গিন্নী আবার গল্প জুড়ে দিলেন তার সঙ্গে। আধ ঘণ্টা পরে সরকার এসে বললেন, বিলকুল ঝুঁটা, এবং রুক্ষভাবে তাকালেন অপর্ণার দিকে। মনিব-জায়াকে বোঝালেন, এই রকম এক দল লোক ব্যবসার নাম করে লোক ঠকিয়ে বেড়ায়, মোটা মাইনে দিয়ে মেয়েছেলে ক্যানভাসার রাখে, যাতে করে অন্দর-মহলে জাল ফেলবার সুবিধা হয়। একে পুলিসে দিলেই গোটা দলটা ধরা পড়বে, এবং এই মুহূর্তে সেইটাই ওদের একমাত্র কর্তব্য। অপর্ণা প্রতিবাদ করতে চাইল। কিন্তু মনে হল, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। গিন্নী সরকারের প্রস্তাবে সায় দিলেন না। বললেন, ওর

দোষ কী? ছেলেমানুষ, দোকান থেকে যা দিয়েছে, তুলে নিয়ে এসেছে।

গয়না ছুটো ফিরিয়ে দিয়ে অপর্ণার দিকে চেয়ে সস্নেহে বললেন, তুমি এবার এসো বাছা। এ সব জিনিস এখানে চলবে না।

নতুন করে আর কোথাও ভাগ্য-পরীক্ষার উৎসাহ অপর্ণার চলে গিয়েছিল। সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে মনে মনে স্থির করে ফেলল, সোজা বাসায় ফিরে বাক্সটা বারীনদার সামনে ফেলে দিয়ে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেবে—এ সব কাজ আমাকে দিয়ে হবে না, আর এ পথও তোমাকে ছাড়তে হবে। কিন্তু রাস্তায় বেরুতেই অমল যখন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সাগ্রহ প্রশ্ন করল, নিলে কিছু ওরা, তখন শুধু মাথা নেড়ে জবাব দেওয়া ছাড়া আর কিছুই বলা হল না। এই ছেলেটি বারীনের দলের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। অপর্ণার বয়সীই হবে বোধ হয়। ভারি লাজুক। কখনও ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। এবারেও তেমনই মাটির দিকে চেয়ে চিন্তিত মুখে বলল, একেবারে খালি হাতে ফিরে গেলে···বারীনদা বার বার করে বলে দিয়েছেন ··কিছু টাকা অন্তত···। তারপর যেন হঠাৎ আবিষ্কার করেছে, এমনভাবে মাথা তুলে বলল, আমরা বোধ হয় ভুল করেছি। মারোয়াড়ী-পাড়ায় এসব জিনিসের আদর নেই। ওদের গয়না মানে তো ভারী ভারী সোনার তাল। তার চেয়ে এক কাজ করলে হয়। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে একটা বাড়ি দেখে এলাম। মস্ত বড় মোটর দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা বোধ হয় পারসী। বেশ শৌখিন বলে মনে হল। ওখানে হয়তো কিছু সুবিধে হতে পারে।

বেশ, তাই চলুন।—শুষ্ক কণ্ঠে বলল অপর্ণা।

রেলিং-ঘেরা-কম্পাউণ্ড-ওয়ালা আধুনিক গড়নের বাড়ি। গেটে ঢুকেই লাল কাঁকর-ছড়ানো রাস্তা। দু ধারে ফুল এবং পাম গাছের টব। লোকজন কেউ নেই। কার্পেট-মোড়া সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে উপরে উঠে গেল অপর্ণা। হলের সামনে পড়তেই একজন উর্দি-পরা চাপরাসী বেরিয়ে এসে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করল, কাকে চাই? অপর্ণা জানতে চাইল, অন্দরমহলে যাবার রাস্তা কোন্ দিকে। চাপরাসী উত্তর দেবার আগেই পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন নিখুঁত-সাহেবী-পোশাক-পরা একটি মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। খানিকক্ষণ বিস্ময়-ভরা চোখে তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে, তারপর নমস্কার করে ইংরেজীতে বললেন, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে আসুন।

অপর্ণার ইংরেজী-বিদ্যার দৌড় বেশী নয়। তারই সাহায্যে সে কোনোমতে জানাল, আমি একটা জুয়েলারি ফার্ম থেকে আসছি। মেয়েদের সঙ্গে দেখা করে দু-একটা নমুনা দেখাতে চাই।

জুয়েলারি!—বলে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক: বেশ তো, আমাকে দেখাতে আপত্তি আছে কিছু?

না, আপত্তি আর কী?

বারান্দা পার হয়ে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর। সেখানে নিয়ে গিয়ে একটা সোফা দেখিয়ে অপর্ণাকে বসতে বললেন ভদ্রলোক, এবং নিজেও বসলেন তার পাশের কৌচটিতে। এক্স্কিউজ মী।—বলে সুটকেসটা ওর হাত থেকে নিয়ে রাখলেন একটা সুদৃশ্য টিপয়ের উপর। তার পর ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন, আপনাকে বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে। একটু চা আনতে বলি?

না না, চা খাই না আমি—কুণ্ঠা-জড়ানো লজ্জার সুরে বলল অপর্ণা।

তা হলে একটু কোল্ড ড্রিঙ্ক ?

কিচ্ছু দরকার নেই।

দরকার আছে বইকি।—বলে একটা কী নাম ধরে হাঁক দিলেন এবং চাকরগোছের একজন লোক আসতেই দুটো আইসক্রীমের অর্ডার দিলেন। অপর্ণার দিকে ফিরে বললেন, কোন্ ফার্ম থেকে আসছেন আপনি ?

অপর্ণা স্যুটকেস খুলে একখানা কার্ড বের করে দিল ওঁর হাতে। উনি তার উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না; এদের সঙ্গে আপনার টার্ম্‌স্ কি রকম ? মানে কতটা মাইনে-টাইনে দেয় ?

অপর্ণা মহা সমস্যায় পড়ল। একবার ভাবল, বলে দেয়—এটা আমাদের নিজেদের ফার্ম, কাজেই মাইনের কথা ওঠে না। তার পরেই মনে হল, এই রকম একটা সম্ভ্রান্ত জুয়েলারি দোকানের যারা মালিক, তাদের বাড়ির কোনো মেয়ের পক্ষে ফেরি করতে আসাটা শুধু অস্বাভাবিক নয়, অশোভন। অথচ উত্তর একটা দিতেই হবে। তাই কোনো রকমে বলে ফেলল, আপাতত এক শো টাকা করে দিচ্ছে।

এক শো টাকা!—কপাল কুঞ্চিত করে তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন ভদ্রলোক, আই শুড সে, মিস—,আপনার নামটা জানতে পারি ?

অপর্ণা চ্যাটার্জি।

আই মাস্ট সে মিস চ্যাটার্জি, ওরা আপনাকে ভয়ানক ঠকাচ্ছে। সার্টেন্‌লি ইউ ডিসার্ভ মাচ মোর। অন্য যে কোনো জায়গায় আপনি এর চেয়ে বেশী রোজগার করতে পারেন। এই ধরুন, আমার

আপিসে। আপনার মতো এই রকম একজন স্মার্ট প্রাইভেট সেক্রেটারির জন্যে আমি অনায়াসে ছু শো টাকা দিতে পারি। কাজ বিশেষ কিছুই নয়। আমার যে সব ভিজিটর আসেন, বেশীর ভাগই বড় বড় ব্যবসায়ী, তাঁদের রিসিভ করা, আর আমার পার্সনাল ডায়রি রাখা। মানে, এনগেজমেন্টগুলো লিখে রেখে ঠিক সময়ে মনে করিয়ে দেওয়া।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আর-একবার অপর্ণার দিকে চেয়ে আবার বললেন ভদ্রলোক, আপনি যাই বলুন মিস চ্যাটার্জি, এ কাজ আপনার নয়। স্যুটকেস হাতে করে দোরে দোরে গয়না ফেরি করে বেড়ানো আপনাকে একেবারেই মানায় না। বলুন, রাজী আছেন আমার প্রস্তাবে ?

এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবের আকর্ষণে না হলেও এর আকস্মিক নূতনত্বে খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়েছিল অপর্ণা। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারল না। ভদ্রলোক কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে বললেন, ঠিক এই মুহূর্তেই আপনার জবাব চাইছি না। আপনি ভেবে দেখুন। দরকার হলে আপনার অভিভাবকদের সঙ্গেও পরামর্শ করে দেখতে পারেন। কাল পরশু যখন হোক জানিয়ে দেবেন। এই নিন আমার কার্ড।

ওর দিকে বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়ে কার্ডখানা এগিয়ে ধরলেন ভদ্রলোক। অপর্ণার নাকে গেল একটা পরিচিত গন্ধ, অনেক রাতে কোনো কোনো দিন দরজা খুলে দিতে গিয়ে যেটা পাওয়া যেত তার বাবার মুখ থেকে। সমস্ত শরীরটা ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠল। কার্ডখানা নিতে গিয়ে হঠাৎ নজর পড়ল ওঁর চোখের দিকে। আপনার

অজ্ঞাতে বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল অপর্ণার। আর কোনো কথা না বলে উঠে পড়তে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে ট্রের উপরে আইসক্রীমের গ্লাস সাজিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল সেই বেয়ারাটা। ভদ্রলোক নিজেকে খানিকটা সরিয়ে নিয়ে বললেন, নিন, গলাটা একটু ভিজিয়ে নিন। যা গরম!

অপর্ণা আর 'না' বলল না। নিঃশব্দে গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুমুক লাগাল। সেই মুহূর্তে যে কোনো একটা পানীয়ের সত্যিই দরকার ছিল তার। বুকের মধ্যে যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল খানিকটা যেন শান্ত হল। গেলাসটা নিঃশেষ হবার পর ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, কবে নাগাদ আপনার জবাব আশা করতে পারি?

অপর্ণা রুমালে মুখটা মুছে নিয়ে বলল, মাপ করবেন। চাকরির আমার দরকার নেই। এবার আমাকে উঠতে হবে।

উঠতে হবে কী বলছেন! ওই স্যুটকেসে কী আছে, তাই তো এখনও দেখা হয় নি!

দেখাবার মতো উৎসাহ তার একেবারেই ছিল না। কিন্তু না-দেখিয়ে চলে যাওয়াও মুশকিল। তাই নিতান্ত অনিচ্ছাভরে বাক্সটা খুলে ডালাটা তুলে ধরল। ভদ্রলোক যেন চিৎকার করে উঠলেন, বাঃ! একটা নেকলেস তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এর দাম কত?

চার শো টাকা।

নেকলেসটা চোখের সামনে রেখে কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে বললেন, টু টেল ইউ দি ট্রুথ মিস চ্যাটার্জি, নেকলেস পরাবার মতো নিজের লোক আমার কেউ নেই। তবে উপযুক্ত পাত্র পেলে এ রকম

একটা জিনিস প্রেজেন্ট দেওয়ার চেয়ে বড় আনন্দ আর কী আছে! তাই বলছিলাম—

একটু থেমে গভীর দৃষ্টিতে অপর্ণার মুখের দিকে আর-একবার তাকিয়ে বললেন, আসুন না, দেখি কী রকম মানায় আপনার গলায়!

দু হাতে হারটা ধরে উঠে দাঁড়াতেই খানিকটা ছিটকে পিছিয়ে গেল অপর্ণা, দু চোখে আগুন ছড়িয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে বলল, রেখে দিন ওখানে।

ভদ্রলোক প্রথমটা হঠাৎ থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, না না, রেখে দেব কেন? এটা আমি নিলাম। আপনি বসুন, আমি চেক-বইটা নিয়ে আসছি।

ভদ্রলোক বাইরে যেতেই অপর্ণা আর এক মুহূর্ত দেরি না করে ছুটে চলল সিঁড়ির দিকে। কয়েকটা ধাপ নামতেই পেছনে শুনতে পেল: এ কী! চলে যাচ্ছেন যে? চেকটা নিয়ে যান।

অপর্ণা আর দাঁড়াল না, ফিরেও তাকাল না। রাস্তায় পড়তেই এগিয়ে এল অমল। ওর চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল, ভয়ে ভয়ে বলল, কী হয়েছে?

কিছু না, বাড়ি চলুন।

একটা গাড়ি ডাকব?

ডাকুন।

ট্যাক্সি থেকে নেমে দরজার কড়া নাড়তেই খুলে দিল ঝি। অপর্ণা ঝড়ের মতো ঢুকল বারীনের ঘরে। উত্তেজিত স্বরে ডাকল, বারীনদা! বারীন নেই; তার জায়গায় বসে রয়েছে শরণ সিং। ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে বলল, কী হয়েছে বহিন?

এই সস্নেহ সম্বোধন অপর্ণার চোখে জল এসে পড়ল। কোনো উত্তর না দিয়ে বাক্সটা মাটিতে ফেলে ছুটে গিয়ে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। দুর্জয় ক্ষোভ আর অভিমানে ভরে উঠল সমস্ত মন। ওই বারীনদা আর তার বন্ধুরাই তো তাকে ঠেলে দিয়েছে অপমান আর অমর্যাদার মুখে। ওরা সব জানত; জেনেও এ শুধু না-জানার ভান।

আস্তে আস্তে যখন ভাঁটা দেখা দিল উত্তেজনায়, তখন আবার লজ্জিত হল। এ রকম একটা নাটক না করলেই হত। ছি-ছি, কী ভাবছে শরণ সিং, কী ভাবল অমল! বারীনদাই বা গেল কোথায়। চোখ মুখ ভালো করে মুছে বাইরে এসে দেখল, শরণ গালে হাত দিয়ে বসে আছে বারীনের ঘরের সামনে। বলল, ওদিকের সব খবর কী, শরণদা?

খবর ভালো নয়।—ওর দিকে না চেয়ে তেমনই শুষ্ক কণ্ঠে বলল শরণ সিং। অপর্ণার বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। কী সেই অমঙ্গল সংবাদ, মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারল না। শরণ নিজেই জানিয়ে দিল, আবদুল ধরা পড়েছে। বারীন গেছে তার জামিনের ব্যবস্থা করতে। আমি তোমার জন্যেই বসে ছিলাম। কিন্তু অমলের কাছে যা শুনলাম, এ দিকে বোধ হয় কোনো সুবিধে হয় নি। আমি তা হলে উঠি। বারীন আবার আশা করে বসে আছে। খবরটা একবার—

এক মিনিট দাঁড়ান, আমি আসছি।—ঘরে এসেই অপর্ণা বাক্স খুলে বের করল সেই গয়নার পুঁটলি। তারই থেকে দুটো জিনিস তুলে নিয়ে শরণের কাছে গিয়ে বলল, আজকের কাজ বোধ হয় এতেই হয়ে যাবে। যদি না কুলোয় কাউকে পাঠিয়ে দেবেন।

শরণ হতভম্বের মতো খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, এ সব কী করছ তুমি? এ তো আমি নিতে পারি না।

কী মুশকিল! বারীনদার সঙ্গে কথা হয়েছে যে!

কথা হয়েছে?

হ্যাঁ।

ঠিক তো?

বাঃ, তবে কি মিছে কথা বলছি! আপনি এবার আসুন, আর দেরি করবেন না।

বারীন যখন ফিরল, রাত এগারোটা বেজে গেছে। জামা খুলতে খুলতে বলল, তুই খেয়ে নিয়েছিস তো? অপর্ণা হেসে মাথা নাড়তেই বিরক্ত হয়ে উঠল, এ তোর ভারি অন্যায়। কতদিন বলেছি না, নটা বাজলেই আমার ভাতটা ঢাকা দিয়ে রেখে খেয়ে নিবি?

আচ্ছা, এখন থেকে তাই না হয় করা যাবে। তুমি এবার চট করে হাত-মুখ ধুয়ে এসো তো। শুধু বকুনি খেলে পেট ভরবে না। বড্ড খিদে পেয়েছে।

আমারও।—বলে হেসে ফেলল বারীন। তার সঙ্গে যোগ দিল অপর্ণা।

রান্নাঘরে পাশাপাশি খেতে বসে অপর্ণা জিজ্ঞাসা করল, তার পর? কদ্দুর কী করে এলে, বলো।

বারীন ভাত মাখছিল। হাত দুটো থামিয়ে হঠাৎ যেন নিশ্চল হয়ে গেল।

কী হল আবার!—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল অপর্ণা।

কিছু না। ভাবছিলাম, মাসীমার ওই শেষ সম্বলটুকু হাত করতে

না পেরে তোর নতুন মা নিশ্চয়ই ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলেছিলেন।

তুমি এখানে বসেই শুনতে পেয়েছিলে বুঝি? কৌতুকের সুরে বলল অপর্ণা।

না, তা ঠিক পাই নি; তবে এখন বুঝলাম। ওঁর নাগালের বাইরে এসেও কিছু বাঁচানো গেল না।

বারীনের সেই স্বাভাবিক হালকা সুর; কিন্তু তার মধ্যে একটু যেন প্রচ্ছন্ন বেদনার আভাস, অপর্ণার মনেও যার স্পর্শ লাগল। তাই একটা কোনো সহজ পরিহাসের দোলা দিয়ে বিষয়টাকে উড়িয়ে দেবার ইচ্ছা থাকলেও তা সম্ভব হল না। ক্ষণকাল নীরব থেকে বলল, আমার কী মনে হচ্ছে, জান?

কী মনে হচ্ছে?

মা যেখানে আছে, সেখান থেকে যদি আমাদের দেখতে পায়, জানতে পায় আমাদের সব কথা, তা হলে নিশ্চয়ই খুব খুশী হয়েছে। আমার চেয়েও খুশী।

বারীন কোনো উত্তর দিল না। বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল শুধু তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। তার পর আবার ভাত মাখতে শুরু করল।

পরদিন সকাল হতেই বারীন বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। কাজের অন্ত নেই। আবদুল এখনও পুলিস-হাজতে। এবার গিয়ে উকিল-মোক্তার লাগিয়ে তার জামিনের বন্দোবস্ত করতে হবে। হাতে হাতে মোটা রকম নগদ ব্যবস্থা না পেলে পুলিস-কোর্টের উকিল কখনও মাথা তোলেন না। কাল রাতেই অপর্ণা এবং স্যাকরা মিলে

তার সুরাহা করে দিয়েছে। বেরুতে যাবে এমন সময় শরণ সিং এসে উপস্থিত। দোরগোড়া থেকেই বলল, কোথায় যাচ্ছ? বারীন চোখের ইঙ্গিতেই গন্তব্য স্থানটা বুঝিয়ে দিল। শরণ জুতো খুলতে খুলতে বলল, যা করবার আমিই করব। তোমার গিয়ে কাজ নেই।

কেন?—কপাল কুঞ্চিত করে বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করল বারীন।

কেন আবার? আবদুলের জন্যে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে।

কী বলছ তুমি!

ঠিকই বলছি। তোমার যাওয়া তো হবেই না, এ বাড়িটাও আমাদের এখনই ছেড়ে দিতে হবে।

কী ব্যাপার বলো তো? হঠাৎ খেপে গেলে নাকি?

হ্যাঁ, খেপে যাবার কারণ থাকলেই খেপতে হয়। ঘরে চলো, বলছি।

বারীনের ঘরে তিনজনে মিলে বসল ওদের পরামর্শসভা। শরণ শিং আগের কথার সূত্র ধরেই জানাল, সে খবর পেয়েছে, ওদের এই কোকেন ব্যবসায়ের উপর পুলিসের নজর পড়েছে। শুধু নজর দিয়েই তারা ক্ষান্ত হয় নি, কাজের দিক দিয়েও বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। নানা কারণে এ বাড়িটা আর এক মুহূর্তও নিরাপদ নয়। এক অজানা আশঙ্কায় অপর্ণার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। শুষ্ক মুখে বলল, ভাগ্যিস তুমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলে শরণদা! আর দু মিনিট দেরি হলেই ও বেরিয়ে পড়ত। কিন্তু এত শীগগির বাড়ি পাওয়া যাবে কোথায়?

সে ব্যবস্থা আমি করে এসেছি। আমাদের পাড়ায় এই রকম একটা ছোট বাড়ি খালি আছে। গেলেই পাওয়া যাবে।

বাড়ির প্রসঙ্গে বারীন এতক্ষণ কোনো কথা বলে নি। এবার মৃদু হেসে বলল, ছ মাসের ভাড়া বাকি আছে, তা জান তো?

শরণ বলল, তোমার হাতে যে টাকা আছে, তার থেকে দিয়ে দাও।

আর ওই লোকটা জেলে পচতে থাক।—শ্লেষ-তীব্র কণ্ঠে বলল বারীন, তোমার বন্ধুপ্রীতি দেখে মুগ্ধ হলাম, শরণ সিং।

শরণ কিছুমাত্র দমে না গিয়ে বলল, বন্ধুর আসল পরিচয়টা যদি জানতে, তা হলে আর ও-কথা বলতে না। পরীর সামনে বলতে চাই নি এতক্ষণ। কিন্তু তুমি আমাকে বাধ্য কবলে।

আসল পরিচয় মানে?

মানে, আবছুল বিট্রে করেছে। আমাদের সব খবর এখন পুলিসের খাতায়।

শরণ সিংয়ের উত্তেজিত গম্ভীর কণ্ঠ হঠাৎ থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণার গলা থেকে বেরিয়ে এল একটা ভীতিবিহ্বল ক্ষীণ শব্দ। পর-মুহূর্তে মনে হল, সকলেই যেন নিশ্চল হয়ে গেছে।

মিনিট কয়েক পরে শরণই শুরু করল: তোমার নামে ওয়ারেণ্ট বেরিয়ে গেছে। আমাদের এই বাড়ির নম্বরটা ও জানে না। তাই পুলিস এখনও এসে পড়ে নি। কিন্তু বেশীক্ষণ আর দেরি হবে না।

বারীনের আনত মুখখানা থমথম করতে লাগল, কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে তার মনোরাজ্যের কোনো খবর পাওয়া গেল না। অপর্ণা ছুটে গিয়ে নিয়ে এল ওর শেষ পুঁজি। শরণের দিকে হাত বাড়িয়ে

বলল, বাড়ি-ভাড়াটা যত তাড়াতাড়ি পার মিটিয়ে দিয়ে এসো। আমি দশ মিনিটের মধ্যে সব গুছিয়ে নিচ্ছি।

ও-সব রেখে দে পরী।—মৃদুগম্ভীর সুরে বলল বারীন, বাড়ি-ভাড়া না দিলেও চলবে। শরণ, একটা গাড়ি ডেকে আনো।

অপর্ণা বলল, ছি-ছি, সেটা ভারি অন্যায় হবে।

বারীনের মুখে ফুটে উঠল সেই বক্র হাসি। বলল, তা একটু হবে। তবে তার জন্যে চিন্তার কারণ নেই। এই পঞ্চাশটা টাকা গেলে ওরা টেরও পাবে না। তোদের কবিদের ভাষায়, এটা হচ্ছে সাগরের কাছে গোষ্পদ।

একটা ঘোড়ার গাড়িতে টুকিটাকি খুচরা জিনিস সব ধরানো গেল না। শুধু বাক্স বিছানা বাসনপত্র কোনো রকমে তুলে নিয়ে চারিদিকের খড়খড়ি বন্ধ করে ওরা বেরিয়ে পড়ল ভবানীপুরের দিকে।

বাড়িওয়ালার একটি মেয়ে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসত অপর্ণার কাছে। বেশ মেয়েটি। তার বাবা-মাও যে খারাপ লোক, এ রকম কোনো পরিচয় তাঁরা দেন নি। তাঁদের ন্যায্য পাওনাটুকু শোধ না করে এই যে পালিয়ে যাওয়া, এর পেছনে আর্থনীতিক যুক্তি যদি কিছু থেকেও থাকে, অপর্ণার সাধারণ নীতিবোধ তাকে কোনোমতেই মেনে নিতে পারল না। কেবলই মনে হতে লাগল, এ শুধু অন্যায় নয়, অপরাধ। দীর্ঘ পথ সেই অপরাধের লজ্জাটাই তাকে নানা দিক থেকে বিঁধতে লাগল। অথচ বলবার বা করবার তার কিছুই নেই। এই যে মানুষটি তার পাশে নিঃশব্দে বসে আছে, মুখে যাই বলুক, তার মনের কোনো কোণে এ জন্যে এতটুকু বিকার দেখা দিয়েছে কি?

তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করল অপর্ণা। কিন্তু বন্ধ গাড়ির অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করা গেল না। এই মুহূর্তে একটি কথাই শুধু মনে হল, সংসারের এক পরম বিস্ময় এই বারীন। মানুষের জন্যে তার দরদের অন্ত নেই; আবার সেই মানুষের উপরেই সে যেমনি কঠোর, তেমনি নির্মম।

আবদুলের ব্যাপারে অনেকখানি মুষড়ে পড়লেও বারীন শরণ সিংয়ের মতে শেষ পর্যন্ত সায় দিতে পারল না। নিজে রইল নেপথ্যে, কিন্তু তদ্বিরের কোনো ত্রুটি হতে দিল না। পুলিসের কাছে জামিন না-মঞ্জুর হবার পর কোর্টের শরণ নেওয়া হল। সেখানে জন দুই উকিল মিলে দীর্ঘ বাক্যজাল বিস্তার করলেন, কিন্তু তাতে করে হাজতের দরিয়া থেকে মক্কেলকে টেনে তুলতে পারলেন না। এদিকে পুলিসের জাল ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল, এবং কয়েক দিনের মধ্যে এমন দু-চারজন তার মধ্যে জড়িয়ে গেল, যারা রুই-কাতলা না হলেও ঠিক চুনোপুঁটির দলে পড়ে না। জালের মুখটা যে এবার বারীনের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে, সেটা তার কাছেও অস্পষ্ট রইল না। সুতরাং নতুন বাসায় গা-ঢাকা দিয়ে পড়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় দেখা গেল না।

গা-ঢাকা দেবার অন্য প্রয়োজনও ছিল। কালো-বাজারের সুড়ঙ্গ-পথে কোকেন নামক পরম নেশার বস্তু পাচার করে যে অর্থাগম হত, বারীনের বাজেটে আয়ের ঘরে সেইটাই ছিল প্রধান অঙ্ক। সেই দরজাটা যখন বন্ধ হয়ে গেল, তখন যে-সব পরিবারের অন্ন যোগাবার ভার সে হাতে নিয়েছিল, তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার আর মুখ

রইল না। দৈবাৎ পাছে কারও সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, এই ভয়ে রাস্তায় বেরুবার পথও তাকে ত্যাগ করতে হল।

কিন্তু ঘরের কোণে লুকিয়ে থেকে কতদিন চলে? বিশেষ করে বারীনের মতো যাদের জীবিকার পথ সহজ নয়, সরলও নয়। দু-তিন দিন পরে এক সকালবেলা অপর্ণা কলতলায় মুখ ধুচ্ছিল। বারীন কাছে গিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি একটু চা কর দিকিন। এখুনি বেরুতে হবে।

বেরুতে হবে!—বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল অপর্ণা।

বারীন হেসে বলল, ভয় নেই; পুলিসের আরও অনেক কাজ আছে। সব ফেলে কেবল বারীন বোসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে তাদের চলে না।

ও-সব বাজে কথা রাখো। পরের বোঝা বইতে গিয়ে লাভ তো হল নিজের বিপদ টেনে আনা। এখনও শখ মেটে নি? না, বেরুনো হবে না তোমার।

খুব তো জ্যাঠাইমার মতো রায় দিয়ে বসলি! পরের বোঝা না হয় না বইলাম, নিজেদের বোঝাটাও তো চালিয়ে নিতে হবে?

এর পরে অপর্ণার মুখে আর কথা যোগাল না। সংসারের অবস্থা সত্যিই অচল হয়ে উঠেছিল। তবু একবার শেষ চেষ্টা করে বলল, বেশ, বেরুতেই যদি হয়, এখন না গিয়ে সন্ধ্যার পরে যেয়ো।

তাতে কোনো কাজ হবে না। দে, চা-টা দে; আর দেরি করিস নে।

খাবার সময় ফিরবে বলেছিল। সারাটা দিন কেটে গেল। দারুণ উৎকণ্ঠায় ঘর-বার করে অপর্ণা অস্থির হয়ে পড়ল। অথচ

করবার কিছুই নেই। শরণ সিংয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়বে কি না ভাবছে, এমন সময় ফিরল বারীন। রাত নটা বেজে গেছে।

কোথায় ছিলে সারা দিন ?—দরজা খুলেই ঝাঁজিয়ে উঠল অপর্ণা। নিতান্ত সহজ এবং নিরুত্তাপ সুরে জবাব এল, বলছি। তার আগে খেতে দিবি চল্।

খেতে বসে ওই সম্বন্ধে দু-একটা প্রশ্নোত্তর ছাড়া আর কোনো কথা হল না। অপর্ণা আগাগোড়া গম্ভীর হয়ে রইল। সেদিকে দু-একবার আড়চোখে চেয়ে বারীনও মুখ বুজে হাত চালিয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়া মিটে গেলে হেঁসেলের পাট সেরে নিজের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল অপর্ণা। বারীন এসে দাঁড়াল ঠিক দরজার সামনে।

সরো, ঘুম পেয়েছে। নীরস গম্ভীর সুর অপর্ণার।

পেলে কী হয়, ঘুম হবে না।

কেন ?

রাগের সঙ্গে ঘুমের চিরকালের বিরোধ।

রাগের কথা এল কিসে ?

আমিও তো তাই বলি—রাগের কথা এল কিসে ? চল্, ছাতে যাই। হাওয়া লাগলে মাথা ঠাণ্ডা হবে।

বারীন তার ডান হাতখানা রাখল ওর কাঁধের উপর। অপর্ণা আর আপত্তি করল না। যেতে যেতে বলল, মাথা আমার ঠাণ্ডাই আছে।

ওদের এই গলিটা সদর-রাস্তা থেকে অনেকখানি দূরে। বড় শহরের যে দুটি বৃহৎ অবদান—চোখ-ধাঁধানো আলো আর কান-ফাটানো কোলাহল, এ পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারে নি। সমস্ত

পাড়াটা এরই মধ্যে নিঝুম হয়ে গেছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। আদিগন্ত কালো পর্দার উপর এক-আকাশ তারা। চারদিকের ওই উঁচুনীচু অসংখ্য বাড়ি, দিনের আলোয় যাদের দেখে মনে হয় একটা শ্রীহীন শৃঙ্খলাহীন ইট-কাঠের জঙ্গল, চন্দ্রহীন রাত্রির এই আধ-আলো আধ-অন্ধকারে কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। ছাদের রেলিং ঘেঁসে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অপর্ণা। আকাশ বলে যে এক পরম বিস্ময় আছে পৃথিবীতে, সে কথা আজ হঠাৎ মনে পড়ল। খেয়াল ছিল না, হাতখানেক দূরে একই রেলিঙের পাশে আর-একজন মানুষ তারই মতো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ চমকে উঠল, যখন কানে গেল তার মৃদু কণ্ঠ: আমাদের সেই ছেলেবেলার কথা তোর মনে আছে পরী?

অন্তরের একটা একান্ত কোমল স্থানে যেন হাত পড়ল অপর্ণার। মানুষ তার জীবনের সব-কিছু ভুলে যেতে পারে, ভুলতে পারে না কৈশোরের সাধ আর প্রথম যৌবনের স্বপ্ন। তাদের বিগত দিনের মধ্যে এই দুটি বস্তুই যে জড়িয়ে আছে; শুধু জড়িয়ে নয়, সিঞ্চিত হয়ে আছে আনন্দ-বেদনার মধুরসে, সে কথা কি জানে না বারীনদা! অন্য দিন হলে হয়তো সে বলে উঠত, মনে নেই আবার! কিন্তু আজ তার বুক ভরে গেল অভিমানে। অন্তরের উচ্ছ্বাস চেপে রেখে তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, কী জানি বাপু, ও-সব আর ভাববার সময় নেই।

ভাবতে বলছি না। অনেক যত্ন করে তোকে আমরা নাচ-গান শিখিয়েছিলাম। সে-সব ভুলে যাস নি তো?

কেন? এই বুড়োবয়সে আবার তার পরীক্ষা দিতে হবে নাকি?

যদি বলি, হ্যাঁ।

রক্ষে করো। স্টেজে ওঠবার দিন চলে গেছে।

স্টেজে না হয় না উঠলি, ঘরে বসে মাস্টারি করতে পারবি তো?

অপর্ণা হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠল: তা মন্দ বল নি। দাও না জুটিয়ে দু-একটা টিউশানি। বসে বসে অন্ন ধ্বংস করছি; তবু দু-চার পয়সা রোজগার হয়।

টিউশানি করে আর কত রোজগার হবে! গলা ভাঙবে, পেট ভরবে না। আমি যে মাস্টারির কথা বলছি সেটা একটু অন্য রকম।

অন্য রকম! যথা?

যথাটা এখন নয়, ক্রমশ-প্রকাশ্য।

পরের সপ্তাহটা বারীন প্রায় বাইরে বাইরেই কাটিয়ে দিল। তার পর একদিন সন্ধ্যাবেলা অপর্ণাকে নিয়ে তুলল চিৎপুর অঞ্চলে কোনো গলির মধ্যে, একটা পুরনো বাড়ির দোতলায়। বেশ বড়গোছের ঘর। আধময়লা ফরাশের উপর কয়েকটা তাকিয়া। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে নানারকম বাদ্যযন্ত্র। অ্যাশট্রের উপর পোড়া সিগারেটের টুকরো। মাঝখানে একটা লম্বা-নলওয়ালা গড়গড়া। দেখেই মনে হবে, গানের আসর চলছিল; এই কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়েছে, শিল্পীরা হয়তো পাশেই কোথাও বিশ্রাম করছে। অপর্ণা চারদিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, এ আবার কোথায় নিয়ে এলে?

কেন, দেখে বুঝতে পারছিস না কী হয় এখানে?

তা তো পারছি। কিন্তু কাদের বাড়ি এটা? তারা সব গেলই বা কোথায়?

সে খবরে আমাদের দরকার নেই। যাদের নিয়ে দরকার তারা এখনই এসে পড়বে। তার আগে কী করতে হবে মোটামুটি শুনে রাখ্।

বলো।—ফরাশের একধারে বসে পড়ল অপর্ণা। বারীন তার মুখোমুখি বসে বলল, একটা বড় রকমের জলসার আয়োজন করেছি। চ্যারিটি শো। তাতে নামছেন— মানে, তোদের ভাষায় অংশ গ্রহণ করছেন, দুটি মেয়ে। তোর কাজ হল খানকয়েক বাজার-চলতি গান আর গোটা দুই নাচ ওদের শিখিয়ে দেওয়া। ভয় নেই; একেবারে আনাড়ী নয়। কাঠামোটা বোধ হয় তৈরী আছে। দরকার শুধু খড়-জড়ানো থেকে রঙ-ধরানো।

অর্থাৎ কিছুই নয়! বেশ, তা না হয় হল। কিন্তু এই চ্যারিটি শোটা কাদের জন্যে, জানতে পারি?

বারীন নিজের বুকে একটা আঙুল রেখে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম—ইস্কুলের বইতে পড়েছিলি মনে নেই?

অপর্ণা হেসে উঠল। বারীন সে হাসিতে যোগ না দিয়ে উঠে পড়ল। খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ, যাদের আনতে যাচ্ছি, তাদের সামনে আমরা কিন্তু পরী আর বারীনদা নই।

তবে?

আমি মিস্টার বোস, আর তুমি আমার পরমশ্রদ্ধেয়া সঙ্গীত-শিক্ষয়িত্রী মিস চ্যাটার্জি।

মিনিট পনেরো পরেই ফিরে এল বারীন। সঙ্গে দুটি মেয়ে। বয়স অপর্ণার মতো কিংবা কিছু বেশী। দেহে যৌবনের লাবণ্য নেই,

আছে তাকে ধরে রাখবার ব্যর্থ প্রয়াসের চিহ্ন। হাবভাব এবং সাজপোশাকে শালীনতার অভাব। চোখে মুখে অহেতুক চাপল্যের কেমন একটা কৃত্রিম চাপা হাসি ফুটিয়ে তুলে তারা যখন কাছে এসে বসল, অপর্ণার দৃষ্টি অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। বারীন আড়চোখে একবার সেদিকটায় দেখে নিয়ে বিনীত কণ্ঠে বলল, আপনার ছাত্রীদের পৌঁছে দিলাম, মিস চ্যাটার্জি। নতুন করে আমার আর কিছু বলবার সময় নেই। একটু কষ্ট করে গড়ে-পিটে নিতে হবে, শোটা যাতে ভালোয় ভালোয় উতরে যায়। আচ্ছা, আপনি তা হলে কাজ শুরু করুন। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঘুরে আসছি।

অপর্ণা ততক্ষণে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে। হঠাৎ এই 'আপনি' এবং 'মিস চ্যাটার্জি' হয়ে উঠবার কারণটাও খুব অস্পষ্ট নেই। ওই সম্মানটুকু না দেখালে এই মেয়ে দুটো বোধ হয় প্রথম থেকেই তাকে নিজেদের স্তরে টেনে নামাত। এখনও যে বিশেষ দূরত্ব ছিল তা নয়। একজন মুখ টিপে হেসে বলল, আপনি বুঝি আমাদের মাস্টারনী! অপর্ণা মনে মনে উত্তপ্ত হয়ে উঠল, কিন্তু কথা বা ব্যবহারে কোনো তাপ প্রকাশ না করে প্রশ্নটা যেন শুনতে পায় নি এমন ভাবে বলল, আপনারা কে কোন্‌টা করবেন?

উত্তরের বদলে ছাত্রী দুটি একজন আর-একজনের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। এবারে আর ওর পক্ষে বিরক্তি প্রকাশ না-করা সম্ভব হল না। একটু রুক্ষ স্বরেই বলল, এতে হাসবার কী আছে? গান আর নাচ, কার কোন্‌টা অভ্যাস আছে, জানতে চাইছি।

এবারও একজন হাসতে শুরু করেছিল। আর-একজন তাকে

একটা ধমক দিয়ে ছদ্ম গাম্ভীর্যের সুরে বলল, চুপ কর্ পোড়ারমুখী। উনি চটে গেছেন, দেখছিস না? তার পর অপর্ণার দিকে চেয়ে বলল, অভ্যাস আমাদের সবই আছে, সবই রাখতে হয়। কিন্তু তা দিয়ে কদ্দূর কী কাজ হবে সেটা আপনিই ঠিক করে দিন।

এর পরে আর কথা না বাড়িয়ে দুজনেরই একটা মোটামুটি পরীক্ষা নিয়ে অপর্ণাকে স্থির করতে হল, কে গান করবে আর কে নাচ দেখাবে। বুঝতে পারল, শেখাবার আগে যেটা শিখেছে তাই ভোলানোই হল আসল কাজ। ঘণ্টাখানেক পরে যখন হারমোনিয়ম বন্ধ করল অপর্ণা, একটি মেয়ে তার ডিবে থেকে এক খিলি পান বের করে এগিয়ে ধরে বলল, একটা পান খান দিদি।

পান খাই না আমি।

আর-একজন বলল, সেটা আপনার দাঁত দেখেই ধরা যায়। আচ্ছা, ওই বাবুটি আপনার কে হয়?

কেন বলুন তো?

তা হলে ঠিক ধরেছি।—বলে আর-এক দফা হাসির রোল তুলে সখীর গায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল।

ফাঁকা ট্রামে বাড়ি ফিরবার পথে অপর্ণা প্রায় সমস্ত রাস্তাটা গম্ভীর হয়ে রইল। বারীন কয়েকবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করল, কেমন দেখলি? হবে?

অপর্ণা উষ্মার সঙ্গে জবাব দিল, জানি না। আমি ও-সব পারব না।

বারীনের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। বলল, একেবারে কাঁচা বুঝি? কোনো রকমে দাঁড় করানো যাবে না?

অপর্ণা সে কথার উত্তর না দিয়ে কঠিন সুরে বলল, ওই দুটো জংলী কোত্থেকে জোটালে বলো দিকিন! সভ্যতা দূরে থাক, ভদ্রভাবে কথা বলতেও শেখে নি।

বারীন তেমনি মৃদু হেসেই বলল, ও! এই কথা! তা কী করবি বল্? যেখানে ওরা থাকে, সেটা সভ্যতা বা ভদ্রতা শেখবার জায়গা নয়।

কোথায় থাকে ওরা? কী করে?

থাকে একটা বিশেষ পল্লীতে। কী করে, অর্থাৎ ওদের জাত-ব্যবসার চলতি নামটা শুনলে তুই শক্ পাবি। তাই সাধু ভাষায় বলছি। ওরা হচ্ছে পতিতা।

কী বললে!—চমকে উঠল অপর্ণা।

বারীন অনেকটা যেন অসহায় কণ্ঠে বলল, উপায় কী বল্? ভদ্রঘরের মেয়ে পাই কোথায়? তাই ওদের দিয়েই কাজ চালাতে হয়, জংলীকেই ঘষে-মেজে ভদ্র বানাতে হয়। তা না হলে উপরতলার দর্শকদের রুচিবোধে আটকে যাবে। ভেতরে ভেতরে যে সম্পর্কই থাক, বাইরে নাক সেঁটকাবে, সস্ত্রীক বা সকন্যা আসতে চাইবে না। আমাদের টিকিট বিক্রি হবে না। তা ছাড়া অশাস্ত্রীয় কাজ কিছু করি নি। মনু বলে গেছেন, স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।

রত্নই বটে! কিন্তু তুমি ওদের পেলে কেমন করে?

ভয় নেই। সরাসরি যোগাযোগ করবার দরকার হয় নি। মাঝখানে দালাল আছে। এই রে! লোকটা যে একখানা হ্যাণ্ডবিল চেয়েছিল! নামকরণটা মনের মতো না হলে বিগড়ে যেতে পারে। দেখ্ তো, তোর পছন্দ হয় কিনা, মানে ঠিক আর্টিস্টিক হল কি না নাম দুটো!

নামও বুঝি বানাতে হয়েছে ?

পাঞ্জাবির পকেট থেকে এক বাণ্ডিল কাগজ বের করে একখানা বিজ্ঞাপন অপর্ণার হাতে দিয়ে বলল, নিশ্চয়ই। ওদের আসল নাম হয়তো মিছরিবালা আর বেদনাসুন্দরী। তা হলেই হয়েছে আর কী! নাম শুনে গেট থেকেই সব লোক পালিয়ে যাবে।

অপর্ণা ততক্ষণে হ্যাণ্ডবিল পড়তে শুরু করেছে। কয়েক লাইন পরেই রয়েছে আর্টিস্টদের নাম এবং পরিচয়। চোখে পড়তেই স্থান কাল পাত্র ভুলে গিয়ে সরবে হেসে উঠল।

হাসছিস যে ?—প্রশ্ন করল বারীন।

হাসব না! এ কী কাণ্ড করেছ ? নৃত্য প্রদর্শন করবেন থার্ড ইয়ারের ছাত্রী লিপিকা মজুমদার, এবং সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করবেন নবনীতা ঘোষ বি. এ.। সর্বনাশ! শুধু কবিত্বভরা নাম নয়, তার সঙ্গে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী!

তার মানে, একাধারে ত্র্যহস্পর্শযোগ। একে তরুণী, উঁচুমহলের বাসিন্দা, তার ওপর উচ্চশিক্ষিতা। এর পরেও যদি পঁচিশ টাকার সব টিকিটগুলো উড়ে না যায়, তা হলে বুঝব, আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার।

কিন্তু আসল জায়গায় যে গোল রয়ে গেল।

আসল জায়গা আবার কোন্‌টা ?

ওই নৃত্য এবং গীত। প্রথমটায় তাল কাটবে, আর শেষেরটায় সুর।

তা কাটুক। তার আগে আমাদের টিকিটগুলো কাটলেই হল।

কিন্তু মোটা টাকার টিকিট কেটে হলে গিয়ে যখন দেখবেন

তোমার দর্শকেরা যে, গানের সুর নেই আর নাচের তাল নেই, ভঙ্গী নেই, তখন দলশুদ্ধ খেপে গিয়ে তোমাদের মাথা কাটতে চাইবেন না তো?

তুই ভুলে যাচ্ছিস পরী, যে মহলটার ওপর আমাদের প্রধান ভরসা, অর্থাৎ যারা পয়সা দেয় এবং দিতে পারে, তারা ও-সব বাজে জিনিস নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা গান শোনে না, দেখে। কী গাইছে তা তারা বোঝে না, বুঝতে চায়ও না। কে গাইছে, সেইখানেই তাদের আগ্রহ। নাচের বেলাতেও তাই। ওটা মণিপুরী, না, উদয়শঙ্করী—সে সব সূক্ষ্ম-বিচারে তাদের দরকার নেই; খানিকটা হাত-পা-ছোঁড়া থাকলেই যথেষ্ট। তার ওপরে যেটা আসল প্রয়োজন, সে হচ্ছে নর্তকীটির বয়স, রূপ আর পরিচয়।

দর্শক-মনস্তত্ত্বের এই অভিনব বিশ্লেষণ কৌতুক-মেশানো আগ্রহ নিয়ে শুনে যাচ্ছিল অপর্ণা। বারীন বলে চলল, একটা পয়সাওয়ালা পাড়া আছে এই কলকাতায়, শিক্ষিতা মেয়ে সম্বন্ধে যাদের দুর্বলতা একটু বেশী। কলেজে-পড়া বাঙালী মেয়ে নাচছে, এই খবর পেলেই তারা ছুটে আসবে। সামনের লাইনে বসে মস্ত বড় হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। তাল, মান, লয় রইল কি না-রইল জানতে চাইবে না।

কিন্তু অন্য পাড়ার লোকও তো আসতে পারে, বেতাল লাফঝাঁপ আর বেসুরো চিৎকার দিয়ে যাদের ভোলানো যায় না?

মুশকিল তো সেইখানে।—অনেকটা যেন নৈরাশ্যের সুরে বলল বারীন, ওই সব নিয়ে মাথা ঘামায় এ রকম একটা বেরসিক সমাজও আছে। তারা হচ্ছে ওই দু-টাকা চার-টাকার দল। পয়সার বেলায়

ঢনঢন, দাবি করবে ষোলো আনা; আর সেটা না মিটলেই গণ্ডগোল। আমি ইচ্ছা করেই ওই সব ক্লাসের বেশী টিকিট রাখি নি। কিন্তু যা আসবে তাদের নিয়েই ভাবনা। কী আর করবি বল্? ক দিন একটু খেটেখুটে চলনসই-মত কিছু একটা দাঁড় করাতেই হবে।

সুতরাং অপর্ণাকে খাটতে হল। ক দিন নয়, বেশ কিছুদিন; এবং একটু-আধটু নয়, অনেকখানি। কিন্তু তার ছাত্রীদের বিদ্যাবুদ্ধি বা স্বভাবচরিত্রের দিক থেকে যতখানি বাধা বা অসুবিধা সে আশঙ্কা করেছিল, ক্রমশ দেখা গেল তার অনেকটাই অমূলক। বেশ সহজ এবং সুশৃঙ্খল ভাবে কাজ এগিয়ে গেল। অবাধ্যতা দূরে থাক, শ্রদ্ধাই বরং পাওয়া গেল ওদের কাছে। সেই সঙ্গে একটা সরল আন্তরিকতা।

দিন চারেক তালিম দেবার পর একদিন যেমন কাজ সেরে উঠে দাঁড়িয়েছে অপর্ণা, মেয়ে দুটি হঠাৎ ওর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বসল। সে বাধা দিয়ে বলল, এ কী করছেন! ওদের একজন বলল, বয়সে ছোট হলেও আপনি আমাদের গুরুজন। আর-একজন বলল, এখন থেকে কিন্তু ওই 'আপনি-টাপনি' বলতে পারবেন না। আমরা তো আপনার ছাত্রী। পরদিন দেখা গেল অপর্ণা কিছু বলবার আগে ওরাই এগিয়ে আসছে বিনীত আগ্রহ নিয়ে। জানতে চাইছে, এখানটা কেমন হবে, ওখানটায় কী করবে? 'দিদি' বলছে না, বলছে 'দিদিমণি'।

নির্দিষ্ট দিনে একটা নামকরা থিয়েটার-হল ভাড়া নিয়ে শুরু হল জলসা। দেখা গেল বারীনের হিসাবে ভুল হয় নি, অনুমানও মিথ্যা হয় নি। সামনেকার সারিগুলো ভরে গেছে দামী সুট, সিল্ক বা আদ্দির পাঞ্জাবি এবং জমকালো শাড়ি-গয়নায়। তার মধ্যে একটা

বড় অংশে শোভা পাচ্ছে নানা রঙের পাগড়ি এবং টুপির বাহার। গান এবং বাজনায় যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কজন ছিলেন খ্যাতনামা শিল্পী। কিন্তু সবাইকে ম্লান করে দিল ওই লিপিকা মজুমদার আর নবনীতা ঘোষ। তাদেরই ওপরে সমস্ত হলের সহর্ষ দৃষ্টি, আগমন-নির্গমনে বিপুল হাততালির অভ্যর্থনা।

স্টেজের পেছনে নানা কাজের ফাঁকে যখনই তাকিয়েছে অপর্ণা, বারীনের চোখে দেখেছে অর্থপূর্ণ হাসি, অর্থাৎ দেখলি তো? অপর্ণা কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারে নি। সে তো জানে তার এই মহাবিদুষী ছাত্রী দুটির বিদ্যার দৌড় কতখানি। মারাত্মক ভুল দেখে উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে সে ঘেমে উঠেছে, কিন্তু দর্শকদের চোখে কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করে নি। সব একেবারে তন্ময়। অথচ অতবড় সেতারী আফসার খাঁর মালকোষ আলাপ থেমে গেছে অন্তরায়, শ্রোতাদের গোলমাল ভেদ করে আর এগোতে পারে নি।

কিন্তু এর চেয়েও কত বড় বিস্ময় যে তার জন্য অপেক্ষা করে ছিল, ভাবতেও পারে নি। সেটা এল জলসা শেষ হবার পর। পিছনে একটা ছোট ঘরে বসে সে বিশ্রাম করছিল আর অপেক্ষা করছিল, ওদিকের কাজ মিটিয়ে বারীন কখন ছাড়া পাবে! এমন সময় তার ছাত্রীরা এসে বসল তার পায়ের কাছে। ওদের মধ্যে যে বড় এবং একটু-আধটু লেখাপড়া জানে, সে বলল, কেমন হল দিদিমণি?

বেশ ভালোই হয়েছে।—উত্তর দিল অপর্ণা।

ভালো হলেই ভালো। এত কষ্ট করে শেখালে আমাদের।

আমার আর কী কষ্ট! তার চেয়ে অনেক বেশী খাটতে হয়েছে তোমাদের।

মেয়েটি একবার তাকাল তার সঙ্গিনীর মুখের দিকে। চোখের ইশারায় কী কথা হল দুজনের। তার পর আঁচলের আড়াল থেকে একটা কাগজে-মোড়া বাণ্ডিল অপর্ণার পায়ের কাছে রেখে দুজনে একসঙ্গে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। অপর্ণা ব্যস্ত হয়ে উঠল : এ-সব আবার কী !

ও কিছু না, সামান্য একখানা কাপড়।—কুণ্ঠিত মৃদু কণ্ঠে বলল মেয়েটি, আর কীই বা দিতে পারি আমরা !

কাপড়ই বা তোমরা দেবে কেন ? না না, ও আমি নিতে পারব না।

কথাটা নিজের কানেই বড় রূঢ় শোনাল অপর্ণার। ওদের অপ্রস্তুত ভাব লক্ষ্য করে একটু নরম সুরে বলল, তোমাদের কাছ থেকে উপহার পাবার মতো কিছুই তো আমি করি নি !

উপহার !—কপালে হাত রেখে বিস্ময়ের সুরে বলল মেয়েটি, হায় কপাল ! তোমাকে উপহার দেব আমরা ! জান না, আমরা কোথাকার মেয়ে !

'কোথাকার মেয়ে' এই সামান্য ছোট্ট কথাটার মধ্যে এমন একটা কুণ্ঠাময় বেদনার সুর ছিল, যা অপর্ণাকে স্পর্শ না করে পারল না। এতদিন পরে এই বোধ হয় প্রথম পূর্ণ দৃষ্টি মেলে সে ওই পতিতা মেয়েটার মুখের দিকে তাকাল। সে আরও কুণ্ঠিত হয়ে উঠল এবং মুখ নীচু করে থেমে থেমে বলল, তোমার সঙ্গে আর তো আমাদের দেখা হবে না। তাই ভাবলাম, দুজনে মিলে একখানা কাপড় দিই দিদিমণিকে। কোনোদিন যদি পর, হয়তো আমাদের কথাটা একবার মনে পড়বে—

বলতে বলতে চোখ ছুটো হঠাৎ ছলছল করে উঠল মেয়েটির। ঠিক পাশেই মাটির দিকে চেয়ে বসে ছিল তার সঙ্গিনী। ক্ষণেকের তরে মুখখানা তুলেই আবার নামিয়ে নিল। গুছিয়ে কথা বলতে শেখে নি। সখীর কথায় জানিয়ে দিল তার নীরব সমর্থন। দুজনের দিকে আর-একবার চেয়ে দেখল অপর্ণা। তার পর কাপড়খানা তুলে নিল কোলের উপর। কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাইরে থেকে সাড়া দিয়ে ঘরে ঢুকল বারীন। মেয়ে দুটিকে লক্ষ্য করে বলল, ও, তোমরা এখানে? দুলালবাবু খোঁজ করছিলেন। তোমাদের টাকাকড়ি সব মিটিয়ে দিয়েছি।

নেপথ্যে দুলালবাবুর হাঁকডাকও শোনা গেল। মেয়ে দুটি বারীনকে ছোট্ট একটা নমস্কার করে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

দু সপ্তাহ অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর সকালের দিকে নিজের ঘরে তক্তপোশের উপর একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল অপর্ণা। দরজার বাইরে বারীনের সাড়া পাওয়া গেল : পরী ঘুমোচ্ছিস নাকি?

ঘুমোচ্ছি বই কি। আজ সারাদিন ঘুমোব। তুমি আবার কোথায় চললে এই সাত-সকালে?

বারীন সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ঘরে ঢুকল, এবং একটা সাদা খাম ওর বিছানার এক পাশে রেখে বলল, এটা তুলে রাখ্।

কী ওটা?—বলে উঠে বসল অপর্ণা, এবং বারীনের মুখে মৃদু হাসি ছাড়া আর কোনো উত্তর না পেয়ে মাথা দুলিয়ে বলল, বুঝেছি : মাস্টারনীর ফীটা একেবারে হাতে হাতে মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ভুল করলি। ফী তো আমার দেবার কথা নয়, পাবার কথা।

কিসের জন্যে, শুনি?

কেন, মাস্টারনীর মাস্টার বলে।

অপর্ণা হেসে উঠল, বটে!—তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, ঠিকই বলেছ তুমি। ফী কেন, কিছুই আমার দেওয়া হয় নি। হয়তো এ জীবনে কোনোদিনই হবে না।

কথাটা হালকা সুরে শুরু করলেও, শেষ দিকটা ঠিক হালকা রইল না। বারীন যেন সেটা লক্ষ্য করে নি এমনই ভাবে বলল, সে সব দেনা-পাওনার হিসেবনিকেশ এখন না করলেও চলবে। আসলে এটা তোরও নয়, আমারও নয়। মাসীমার যে জিনিস কখানা আমরা খুইয়েছি, এ তারই খানিকটা ক্ষতিপূরণ। মনে করেছিলাম, সবটাই পুরিয়ে রাখা যাবে। কিন্তু ওদিকে আবার অনেকগুলো মুখ হাঁ করে বসে আছে।—বলে পকেটে হাত দিয়ে আর-একখানা খাম স্পর্শ করল।

অপর্ণা মৃদু আপত্তির সুরে বলল, আমি বলছিলাম, এটাও না হয় নিয়ে যেতে। পরে আবার সুযোগমত—

বারীন তাড়া দিয়ে উঠল, যা বলছি তাই শুনবি, না খালি বকবক করবি কাজের সময়?

আঃ, বকছ কেন? শুনছি তো।

তা হলে ওটা বাক্সে তুলে রাখ্। আমি চলি। এ বেলা আর ফিরতে পারব না।

কোন্ দিকে যাচ্ছ?

হাওড়ার দিকে।

উল্টোডাঙায় যাবে না?

কেন, যাবি নাকি তুই?

হ্যাঁ ; পৈতে-কাটা মাসীমাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে !

তিনি তো নেই।

নেই !

না, দিন দশেক আগে মারা গেছেন।

অপর্ণার মুখে খানিকক্ষণ কোনো কথা সরল না। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছিল ?

হয়েছিল একটু জ্বরের মতন। আসল অসুখ তো বুঝতেই পারছিস। বাড়ি-ভাড়া বন্ধ। তারপর পৈতের দাম বলে ছু-চার আনা যা নিতেন, তাও অনেকদিন দেওয়া হয় নি। যেতেই পারি নি ওদিকটায়।

ছেলে বা বউ কেউ আসে নি শেষ সময়ে ?

বউয়ের কথা জানি না। তবে ছেলে প্রায়ই আসত। মরবার আগের দিনও নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল নিজের বাসায়। উনি যান নি ; ওদের দেওয়া কোনো জিনিসও নেন নি।

অপর্ণা আর কোনো প্রশ্ন করল না। বুকের ভিতর থেকে শুধু একটা গভীর নিশ্বাস বেরিয়ে এল। এই মহিলাটি তার কেউ নন। জীবনে মাত্র একটিবার কয়েক মিনিটের জন্যে তাঁর সঙ্গে পরিচয়। তাঁর সেই শুচিশুদ্ধ ঘরখানিতে বসে সামান্য ছু-চারটি মামুলী কথা। তবু মনে হল, তাঁর এই শোচনীয় মৃত্যু এমন একটা শূন্যতা রেখে গেল ওর অন্তরের মাঝখানে, যা হয়তো কোনোদিন পূর্ণ হবে না।

বারীন চলে যাচ্ছিল। অপর্ণা জিজ্ঞাসা করল, রেখাদের খবর কী ?

নতুন খবর কিছু নেই। দেশলাই-কারখানাটা শুনছি উঠব-উঠব

করছে। তা হলেই মুশকিল হবে।···কাল আর হয়ে উঠবে না। পরশু ভাবছি ঘুরে আসব ওদিকটায়। তখন যাস।

কিন্তু সে পরশু আর এল না। তার আগেই এল এক অভাবনীয় বিপর্যয়।

তখনও ভোর হয় নি। হঠাৎ একটা তীব্র আলো চোখে পড়তেই ঘুম ভেঙে গেল অপর্ণার। কানে এল বারান্দায় অনেক লোকের পায়ের শব্দ। তাড়াতাড়ি দরজা খুলতেই সামনে পড়ল পুলিস। উঠনেও লাল পাগড়ির ভিড়। খানিকক্ষণ লাগল আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে উঠতে। তারপর বারীনের ঘরের সামনে গিয়ে দেখল, বিছানাপত্র বাক্স-প্যাঁটরা তছনছ করে চলছে তালাশি। একজন অফিসার জন-দুই সিপাই নিয়ে এগিয়ে এলেন তার ঘরের দিকে। জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কে থাকে ?

অপর্ণা বলল, আমি।

কী নাম আপনার ?

অপর্ণা।

পুরো নাম বলুন।

অপর্ণা চ্যাটার্জি।

বারীন বোস আপনার কে হয় ?

দাদা হন।

অফিসারটি একটু হেসে বললেন, ঠিক বোঝা গেল না। উনি হলেন বোস, আর আপনি চ্যাটার্জি—

অপর্ণা একটু ইতস্তত করে বলল, আপন দাদা নন। এক জায়গায় বাড়ি ; ছেলেবেলা থেকে দাদা বলে ডাকি।

আর কিছু নয় তো?—বাঁকা চোখে তাকিয়ে যেন আপন মনে বললেন ভদ্রলোক।

কী বলছেন?

না, কিছু বলছি না। এ বাক্স কি আপনার?

হ্যাঁ।

সার্চ করব।

করুন।

বেশ স্পষ্ট করেই বোঝা গেল, সেই কোকেন-ঘটিত ব্যাপারটা এ তরফ ভুলে থাকতে চাইলেও, পুলিসের তরফ একদিনের তরেও ভোলে নি। আরও দেখা গেল, বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এলে বাড়িওয়ালাকে ফাঁকি দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগের হাত এড়ানো যায় না। এতদিন পরে যেমন করেই হোক ওরা নতুন ঠিকানা খুঁজে বের করেছে, এবং দ্বিতীয়বার পালাবার সুযোগ দেয় নি। কোকেনের গোপন ব্যবসা ছাড়া আরও গোটা কয়েক চার্জও উদ্যত হয়ে ছিল বারীন বোসের নামে। তার মধ্যে একটা হল—এই সদ্য-সম্পন্ন চ্যারিটি শো। যে সব প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করে এর লাইসেন্স চাওয়া হয়েছিল, তাদের কোনো অস্তিত্বই নাকি খুঁজে পাওয়া যায় নি।

তালাশি চলল অনেকক্ষণ। কোকেন পাওয়া গেল না। সে রকম কোনো আশা নিয়ে বোধ হয় ওঁরা আসেন নি। দু-একখানা চিঠিপত্র যা পাওয়া গেল, তারই সূত্র ধরে আবদুলের সঙ্গে বারীন বোসকেও জড়ানো যাবে, আপাতত এই আশাতেই সেগুলো হস্তগত করলেন। অপর্ণার কাছে যে খামখানা ছিল, তাও চলে গেল পুলিসের

খোলায়। বারীন তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত পুলিস-অফিসার বেশ মোলায়েম করে বুঝিয়ে দিলেন, টাকাটা ওদের উপার্জিত এবং সৎপথে উপার্জিত, সে কথা প্রমাণ হলে তৎক্ষণাৎ ফেরত দেওয়া হবে। সার্চ-লিস্ট অর্থাৎ তলাশী জিনিসের ফর্দে অন্যান্য সব-কিছুর সঙ্গে টাকাটারও উল্লেখ রইল, এবং তার জন্যে একটা রসিদও কেটে দিলে ইন্সপেক্টর সাহেব।

প্রথমে আসামী বারীন বোসের সঙ্গে অপর্ণাকেও থানায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব উঠেছিল। তার বিবৃতি নেবার পর শেষ পর্যন্ত অতদূর আর ওঁরা অগ্রসর হলেন না। যাবার আগে মিনিট দুয়েকের জন্য বারীন এল ওর ঘরে। স্বাভাবিক সুরেই বলল, চললাম পরী, মনে হচ্ছে, বেশ কিছুদিনের জন্যে। তুই আর কদ্দিন থাকবি এখানে? তার চেয়ে কুমিল্লায় ফিরে যা। আমি বরং তোর বাবাকে একখানা চিঠি লিখে দেব।

অপর্ণা চমকে উঠল : না, না। তাঁকে কিছু লিখতে যেয়ো না তুমি।

তুই তা হলে কী করবি? কী করে চলবে?

সেই ভাবনাটাই বড় হল? আর, এদিকে যে তোমার—। বলতে বলতে অপর্ণার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। বারীনকে আর সময় দেওয়া হল না। পরমুহূর্তে চোর-ডাকাতের মতো হাতকড়া পরিয়ে তাকে যখন ওরা ধরে নিয়ে গেল, অপর্ণা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ছুটে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল বিছানার ওপর। চোখের জল আর বাধা মানল না।

কিছুক্ষণ পরেই এল শরণ সিং, যেমন রোজ একবার করে আসে।

[illegible] শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল বারান্দার কোণে। অপর্ণাও যেন বলবার মতো কোনো কথা খুঁজে পেল না। শুধু একবার জানতে চাইল, তাদের তরফ থেকে করবার মতো কিছুই কি নেই? শরণ হতাশ সুরে বলল, কিছুই নেই। তবু একবার যেতে হবে উকিলের কাছে। তার আগে, দাঁড়াও, বাজারটা করে আনি।

না না, বাজার-টাজার আজ দরকার নেই। একার জন্যে আর রাঁধতে চাই না। খাবার ইচ্ছেও নেই একেবারে।

একা কেন? আমি যে আজ তোমার এখানেই দুটো খাব বলে এসেছিলাম।

সত্যি?

হ্যাঁ। এখান থেকেই সোজা কোর্টে চলে যেতাম।—এই বলে একটু এগিয়ে গেল গেটের দিকে। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি কিছু ভেবো না পরী বহিন। বারীন যদ্দিন না আসে, তোমার শরণদা তো রইল।

ঠিক এই সুরে কোনোদিন কথা বলে নি শরণ সিং। বারীনের একান্ত অনুগত ও অন্তরঙ্গ এই মিষ্টস্বভাব পাঞ্জাবী যুবকটির কাছে অপর্ণার কোনো সঙ্কোচ ছিল না। 'পরী বহিন'-এর উত্তরে সেও ডেকেছে 'শরণদা', এটা ওটা আনতে দিয়েছে, যখন-তখন ফাই-ফরমাশ খাটিয়েছে। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবে নি, এরই উপরে কোনোদিন নির্ভর করতে হবে। তাই আজ যখন এই অনাত্মীয় বিদেশী মানুষটি অত্যন্ত সহজে কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে জানাল—তোমার কোনো ভাবনা নেই, আমি তো রইলাম, অপর্ণা বিস্মিত হল যতখানি, তার চেয়ে অনেক বেশী হল অভিভূত। কোনো কথা না বলে সে শুধু

তাকিয়ে রইল শরণদার মুখের পানে। শরণ একটু এগিয়ে এসে বলল, আমরা গরিব মানুষ। সামান্য একটু কারবার আছে কলকাতায়। কোনো রকমে দিন চলে। আমাদের যদি এক বেলা জোটে, তোমারও জুটবে। তারপরে যদি দেখি, আর চলছে না, তোমাকে নিয়ে যাব আমার দেশে। কত খুশী হবে আমার বুড়ো বাপ আর আমার মা। একটা মেয়ে নেই বলে ওদের ভারি আপসোস। সে দুঃখ আর থাকবে না।

হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, যাই, চট করে বাজারটা করে আনি। নটা বেজে গেছে। থলেটা কোথায় পরী বহিন?

শুনতে শুনতে অপর্ণা কেমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। নামটা কানে যেতেই যেন জ্ঞান ফিরে এল। রান্নাঘর থেকে তাড়াতাড়ি বাজারের থলেটা নিয়ে এসে তুলে দিল ওর হাতে।

দিন কয়েক ঘোরাঘুরি করে উকিলের কাছ থেকে যেটুকু ভরসা পাওয়া গেল, তারই জোরে অনেকখানি এগিয়ে গেল শরণ সিং। তারপর এমন একটা জায়গায় এসে থেমে যেতে হল, যেখানে তার ক্ষুদ্র সঙ্গতির পক্ষে আর তল পাওয়া সম্ভব নয়। এদিকে অপর্ণার বাক্সে যে সোনাটুকু ছিল, আগেই গেছে। দুগাছা সরু চুড়ি ছাড়া গায়েও কিছু নেই। সেই শেষ সম্বল যখন সে খুলে দিতে গেল, শরণের কাছ থেকে এল প্রবল বাধা। সোজাসুজি বলে বসল, মেয়েছেলে হয়ে তুমি গায়ের গয়না খুলে দেবে, আর মরদ হয়ে তাই আমি হাত পেতে নেব, সেটা আমাকে দিয়ে হবে না পরী বহিন।

অপর্ণা শুষ্ক কণ্ঠে বলল, কিন্তু তা ছাড়া আর উপায় কী?

উপায় একটা হবেই। দাঁড়াও, একবার বারীনের সঙ্গে দেখা করে আসি। সে নিশ্চয়ই একটা কিছু বাতলে দিতে পারবে।

আমাকেও নিয়ে চলুন না।

তুমি যাবে ?

কত দিন হয়ে গেল! একবার দেখতে ইচ্ছে করে, কেমন আছে।

সেখানে তুমি নাই বা গেলে বহিন! নীচু ক্লাসের আসামী; তাদের সঙ্গে যারা দেখা করতে যায়, জেলখানার চোখে তারাও ওই নীচু ক্লাস। ভিখারীর মতো দাঁড় করিয়ে দেয় ভিড়ের মধ্যে। তার ভেতরে তোমাকে নিয়ে যেতে চাই না। আমি একাই ঘুরে আসি।

নীচু ক্লাসের আসামী! কথাটা কানে যেতেই বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল অপর্ণার। তারপর ভাবল, অস্বীকার বা অভিযোগ করবার সত্যিই কিছু নেই। আইনের চোখে বারীন নিশ্চয়ই আসামী, সমাজের চোখেও অপরাধী। আর উঁচু ক্লাসের লোকও সে নয়। কিন্তু সেইটুকুই কি সব ? কার জন্যে, কিসের জন্যে সে অপরাধী ? গায়ে একটা নিজের-হাতে-কাচা টুইলের শার্ট, আর দু বেলা দু মুঠো ডাল-ভাত, এর বেশী তো নিজের জন্যে রাখে নি, কোনোদিন কামনাও করে নি। কিন্তু আদালতের কাছে সে প্রশ্ন অবান্তর। সূক্ষ্মদর্শী বিচারক শুধু জানতে চাইবেন, কী করেছে সে ? কেন করেছে, সে কথা তাঁর নথিপত্রের কোনো জায়গায় স্থান পাবে না।

বিকালের দিকে এক সময়ে ওদিককার সব খবর জানিয়ে যাবে, এই কথাই বলে গিয়েছিল শরণ সিং। কিন্তু রাত আটটা বেজে যাবার পরেও তার দেখা নেই। বড়ই ভাবনায় পড়ল অপর্ণা।

এদিকে কালুর মাও এসে গেল তার ছেলেকে নিয়ে। বরাবরকার পুরনো ঝি। আগে ছিল ঠিকে; দু-বেলা শুধু বাসন মেজে ঘর নিকিয়ে দিয়ে যেত। বারীন চলে যাবার পর অপর্ণা যখন একা পড়ল, ছেলেকে নিয়ে এখানেই শোয় কালুর মা। ব্যবস্থাটা শরণ সিংয়ের। দু তরফেরই সুবিধে। বস্তির বাসা তুলে দিয়ে ঝি পেয়েছে ভদ্র আশ্রয়, আর অপর্ণা পেয়েছে খানিকটা নিরাপদ সঙ্গ, আর সেই সঙ্গে একটি মনের মতো বন্ধু,—ওই কালু। পাঁচ-ছ বছরের ছেলে; আগে আগে ওকে নিয়েই কাজে বেরুত কালুর মা। আজকাল প্রায়ই রেখে যায় দিদিমণির কাছে। সেও বাঁচে ওই দস্যি ছেলের হাত থেকে, অপর্ণাও বাঁচে একজন কথা বলার সঙ্গী পেয়ে। সে কথার না আছে শেষ, না আছে বিষয়বস্তুর অভাব। উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে অপর্ণা। কিন্তু ও যখন ঘুমিয়ে পড়ে, কিংবা মায়ের সঙ্গে বাইরে যায়, নতুন নতুন প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন আর থাকে না, তখনকার ক্লান্তি বোধ হয় আরও বেশী।

শরণ যখন এল, রাত প্রায় সাড়ে নটা। অপর্ণা ছুটে বেরিয়ে এল বারান্দায় : আপনার এত দেরি যে? আমি সেই বিকেল থেকে ঘর-বার করছি। ভালো আছে তো বারীনদা?

ভালো আছে বইকি। ও হচ্ছে সেই জাতের মানুষ, যারা কোনো অবস্থাতেই খারাপ থাকে না।

খুব রোগা হয়ে গেছে, না?

না তো। আগের মতোই যেন দেখলাম।

অপর্ণা ক্ষণকাল মৌন থেকে বলল, আপনি যে এত রাত করলেন? কোথাও কোনো বিভ্রাট ঘটে নি তো?

না, একটু গঙ্গার ঘাটে বসেছিলাম।

গঙ্গার ঘাটে!

হ্যাঁ, আমার একটা বিশেষ ঘাট আছে। মানে, সেটা ঘাট নয়। কাছে-ধারে বড়-একটা কেউ আসে না। যখন কোনো ভাবনায় পড়ি যার কুলকিনারা পাওয়া যায় না, তখন ওইখানটায় গিয়ে বসি।

কথাটা এমনভাবে বলল শরণ, এতখানি উদ্বেগের মধ্যেও হেসে ফেলল অপর্ণা। বলল, তা বেশ। কিন্তু ফল কী হল? নদীর কূলে বসে ভাবনার কূল পেলেন কিছু?

নাঃ। পেলাম না বলেই এলাম তোমার কাছে।

আমার কাছে!

হ্যাঁ, কারণ তার মধ্যে তুমিও আছ, আমিও আছি। তবে তোমার জায়গাটাই বড়।

ভূমিকার পরের অংশ শোনবার জন্যে অপর্ণা অপেক্ষা করে রইল। শরণ একবার তার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, বারীনের কাছে পথ জানতে গিয়েছিলাম। তার যতটুকু দেখিয়ে দেবার সে দিয়েছে। বাকিটুকু তোমার হাতে। সেখানে সে জোর করতে চায় না। বার বার করে বলেছে, পরীর মনে যদি একটুকু দ্বিধা থাকে, সে যেন না এগোয়।

কিছুই অনুমান করতে না পেরে অজ্ঞাত আশঙ্কায় অপর্ণার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। কী বলতে চায় শরণদা? এ সব কিসের ইঙ্গিত? নিজেকে আর চেপে রাখতে না পেরে সোজাসুজি বলে ফেলল: আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না শরণদা। যা বলবার খুলে বলুন।

নিশ্চয়ই। খুলে বলবার জন্যেই তো তৈরী হচ্ছিলাম এতক্ষণ। তার আগে আবার বলছি, এ শুধু একটা প্রস্তাব। নেওয়া না-নেওয়া নির্ভর করছে তোমার ওপর।

ভূমিকা যত বড়ই হোক, আসল কথাটা সামান্য। মিনিট কয়েকের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। শেষ হবার পরেও অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল অপর্ণা। তার পর মৃদু কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল, আপনারা আমাকে মাপ করবেন শরণদা। এ আমি পারব না।

আমি জানতাম পরী বহিন। বারীনকেও তাই আগেই বলে এসেছি।

অপর্ণা অধীর হয়ে উঠল : বারীনদার কথা ছেড়ে দিন। মেয়েদের জীবনের কতকগুলো দিক আছে, যেখানে সে চিরদিন অন্ধ। কিন্তু আপনিও কি আমাকে—

না, না। আমি তোমাকে কিছুই বলব না। তুমি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ, আমরা আজ সত্যিই নিরুপায়। চারদিক থেকে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। পালাবার রাস্তা নেই। ওইটুকুই ছিল একটু সরু পথের মতো। কিন্তু তোমার মন যদি সায় না দেয়, সেখানে তোমাকে কিছুতেই টেনে নামাব না। একটা কথা শুধু আমার মনে হয়েছিল। বলব?

বলুন।

শুনেছি, দেশে যখন ছিলে, তোমরা মাঝে মাঝে থিয়েটার করতে। সেখানে তোমাকে অনেক কিছু সাজতে হত, আউড়ে যেতে হত মুখস্থ-করা পার্ট। তার সবটাই মুখের কথা, মনের কথা নয়। সবটুকুই ছিল অভিনয়। এইমাত্র তোমাকে যা বললাম, সেও

ঠিক তাই। তফাত শুধু এই যে, এখানে তোমাকে স্টেজে দাঁড়াতে হবে না।

আপনি ভুলে যাচ্ছেন শরণদা, থিয়েটার করতে গিয়ে যা করেছি, অভিনয় বলে জেনে-শুনেই করেছি। যাদের সামনে করেছি, তারাও জানত এটা অভিনয়। তার মধ্যে না ছিল কারও স্বার্থ, না ছিল কারও ভালোমন্দ, লাভক্ষতির তাগিদ। আপনারা যা করতে বলছেন, সেখানে কি তাই? আমার পক্ষে সেটা অভিনয় হতে পারে, কিন্তু আর-একজনের কাছে? সে তো একে সত্যি বলেই নেবে। আমি তাকে ঠকাব; আর ঠকাতে গিয়ে ছোট হয়ে যাব নিজের কাছে, হারিয়ে আসব আমার যা-কিছু আছে সব—আমার মান-সম্ভ্রম, মর্যাদা। তার পরে মেয়েছেলের আর রইল কী? না শরণদা, আর যা করতে বলেন, করব। কিন্তু একজন পুরুষের কাছে নিজেকে পণ্যের মতো তুলে ধরতে পারব না—কোনোমতেই না।

বলতে বলতে মনের মধ্যে সঞ্চিত উত্তেজনার আবেগ তাকে ঠেলে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল। হঠাৎ মনে হল, ঘরের ভিতরটা বড় তেতে উঠেছে। তাড়াতাড়ি সে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল একটু হাওয়ার প্রত্যাশায়। শরণ সিং মিনিট কয়েক বসে রইল নিস্পন্দের মতো। তারপর এক সময়ে নিঃসাড়ে বেরিয়ে গেল। ফিসফিস করে বলল ঝিয়ের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে, দরজাটা বন্ধ করে দাও, কালুর মা।

অনেকক্ষণ পরে কী একটা বলতে গিয়ে অপর্ণার হঠাৎ খেয়াল হল, শরণ চলে গেছে। ঘরে গিয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু একটু পরেই বোঝা গেল, সে শুধু পড়ে থাকা আর বিনিদ্র রাত্রির প্রহর-গোনা। ঘুমের কোনো সম্ভাবনাই রেখে যায় নি শরণ

সিং। অন্তরের উত্তাপ যখন একটুখানি শান্ত হয়ে এসেছে, ওদের দিকটাও মনের সামনে খুলে দেখল অপর্ণা। ওরা দুজনেই যে তার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী, সে কথা তার চেয়ে কে বেশী জানে? ঘোর বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে তা থেকে রক্ষা পাবার আর কোনো পথ যখন চোখে পড়ে নি, তখনই বহু দ্বিধা-সঙ্কোচের সঙ্গে এই প্রস্তাব তারা পাঠিয়ে দিয়েছে তার কাছে। সে বিপদ ওদের একার নয়, তার নিজেরও। আজ যদি বারীনকে দীর্ঘদিনের জন্য জেলে যেতে হয়, সংসারে এতটুকু আশ্রয় পাবার মতো স্থানও তার অবশিষ্ট নেই। শরণ সিং শেষ পর্যন্ত তাকে দেশে নিয়ে যাবার ভরসা দিয়েছে। তার মধ্যে তার উদার মনের পরিচয় যাই থাক, সেটা সম্ভব নয়, শোভনও নয়। ঘটনাচক্রে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ আজ বারীনের শুভাশুভের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। শুধু কি তাই? এই স্বার্থের যোগ আর প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়া আর কিছু নেই? নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করল অপর্ণা। উত্তরও এল সঙ্গে সঙ্গে। আর কোনো কারণে নয়, বারীনদা বলেই। সে জন্যে, প্রয়োজন হলে সে সব দিতে পারে, দিতে পারে নিজেকেও। পরক্ষণেই মনে হল, এ তো সে দেওয়া নয়। নিজেকে দেওয়ার মধ্যে গৌরব আছে, তার চেয়ে বেশী আছে তৃপ্তির আনন্দ। তার বুকের মধ্যে কোথায় সে অনুভূতি! যে পথ দিয়ে ওরা তাকে নিয়ে যেতে চাইছে, সেখানে পা বাড়ানো দূরে থাক, তার কথা ভাবতে গিয়েই মন যে ভেঙে পড়ছে, ভরে উঠছে লজ্জায়, ঘৃণায়, গ্লানিতে। ছিঃ ছিঃ, এ যে তার নারীজীবনের অপমান! এর পরে সে নিজের কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে?

কখনও তন্দ্রায়, কখনও অতন্দ্র জাগরণে সমস্ত রাত কাটিয়ে ভোরে

উঠেই অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে এল অপর্ণা। অনেকখানি জুড়িয়ে গেল স্নায়ুর তাপ, মনে ফিরে এল প্রশান্তি। তার সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থ ছিল 'গীতবিতান'। তাই খুলে বসল। গান সে শুধু গাইত না, পড়ত। আজ কিন্তু কবিগুরু তার মন টেনে নিতে পারলেন না। সেখানে ভরা শুধু অবসাদ, শুধু ক্লান্তি। তাকেই বোধ হয় সে প্রশান্তি বলে ভুল করেছিল।

একটু পরেই পিওন এসে দিয়ে গেল একটা খামের চিঠি। উপরে টাইপ করা শরণ সিংয়ের নাম। পাঠিয়েছেন ওদের উকিল। তাঁর নাম-ঠিকানাও ছিল লেপাফার বাঁ দিকটায়। মামলার খবর মনে করে সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেলল অপর্ণা। তিন শো টাকার মতো একটা হিসাব দিয়ে উকিলবাবু জানিয়েছেন, তিন-চার দিনের মধ্যে দেনাটা মিটিয়ে না দিলে, তাঁর পক্ষে এ মোকদ্দমা হাতে রাখা সম্ভব হবে না। আরও লিখেছেন, আগামী তারিখেই বারীনের পক্ষে একজন সিনিয়র উকিল নিযুক্ত করতে হবে। তার জন্যে আরও শ দুই টাকার প্রয়োজন। সবচেয়ে দরকারী খবর, মামলার অবস্থা আসামীর পক্ষে অনুকূল। খরচপত্র চালিয়ে যেতে পারলে, ছাড়া পাবার প্রচুর সম্ভাবনা।

চিঠিখানা দুবার পড়ল অপর্ণা, বিশেষ করে ওই শেষ দিকের আশ্বাস। তারপর তাকাল তার ক্ষয়ে-যাওয়া চুড়ি দুগাছার পানে। গয়না বলতে ওইটুকুই তার অবশিষ্ট সম্বল, খুব বেশী করে ধরলেও যার দাম পঞ্চাশ-ষাট টাকার উপরে নয়।

ঘণ্টাখানেক পরে বাজার করবার তাগিদ নিয়ে যথারীতি হাজির হল শরণ সিং। কোনো কথা না বলে অপর্ণা চিঠিখানা তার হাতে

তুলে দিল। শরণের চোখে মুখে বিশেষ কোনো আগ্রহ বা কৌতূহলের চিহ্ন দেখা গেল না। মনে হল, ভিতরে কী আছে, সেটা তার আগে থেকেই জানা। ধীরে-সুস্থে পড়ে হাসল একটু ম্লান হাসি। তারপর খামখানা পকেটে পুরে বলল, থলেটা দাও।

অকস্মাৎ যেন কোন্ ধ্যান থেকে জেগে উঠল অপর্ণা। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে শরণের মুখের দিকে আয়ত চোখ মেলে বলল, আমি রাজী আছি শরণদা। আপনি ওদিকের সব ব্যবস্থা করুন।

কিসের! ও-ও! না বহিন, যে-কাজের পেছনে মনের সাড়া নেই, তার মধ্যে তোমাকে আমি যেতে দেব না। তাতে বারীনের অদৃষ্টে যাই থাক।

না না, আপনি আর বাধা দেবেন না শরণদা। নিয়ে চলুন কোথায় যেতে হবে। যা বলবেন, আমি সব করব, সব পারব।—বলেই এগিয়ে এসে শরণের হাত দুটো জড়িয়ে ধরল। ঝরঝর করে গড়িয়ে পড়ল চোখের জল।

শরণ সিং নির্বাক্ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সেই অশ্রু-আপ্লুত চোখ দুটির দিকে। তারপর ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ওর পিঠের ওপর হাত রেখে বলল, বেশ, তাই হবে বহিন।

লালদীঘির পুব দিকে বাগানের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে মোটর গাড়ির দীর্ঘ লাইন। নানা রঙের এবং নানা আকারের; কিন্তু সবগুলোই বাড়ির গাড়ি। কোনোটাতে ড্রাইভার আছে; কোনোটাতে নেই—মালিক নিজেই চালক। অপর্ণাকে সঙ্গে করে তারই এক ধারে ফুটপাথের উপর এসে দাঁড়াল শরণ সিং। তখনও পাঁচটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। চুপিচুপি বলল, চলো, আর একটু

এগিয়ে যাই। বেশ করে চিনে রাখতে হবে, এর মধ্যে কোন্‌খানা আমাদের কাজে লাগবে। অপর্ণা নিঃশব্দে অনুসরণ করল। গাড়ির সারির পেছনে ছোট ছোট দলে ড্রাইভারদের জটলা। ক্ষুধার্ত দৃষ্টি মেলে অনেকেই তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। অপর্ণার দৃষ্টি এড়াল না; কিন্তু মনে হল যেন অস্বস্তি বোধ করবার মতো মনের জোরটুকুও তার হারিয়ে গেছে। পাঁচটা বাজবার পরেই দামী-স্যুট-পরা মালিকের দল আসতে শুরু করলেন। একবার তাকালেই বোঝা যায়, পদে ও অর্থে তাঁরা সব উপরতলার বাসিন্দা। চার অঙ্কের সরকারী কর্মচারী কিংবা রোজগারের দিক দিয়ে তার চেয়েও উঁচু স্তরের—অর্থাৎ বণিক-মণ্ডলীর ছোট-বড় তারকার দল। একখানা দুখানা করে গাড়িগুলো সগর্জন ধোঁয়ার কুণ্ডলী পেছনে রেখে দ্রুতবেগে ছুটে চলে গেল। একটি বিশেষ ব্যক্তির দিকে নজর দিল শরণ সিং। সুদর্শন যুবক। বেশভূষায় নিখুঁত এবং মার্জিতরুচি। একটু ব্যস্তভাবে এগিয়ে গিয়ে দখল করলেন একখানি ড্রাইভারহীন টু-সীটার। গাড়িতে ওঠবার আগে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন, যখন চোখ পড়ল অপর্ণার দিকে। বুকের ভিতরটা নড়ে উঠল অপর্ণার। চোখ নামিয়ে নিয়েও আবার একবার না তুলে পারল না। তখনও তাকিয়ে আছে পুরু চশমার পেছনে দুটি চোখ। তার মধ্যে কৌতূহল যতখানি, তার চেয়ে বেশী ছিল বিস্ময়। আর যে কী ছিল, জানে না অপর্ণা। কিন্তু ভালো লেগেছিল বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দর মুখের উপর সেই শান্ত উজ্জ্বল দৃষ্টি। শুধু চোখের ভালোলাগা নয়, অন্তরের কোন্‌ অলক্ষ্য কোণেও বোধ হয় লেগেছিল তার মৃদু স্পর্শ, জেগেছিল ভীরু শিহরণ। ক্ষণেকের তরে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল অপর্ণা।

সংবিৎ ফিরে এল শরণের ডাকে। একটা ছোট্ট নোটবুকে কী যেন টুকে নিয়ে সে বলছিল : চলো, বাড়ি যাই।

দিন তিনেক পর এক ইংরেজী মাসের পয়লা তারিখ, যখন পকেটের ওজন বেড়ে যায় এ পাড়ায় ছোট-বড় সকলেরই। এই দিনটির কথা আগেই বলে গিয়েছিল শরণ। আজ সকালে বাজার পৌঁছে দেবার সঙ্গে আবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল : চারটার সময় তৈরি থেকো। মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল অপর্ণা।

পাঁচটার আগেই আবার এসে ওরা দাঁড়াল সেই মোটর-লাইনের সামনে। সেই টু-সীটারখানা আজও ছিল প্রায় একই জায়গায়। মালিককে দূর থেকে আসতে দেখে চুপিচুপি বলল শরণ সিং, যা যা বলতে হবে, সব মনে আছে তো? অপর্ণা এবারেও মাথা নাড়ল কলের পুতুলের মতো। সঙ্গে সঙ্গে শরণ মিলিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে। কোনো দিকে না চেয়ে একটু জোরে জোরে পা চালিয়ে সেই ভদ্রলোক এসে পড়লেন গাড়ির কাছে। দরজা খুলে ডান দিকে তাকাতেই চোখ পড়ল, ঠিক পাশেই কেমন কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অপর্ণা। যেন কিছু একটা বলতে চায়, কিন্তু সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

মাপ করবেন, আপনি কাউকে খুঁজছেন কি?- -গম্ভীর মৃদু কণ্ঠের সহজ প্রশ্ন। অপর্ণার বুকটা আবার কেঁপে উঠল সেদিনের মতো। তখনই মনে পড়ল শরণ সিংয়ের হুঁশিয়ারি : সব মনে আছে তো? একটু কাষ্ঠ-হাসির চেষ্টা করে বলল অপর্ণা, না; মানে, আমি এসেছিলাম আমার এক আত্মীয়ের কাছে ওই আপিসে। এসে দেখলাম তিনি নেই।—বলে [illegible] থেমে গেল।

তার পর?

ওঁর সঙ্গেই ফিরব বলে বেশী পয়সা নিয়ে বেরোই নি। তাই—

ও-ও। কোথায় যাবেন আপনি ?

সে অনেক দূর। বেহালা।

বেশ তো, আমি পৌঁছে দিচ্ছি। অবিশ্যি, আপনার যদি কোনো আপত্তি না থাকে।

না, আপত্তি আর কী ? কিন্তু অতটা পথ খালি-খালি আপনাকে—

তাতে আর কী হয়েছে! ঠিক খালি-খালি নয়, আমার পথও ওই দিকে। একটু শুধু এগিয়ে যেতে হবে। আসুন।—বলে দরজাটা খুলে ধরলেন ভদ্রলোক। অপর্ণা সসঙ্কোচে উঠে বসল পাশের সীটে।

হাইকোর্ট ছাড়িয়ে মাঠের পথ ধরতেই গাড়ির বেগ বেড়ে গেল। কিন্তু সেই মুহূর্তে অপর্ণার মনের গহনে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, তার বেগ আরও অনেক বেশী। যে পথে তাকে নামতে হয়েছে, যে কাজের ভার মাথায় নিয়ে আজকের এই অভিযান, তার ভিতরকার শঙ্কা, লজ্জা ও চাঞ্চল্য তো ছিলই, তার উপরে ছিল এই গতির নেশা, এই মোহ-সঞ্চারী সান্নিধ্য, যার আস্বাদ এই প্রথম এল তার কুমারী-জীবনে। একান্ত পাশটিতে বসে যে ব্যক্তিটি উদ্দামবেগে গাড়ি ছুটিয়ে চলেছেন, এবং মাঝে মাঝে বিস্ময়- ও আনন্দ -ভরা সুন্দর চোখ ছুটি বুলিয়ে নিচ্ছেন তার মুখের উপর, কয়েক মুহূর্ত পূর্বেও তিনি ছিলেন তার কল্পনাজগতের বাইরে। এখনও তাঁর কোনো পরিচয় সে জানে না। তবু এ কথা সে নিজের কাছে লুকোবে কেমন করে, তার বুকের রক্তে ঢেউ তুলেছে ওই দৃষ্টিস্পর্শ এবং তারই সঙ্গে মেশানো তাঁর মৃত্থ নিশ্বাসের দোলা। চঞ্চল বাতাসে তু-চারটি চূর্ণ কুন্তল, অবাধ্য

আঁচলের একটা কোণ উড়ে গিয়ে পড়ছে তাঁর কাঁধের উপর। মোড় ঘোরাতে গিয়ে ওই নিপুণ বলিষ্ঠ হাতখানা কখন একবার ছুঁয়ে যাচ্ছে তার আড়ষ্ট বাহুপাশ। গভীর আবেশে চোখ বুজে এল অপর্ণার। এমন সময় হঠাৎ কানে গেল তাঁর কণ্ঠস্বর : আচ্ছা, আপনি কখনও কুমিল্লায় ছিলেন ?

চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল : হ্যাঁ, কেন বলুন তো ?

ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, তা হলে ঠিক ধরেছি। আপনাকে আমি চিনি, মানে, আগেই দেখেছি।

আমাকে !

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি তা জানেন না।

গাড়ির বেগ খানিকটা সংযত করে বললেন, আমার বাবা ছিলেন ওখানকার সাব-জজ। বছর তিনেক আগে বেড়াতে গিয়েছিলাম কদিনের জন্যে। নববর্ষ উপলক্ষে এ. ডি. এম.এর বাড়িতে যে জলসা হয়েছিল, সেখানে আপনার গান শুনেছিলাম। আজও কানে লেগে আছে। আর আপনার সেই আরতি-নৃত্য ! এখনও যেন দেখতে পাচ্ছি। আপনার নামটাও আমার মনে আছে। অপর্ণা দেবী। কেমন, তাই না ? তার পরেও আপনার খোঁজ নেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু—

গাড়ি থামান !—হঠাৎ যেন আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল অপর্ণা।

সে কী ! কেন ?

আমি নেমে যাব।

এখানে কোথায় নামবেন, এই মাঠের মধ্যে!

তা হোক, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে নামিয়ে দিন।

গাড়ির গতি আর খানিক কমিয়ে দিলেন ভদ্রলোক, কিন্তু একেবারে থামালেন না। অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন, আমাকে আপনি ভুল বুঝেছেন, অপর্ণা দেবী। অনেক দিন আপনার কথা মনে হয়েছে। আজ দৈবক্রমে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ায় সত্যিই ভারি আনন্দ পেলাম। তাই হয়তো ঝোঁকের মাথায় এমন কিছু বলে ফেলেছি, যা আমার বলা উচিত ছিল না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, যা বলেছি, সবটুকুই নেহাত সরল মনে না-ভেবে বলা। এর মধ্যে কোনো মতলব বা অভিসন্ধি আমার নেই।

না না, সে কথা আমি বলি নি। সেজন্যে নয়—

তবে?

সে আপনি বুঝবেন না; আমিও বোঝাতে পারব না।—প্রায় অবরুদ্ধকণ্ঠে বলল অপর্ণা, দয়া করে এইখানেই আমাকে নেমে যেতে দিন।

কিন্তু আপনি যে বললেন, বেহালায় আপনার বাসা?

মিথ্যে বলেছি।

মিথ্যে বলেছেন!

হ্যাঁ। কিন্তু কেন, তা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। —বলতে বলতে চোখ ছুটো জলে ভরে গেল।

এ কী, আপনি কাঁদছেন!

ওঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে ফেলল অপর্ণা।

গাড়ি তখন মাঠ পার হয়ে সবে বসতি অঞ্চলে মোড় নিয়েছে। সেইখানে একটা রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড় করাতেই নেমে পড়ছিল অপর্ণা। ভদ্রলোক অনুনয়ের সুরে বললেন, আমি এখনও বলছি অপর্ণা দেবী, আপনি নেমে যাবেন না। কী হয়েছে আমাকে খুলে বলুন। আমার যদি কিছু করবার থাকে আমি নিশ্চয়ই করব। এইটুকু বিশ্বাস রাখুন আমার ওপর। আমার কাছ থেকে আপনার কোনো বিপদ বা অসম্মানের ভয় নেই।

আগ্রহাকুল দৃষ্টিতে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে রইলেন তিনি। কিন্তু অপর্ণা কোনো কথাই বলতে পারল না। শুধু যে অশ্রু সে এতক্ষণ কোনোরকমে ধরে রেখেছিল চোখের কোণে, তাই এবার অবিরল ধারায় গড়িয়ে পড়তে লাগল।

ভদ্রলোক আবার কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে আর-একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াল তাদের পাশে। তার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ল শরণ সিং আর তারই বয়সী আর-একটি লোক। অপর্ণা তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে রুদ্ধশ্বাসে বলল, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলুন শরণদা।

কাজ হল ?—চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল শরণ সিং। অপর্ণা যেন বুঝতে পারে নি এমনি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

টাকা পেয়েছ ?—ব্যগ্রকণ্ঠে সোজাসুজি জানতে চাইল শরণ।

না না, ও আমি পারব না, কিছুতেই না। আমাকে নিয়ে চলুন শীগগির।

টাকা! কিসের টাকা ?—এগিয়ে এসে বললেন ভদ্রলোক: আপনারা কে, জানতে পারি ?

সেটা স্থর, আপনার না জানলেও চলবে।—ব্যঙ্গের স্থরে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল শরণের সঙ্গীটি : তবে কিসের টাকা, সেটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি আপনার থাকা উচিত ছিল। মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করতে গেলে ট্যাঁক থেকে কিঞ্চিৎ—

ওকে থামতে বলুন শরণদা।—চিৎকার করে বলতে গেল অপর্ণা। কিন্তু সামান্য একটু ক্ষীণস্বর শুধু বেরল তার গলা থেকে।

এই ব্যাপার!—অনেকটা যেন আপন মনে বললেন ভদ্রলোক : এইজন্য দলবল জুটিয়ে পেছু নিয়েছিলে! আর আমি কী ভেবে কার জন্যে—ইশ!—বলে সামনেকার লম্বা চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন ভদ্রলোক। পর-মুহূর্তেই যেন একটা রূঢ় ঝাঁকানি দিয়ে টেনে তুললেন নিজেকে। অপর্ণার সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, টাকা চাই তোমার? আগে বল নি কেন? তার জন্যে আমার এতদিনের স্বপ্ন ভেঙে দেবার কী দরকার ছিল?

এটা প্রশ্ন নয়। হলেও অপর্ণার কাছে তার উত্তর ছিল না। তার জন্যে তিনি অপেক্ষাও করলেন না। অস্ফুটকণ্ঠে বললেন তিনি, সেই তুমি! আজ এত নেমে গেছ! ছিঃ!

হঠাৎ প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করলেন একটা নোটের তাড়া। ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন তিনি, এই নাও টাকা। আরও চাই?

প্যাকেটটা সজোরে বুকের উপর গিয়ে পড়তেই একটা ক্ষীণ শব্দ করে চোখ তুলল অপর্ণা। ঠিক সামনে কয়েক হাত দূরে, তারই দিকে তাকিয়ে আছে দুটি জ্বলন্ত চোখ, তার ভিতর থেকে ঠিকরে পড়ছে শুধু জ্বালাময়ী ঘৃণা। সে দৃষ্টি অসহ্য হল অপর্ণার। আপনার

অজ্ঞাতে দু হাতে চেপে ধরল চোখ দুটো। বুকের উপরটা তখনও জ্বলে যাচ্ছিল, কিন্তু তার ভিতরে সমস্ত অস্থি মজ্জা পুড়িয়ে দিচ্ছিল যে যন্ত্রণা, তার কাছে বাইরেকার এই জ্বালা অতি তুচ্ছ।

এক দল লোক—সম্ভবত সিনেমা- কিংবা চিড়িয়াখানা-ফেরতা, কলরব করে চলেছিল ওই পথ দিয়ে। তামাশার গন্ধ পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। একজন হিন্দীতে জানতে চাইল, ব্যাপার কী?

কুছ নেহি ভাইয়া।—সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল শরণ সিং: আপলোক যাইয়ে। কিন্তু 'যাইয়ে' বললেই এ রকম একটা লোভনীয় দৃশ্যের মজা ছেড়ে চলে যাবার মতো বেরসিক লোক তারা মোটেই নয়। প্রশ্নের পর প্রশ্ন দিয়ে ওদের দুজনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। তাদের কৌতূহলের প্রধান কেন্দ্র ওই 'জেনানা'। কে সে? এ হেন জায়গায় কী সূত্রে তার আবির্ভাব? শরণের বন্ধুটি, বোধ হয় তাদের হাত থেকে সহজে মুক্তি পাবার আশায়, বলে ফেলল, বিশেষ কিছু নয় ভাই। বাবুটি ওকে নিয়ে একটু ফুর্তি করতে বেরিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সুবিধে হয় নি।

কৌন্ বাবু?—বলে গর্জে উঠল পাঁচ-সাত জন। একজন ঘুষি বাগিয়ে গেল ভদ্রলোকের দিকে। তিনি তখন গাড়িতে উঠবার আয়োজন করছিলেন। দু-তিন জন দাঁড়াল গিয়ে গাড়ির সামনে। আর-একজন কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিয়ে উঠতেই তিনি প্রতিবাদ করলেন, চোপ রও। সঙ্গে সঙ্গে ঘুষিটা পড়ল গিয়ে তাঁর মুখের উপর। অপর্ণা চিৎকার করে উঠল। শরণ এবং তার বন্ধু এগিয়ে গেল ঠেকাতে। জটলার এক ফাঁকে দেখা গেল, কাঁচভাঙা চশমাটা ঝুলে পড়েছে ওঁর গালের উপর, আর নাকের ভিতর থেকে গড়িয়ে

পড়ছে রক্ত। সমস্ত পৃথিবীটা হঠাৎ দুলে উঠল অপর্ণার চোখের উপর। দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে হাত বাড়িয়ে দিল আশ্রয়ের খোঁজে। তার পরে কী হল আর মনে নেই।

অপর্ণার যখন জ্ঞান ফিরল, চারদিকটা অন্ধকার। তারই মধ্যে আবছায়ার মতো কে যেন শিয়রে বসে আস্তে আস্তে হাওয়া করছে। জিজ্ঞাসা করল, কে?

আমি, দিদিমণি।

কালুর মা? আমি কোথায়?

তোমার নিজের বিছানায় শুয়ে আছ দিদিমণি। আলো জ্বালব?

জ্বালো। শরণদা কোথায় গেল?

বলতে বলতেই শরণ এসে ঘরে ঢুকল। উৎকণ্ঠার সুরে বলল, এখন কেমন আছ পরী বহিন?

ভালো আছি। আপনি এখনও বাড়ি যান নি?

বাড়ি! সে এক সময়ে গেলেই হবে। রাত বেশী হয় নি। যাও তো কালুর মা, দিদিমণির দুধটা এবার নিয়ে এসো। বেশ গরম আছে তো?

দেখি, যদি না থাকে দুখানা কাগজ জ্বেলে চট করে তাতিয়ে নিয়ে আসছি।—বলতে বলতে কালুর মা তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল।

এখন আবার দুধ কেন?—অনুযোগের সুরে বলল অপর্ণা।

একটু খেতে হবে বই কি। বলে, তাকের উপর থেকে নামিয়ে নিয়ে এল একটা কাগজে-মোড়া শিশি।

ওটা কী?

কিছু না, একটু ওষুধ। দুধের সঙ্গে খেতে বলে গেছেন ডাক্তারবাবু।

ছি ছি, এ সব কী ছেলেমানুষি বলুন তো? এই সামান্য ব্যাপারে আবার ডাক্তার ডাকতে গেলেন কেন? কী হয়েছে আমার?

শরণ এ অভিযোগের কোনো উত্তর দিল না। মৃদু হেসে শিশির মোড়কটা খুলে ফেলল। অপর্ণা দু-এক মিনিট কী ভাবল। তারপর বলল, ওঁর কী হল শরণদা? খবর পেয়েছেন কিছু?

কার? ও, হ্যাঁ; উনি তখনই বাড়ি চলে গেছেন। গোলমাল দেখে পুলিস এসে পড়েছিল। পরিচয় পেয়ে তারাই ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।

একটু থেমে, বোধ হয় ওর উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে লক্ষ্য করে, বলল, বেশী কিছু লাগে নি। দু-এক দিনেই ভালো হয়ে যাবেন।

সে টাকাটা?

তোমার বালিশের নীচে আছে।

শরণদা!

কী বহিন?

আমাকে একবার তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারেন?

কেন?

হ্যাঁ, এই নোটের তাড়াটা আমি ফিরিয়ে দিতে চাই।

শরণ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। গভীর দৃষ্টিতে একবার ওর মুখের দিকে চেয়ে চোখ ফেরাল জানলার বাইরে। খানিকক্ষণ পরে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলল, পরী, তোমার শরীর মন কোনোটাই আজ ঠিক নেই। এই অবস্থায় ঝোঁকের ওপর কিছু করতে যেয়ো না। রাতটা

কেটে যাক। সকালে উঠে মন সুস্থ হলে ভেবে-চিন্তে যা ভালো বুঝবে, তাই কোরো। কেউ বাধা দেবে না।

কালুর মা দুধ নিয়ে এল। তার হাত থেকে প্যানটা নিয়ে পেয়ালায় ঢেলে কয়েক ফোঁটা ওষুধ মিশিয়ে শরণই ধরে দিল ওর সামনে। তারপর বলল, দুধটা খেয়ে নিয়ে একটু ঘুমবার চেষ্টা করো। ওইটাই এখন তোমার সবচেয়ে বেশী দরকার।

অপর্ণা নত মুখে পেয়ালায় চামচে নাড়তে নাড়তে বলল, আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। মন আমার ঠিকই আছে। শুধু ঠিক নয়, স্থির করেও ফেলেছি।

কিন্তু অপর্ণা তখনও জানে না, 'স্থির' কথাটা আর যেখানেই চলুক, মন নামক যে বিচিত্র বস্তু বাস করে মানুষের বুকের মধ্যে, তার বেলায় খাটে না। এই মুহূর্তে সে যা স্থির করে, পর-মুহূর্তেই তার সেই সংকল্প যে কোথায় ভেসে যায় সে রহস্য আজও ভেদ করা যায় নি, হয়তো কোনোদিনই যাবে না।

শরণ চলে যাবার পর কালুর মাকেও শুতে পাঠিয়ে দিয়ে বালিশের তলা থেকে নোটের বাণ্ডিলটা বের করল অপর্ণা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল লোহার-তার-দিয়ে-গাঁথা সেই কাগজগুলোর দিকে। ধীরে ধীরে অনেকদূর চলে গেল তার দৃষ্টি, যেখানে লোহার-গরাদ-দেওয়া জেল-হাজতের অন্ধকারে একদল চোর-ডাকাতের মধ্যে পড়ে আছে বারীনদা, দিন গুনছে হয়তো তারই মুখ চেয়ে—কবে কেমন করে আসবে তার মুক্তি! এই তো সেই মুক্তির দূত। এই পাঁচ শো টাকার বিনিময়ে আবার তারা ফিরে পাবে সেই পুরনো দিন। তারপর নতুন করে শুরু হবে তাদের নবজীবনের যাত্রা। এই পথ দিয়ে নয়।

এই কুটিল পঙ্কিল গোপন গলিপথ থেকে প্রকাণ্ড সরল রাজপথে ফিরিয়ে আনতে হবে বারীনদাকে। সেখানে যা জোটে তাতেই স্বচ্ছন্দে মিটে যাবে তাদের সামান্য প্রয়োজন। যে সংকল্প নিয়ে সে ঘর ছেড়েছিল, এইবার এতদিনে দেখা দিয়েছে তাকে পরিপূর্ণ রূপ দেবার শুভক্ষণ। বড় হবে, মানুষ হবে অপর্ণা। তারপর হয়তো একদিন পূর্ণ হবে যে আকাঙ্ক্ষা ছিল তার মায়ের মনে, যে আশীর্বাদ সেদিন করেছিলেন জেলর সাহেব, যে ভীরু আশা সে নিভৃত মনের কোণে লুকিয়ে রেখেছে আকৈশোর—

অকস্মাৎ কিসের রূঢ় আঘাতে ছিন্ন হয়ে গেল কল্পনার তার। এ কী ভাবছে সে! যে কাগজগুলোকে আশ্রয় করে মূঢ়ের মতো এই স্বপ্নের জাল বুনে চলেছে অপর্ণা, তারই আর-একটা রূপ ফুটে উঠল তার চোখের উপর। সেখানে এর পাতায় পাতায় জড়িয়ে গেছে এক দিকে হীন প্রতারণার কালি, আর এক দিকে সুতীব্র ঘৃণার বিষ। শুধু প্রতারণা নয়, নিজেকে হেয়, হীন, বিকৃত করে তুলে ধরা এমন একজনের কাছে, যার চোখে সে-ই একদিন এনেছিল স্বপ্নের ঘোর, ছায়া ফেলেছিল মনের পাতায়। সে পরমবার্তা কোনোদিন জানতে পারে নি অপর্ণা। আজ যখন জানল, তার পর-মুহূর্তেই দেখল, সে ছায়া মিলিয়ে গেছে। নারী-জীবনের এই সহসা-লব্ধ প্রথম সম্পদ আজ নিজের দোষেই হারিয়ে এল। তার জায়গায় নিয়ে এল দুঃসহ ঘৃণা আর দুস্তর লাঞ্ছনা।

এই কথা মনে হতেই নোটগুলোর স্পর্শে হাত দুখানা যেন জ্বালা করে উঠল। যেখানে ছিল, সেইখানেই আবার লুকিয়ে ফেলল প্যাকেটটা। তার পর বিছানার উপর বসে মনে মনে শপথ গ্রহণ

করল অপর্ণা—যা হারিয়ে এলাম, সে পরম বস্তু আর ফিরে পাব না জানি। তবু যেমন করে হোক, ফিরিয়ে দিতে হবে এই অবজ্ঞা-লাঞ্ছিত ভিক্ষার । কোনো মায়া, কে স্বার্থ, রঙিন ভবিষ্যতের কোনো মোহ কখনও যেন সে পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

বিরুদ্ধমুখী ভাবনার দোলায় দোল খেতে খেতে কখন যে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছিল, শেষ পর্যন্ত জানতে পারে নি। ভোরের দিকে দেখা দিল এক অদ্ভুত স্বপ্ন। কোন্ এক পাহাড়ী দেশে বেড়াতে গেছে সে আর বারীনদা। চলতে চলতে সামনে পড়ল এক বিরাট গহ্বর। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেল তারই মধ্যে। বারীন হাত বাড়িয়ে দিল, কিন্তু সে হাত সে ধরতে পারল না; তলিয়ে গেল অন্তহীন অন্ধকারে। কেউ কোথাও নেই। শুধু উপর থেকে ভেসে আসছে বারীনের ব্যাকুল ডাক—পরী! পরী! সাড়া দিতে গেল, কিন্তু গলায় স্বর ফুটল না। সেই মুহূর্তে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে থেকে শোনা গেল শরণ সিংয়ের গলা: পরী বহিন! ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়। সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে। জানলার বাইরে ঝলমল করছে রোদ। ইশ, এত বেলা হয়ে গেছে! ভারি লজ্জিত হল অপর্ণা। তাড়াতাড়ি সাড়া দিয়ে বলল, যাই শরণদা।

আজ বেশ ভালো বোধ করছ তো?—বাইরে থেকেই জিজ্ঞাসা করল শরণ।

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। আপনার দেখছি বেজায় ভাবনা হয়েছে আমাকে নিয়ে!—বলে দরজা খুলে দিল।

ভাবনা হবে না? কাল তো রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আজ এত বেলা পর্যন্ত ওঠ নি দেখে—

ভাবলেন বুঝি মরেই গেলাম!

ছিঃ, ও সব কথা কখনো বলতে আছে?—বলে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকাল ওর সদ্য-ঘুম-ভাঙা প্রফুল্ল মুখের পানে। বলল, এবার চোখে মুখে জল দিয়ে একটু চা খেয়ে নাও। আজ আর রান্নার দিকে গিয়ে কাজ নেই। কালুর মা ওদিকের কাজ সেরে এখনই আসছে। ও-ই দুটো চাল ফুটিয়ে দেবে। বাজার-টাজার সব করে রেখে গেলাম।

আপনি এখন যাচ্ছেন কোথায়?

বাবা আসছে নটার গাড়িতে। স্টেশনে আমাকে না দেখলে বুড়ো ওইখানেই বসে পড়বে। এবেলা আর আসা হয়ে উঠবে না। বিকেলে আসব। তার পর যেতে হবে উকিলের বাড়ি।

উকিলের উল্লেখে গত রাত্রির চিন্তাস্রোত আবার নতুন করে ফিরে এল। বিশেষ করে সেই শপথের কথা। মনে হল, শরণ সিংয়ের বাবা আসছেন, সকালে সে থাকতে পারল না, যেতে পারল না উকিলের কাছে—এটা যেন বিধাতার ইঙ্গিত। এমনি করে তিনিই যেন ঘটিয়ে দিলেন তার সংকল্পসিদ্ধির সুযোগ। সকালেই তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে।

নোটের প্যাকেটটা আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে নিয়ে লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে করে কোন একটা থানায় গিয়ে পৌঁছল অপর্ণা। থানা-অফিসারের কাছে কালকের ঘটনার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে বলল, টাকাগুলো সেই ভদ্রলোককে ফিরিয়ে দিতে চাই। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ওকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন, তাঁর নাম-ঠিকানা বলতে পারেন?

না।

তা হলে তাকে খুঁজে পাব কোথায় ?

গাড়ির নম্বর আছে ; তাঁর নিজের মোটর। তা থেকে খোঁজ পাওয়া যাবে না ?

তা হয়তো যায়। কিন্তু তার আগে আপনার আসল উদ্দেশ্যটা কী, খুলে বলুন তো

সে কথা আপনাকে আগেই বলেছি। এই টাকাগুলো তাঁর হাতে ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

কিন্তু আপনি নিজে যে পুলিসকেসে জড়িয়ে পড়বেন, তা বুঝতে পারছেন ?

পারছি, তবু এ ছাড়া আমার উপায় নেই।

আপনার বয়স অল্প। দেখে বুঝতে পারছি, ভদ্রঘরের মেয়ে। সাধ করে এ সব কেলেঙ্কারি মাথায় তুলে নিচ্ছেন কেন ?

তার উত্তর আমি দিতে পারব না। দিলেও হয়তো আপনি মানতে চাইবেন না। আমি যা করতে যাচ্ছি, তার সব ফলাফল জেনে-শুনে তার জন্যে তৈরী হয়েই করছি। আপনি শুধু আমাকে একটু সাহায্য করুন। হয় ওঁকে এখানে ডেকে পাঠান, নয়তো আমাকেই পাঠিয়ে দিন তাঁর কাছে।

দাঁড়ান দাঁড়ান, একটু ভাবতে দিন। মহা ফ্যাসাদে ফেললেন দেখছি! হয় তিনি এখানে আসবেন, না হয় আপনি সেখানে যাবেন—এই তো ? আচ্ছা, বসুন আপনি।

অফিসারটি উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে টেলিফোনে কী সব আলোচনা করলেন, বোধ হয় কোনো উপরওয়ালার সঙ্গে। তারপর ফিরে এসে বললেন, আপনি যা চাইছেন তার কোনোটাই আমাদের

পক্ষে সম্ভব নয়। আপাতত আপনাকে কনফেসিং অ্যাকিউজ্‌ড্‌—মানে একরারী আসামী হিসেবে কোর্টে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেখানে হাকিমের কাছে আপনার সব কথা খুলে বলবেন।

তার পর ?

তার পর আপনার নামে মামলা দায়ের হবে। যে ভদ্রলোককে আপনি ঠকিয়েছেন, কোর্ট থেকে সমন যাবে তাঁর কাছে। ওখানেই তাঁকে দেখতে পাবেন।

কোর্টে নেবার পর এস. ডি. ও.র সামনে যখন ওকে হাজির করা হল, তিনি ওকে ভেবে দেখবার সময় দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন নিজের খাস কামরায়। অনেকক্ষণ পরে নিজেই এলেন সেখানে। বারংবার জানতে চাইলেন, তার এই স্বীকারোক্তির পেছনে পুলিস বা অন্য কারও কোনো জুলুম বা প্ররোচনা আছে কি না! অপর্ণা জানাল, না।

এমনও তো হতে পারে—প্রশ্ন করলেন হাকিম : আমার কাছে এই যা বলছেন, তেমন কোনো ঘটনাই ঘটে নি, এ সব কিছুই করেন নি আপনি; শুধু কারও ভয়ে, কারও ওপর কৃতজ্ঞতা দেখাতে কিংবা কাউকে বাঁচাতে গিয়ে এই মিথ্যা অপবাদ আপনি নিজের ঘাড়ে তুলে নিচ্ছেন ?

অপর্ণা তেমনি দৃঢ়স্বরে জানাল, না।

তবু হাকিমের সন্দেহ দূর হল না। তাই কোর্ট-ইন্সপেক্টরকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁরই হেফাজতে ওকে পাঠিয়ে দিলেন জেলখানায়। চাপা গলায় ইংরেজিতে তাঁকে কী সব নির্দেশ দিয়ে অপর্ণার দিকে ফিরে বললেন, জেলে পাঠাচ্ছি বলে মনে করবেন না, আপনি কোনো অপরাধ করেছেন। কী বলছেন, কেন বলছেন, যা বলতে যাচ্ছেন

সে সব সত্যি না মিথ্যা, কী লাভ বলে, ক্ষতিই বা কতখানি—নির্জনে বসে সব আর-একবার তলিয়ে ভেবে দেখুন। তারই সুযোগ দিলাম। ওখানে আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ। কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না।

দীর্ঘ কাহিনী শেষ করে যেন একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল অপর্ণা। তারপর মুখে একটু মৃদু হাসি টেনে এনে আমার দিকে চেয়ে বলল, জেলের নাম শুনে বুকটা একবার কেঁপে উঠেছিল বইকি। তখন তো জানি না, কত বড় সৌভাগ্য আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

হেসে ফেললাম : সৌভাগ্য !

সৌভাগ্য নয় ? কতকাল পরে আপনাকে দেখলাম ! এ যে কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবি নি।

মোকদ্দমার প্রথম তারিখে হাকিমের এজলাসে অপর্ণার ডাক পড়ল না। কোর্ট-হাজতে কয়েক ঘণ্টা বসে থেকে সন্ধ্যাবেলা ফিরে এল জেলখানায়। আবার তারিখ পড়ল পনেরো দিন পরে। এদিন আর ফিরে এল না। তার বদলে এল একটা স্লিপ। সমাদ্দার সাহেব লিখেছেন, হাজতী আসামী অপর্ণা চ্যাটার্জির নামে কোর্টে যে পাঁচ শো টাকার ক্যাশ ডিপজিট আছে, তার রসিদখানা দয়া করে লোক-মারফত পাঠিয়ে দেবেন। অপর্ণা ওর আঁচল থেকে খুলে সেই হলদে কাগজখানা আমারই কাছে রাখতে দিয়েছিল। পাঠিয়ে দিলাম। দিন চারেক পরে সমাদ্দার সাহেব আবার এলেন কী কাজে। বললেন, তাজ্জব ব্যাপার মশাই ! ছাব্বিশ বছর চাকরি

হল। তার মধ্যে এ রকমটা কখনও দেখি নি, শুনিও নি কোনোদিন। আপনি তো শুনি গল্প-টল্প লিখে থাকেন। শুনে রাখুন। চমৎকার প্লট। হয়তো একদিন কাজে লাগবে।

প্লটের লোভে না হলেও, কৌতূহলের বশে উৎকর্ণ হলাম। সমাদ্দার সাহেব তাঁর তাজ্জব কাহিনীর একটা সরস বর্ণনা দিয়ে শেষের দিকে যোগ করলেন, আসামীকে জিজ্ঞেস করলাম—এই কি সেই বাবু, যাঁকে ব্ল্যাকমেল করে টাকা নিয়েছিলে? স্পষ্ট ভাষায় উত্তর এল--হ্যাঁ। তার পর স্টেটমেণ্টে যা কিছু বলেছে, আমার প্রশ্নের জবাবে একে একে কন্‌ফার্ম করল। ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করতেই স্রেফ অস্বীকার। সোজা বলে দিল, 'আমি ওকে চিনি না, কখনও দেখিও নি। যে ঘটনা শুনলাম, সে রকম কোনো উপন্যাস আমার জীবনে ঘটে নি।' আসামী রুখে উঠল। ডকে দাঁড়িয়ে সে কী চিৎকার: 'মিথ্যা কথা বলছেন উনি। এ টাকা ওঁর। আমি ঠকিয়ে নিয়েছিলাম।' সাক্ষী কিছুতেই স্বীকার করল না। হাকিম আর কী করবেন? প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিলেন মেয়েটাকে, সেই সঙ্গে টাকা ফেরত দেবার অর্ডার।

তার পর?

তার পর আর কী? টাকার প্যাকেটটা আনিয়ে তুলে দিলাম ওর হাতে। চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল।

* * *

এ কাহিনী যেদিন শুনেছিলাম, তার পর সাত-আট বছর চলে গেছে। অপর্ণার কথা ঝাপসা হতে হতে কখন মিলিয়ে গেছে মনের কোণে। মনের আর দোষ কী? প্রতিদিন নতুন নতুন অপর্ণার

ছায়া পড়ছে তার দর্পণের গায়। একজনকে বেশীক্ষণ ধরে রাখতে গেলে তার চলে না। কিংবা দর্পণ না বলে বলতে পারেন, শ্লেট। এই মুহূর্তে যা লেখা হয়, পর-মুহূর্তে মুছে যায়। তার পর ক্রমাগত চলতে থাকে ওই লেখা আর মুছে ফেলার পালা। তাই তো করে চলেছি জীবনভোর। জানি না, এর শেষ কোথায়!

একদিন সকালের ডাকে অন্য সব চিঠিপত্রের সঙ্গে এল একটা খাম। অচেনা হাতের লেখা। সর্বাঙ্গে পোস্ট-অফিসের ছাপ। নামটা আমারই, ঠিকানাটা সাত বছরের পুরনো। তার উপরে লাল কালির কলম চালিয়ে কোনো পরিচিত বন্ধু কী মনে করে পাঠিয়ে দিয়েছেন বর্তমান ঠিকানায়। খাম খুলতেই বেরিয়ে এল সেই চিঠি, যার উল্লেখ করেছি এই দীর্ঘ আখ্যায়িকার সূচনায়। রুল-টানা খাতা থেকে ছিঁড়ে-নেওয়া একটুকরো কাগজ। তার উপরে কয়েকটা মেয়েলী হাতের লাইন।

শ্রীচরণকমলেষু,

আপনার আশ্রয় ছেড়ে যেদিন চলে এলাম, তার পর এই আমার প্রথম চিঠি। জানি না, আপনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন। এতদিন পরে যে আবদার নিয়ে এলাম, আপনার কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি কি না, তাও আমার অজানাই থেকে যাবে। এইটুকু শুধু জানি, সারাজীবন পথ চেয়ে থাকলেও এ চিঠির কোনো উত্তর আমার আসবে না, কোনোদিন পাব না আপনার হাতের একটু চিহ্ন, স্নেহমণ্ডিত দুটি লাইন, তার নীচে একটি অম্লান স্বাক্ষর। সে পথ আমাকে নিজের হাতেই বন্ধ করতে হল। আমি কোথায়

আছি, সে কথা আপনাকে জানাবার উপায় নেই। কেন? সে জবাবটাও মুখ ফুটে বলতে পারব না।

জীবনে ছুটিবার মাত্র আপনার সঙ্গে দেখা। যা পেয়েছি, অন্তর ভরে আছে। আমি আর কী দিতে পারি! আপনার পায়ের তলায় রইল আমার ঠিকানাহীন চিঠি।

আমার মামলার ফল সেদিন না হলেও, তার ক দিন পরে নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিলেন। একবার মনে হয়েছিল, আপনার কাছেই ফিরে যাই। দাঁড়াবার মতো একটা জায়গা, বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবার মতো একটা কোনো আশ্রয় হয়তো আপনি জুটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু কোন্ মুখে যাব! আদালতে দাঁড়িয়ে নিজের কানে যখন শুনলাম—তিনি আমাকে চেনেন না, কোনোদিন দেখেন নি, যা বলেছি সব মিথ্যা, সেই লজ্জার বোঝা মাথায় নিয়ে কী বলে কেমন করে দাঁড়াব আপনার চোখের সামনে! তাই যাওয়া হল না। এত কাণ্ডের পর শরণদার কাছে গিয়েও উঠতে পারি নি। ওরা যা চেয়েছিল, তা যখন দিতে পারলুম না, কথা দিয়েও তা রাখা গেল না, তখন আর ওকে বিব্রত করি কিসের জোরে? তার পর কোথায়, কেমন করে আমার দিন কেটেছে, সে কথা আমার বলবার নয়।

এক দিন নয়, দু দিন নয়, এতগুলো বছর! মন যখনই ভেঙে পড়তে চেয়েছে, এই বলে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছি, তিনি তো দিয়েছিলেন—আমার অজ্ঞাতে আমারই জন্যে অঞ্জলি ভরে রেখেছিলেন। আমি হাত পাততে পারি নি। তাই পেলাম না। কিন্তু একেবারে যে পাই নি, তা নয়। অমৃতের বদলে পেয়েছি বিষ।

তবু তো পেয়েছি। আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে থাক সেই ঘৃণার দান। এই কথাই ভেবেই, বহু দুঃখে, বহু অভাবে পড়েও সেই বাণ্ডিলের একখানা নোটও আমি নষ্ট করি নি। আজও সব তেমনই তোলা আছে।

তার পর মনে হল, ওটা সান্ত্বনা নয়, প্রতারণা। নিজের মনকে মিথ্যা দিয়ে ঠকানো। ঘৃণা নিয়ে চিরদিন বেঁচে থাকা যায় না।

একদিন যখন নিতান্ত অসহ্য হল, নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলুম না। লজ্জার মাথা খেয়ে অনেক খুঁজে খুঁজে গেলাম তাঁর বাড়ি। কিন্তু এবারেও আমার হার হল। দেখা পর্যন্ত করলেন না। দরজা থেকে ফিরে এলাম। যাক সে কথা। যা বলতে বসেছি, তাই এবার বলি।

সেদিন আপনার 'লৌহকপাট' পড়লাম। ছদ্মনামে লিখলে কী হয়, আমার কাছে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেন নি। ওই হাত, ওই মন, ওই দরদ, ওর সবটাই যে আমার চেনা। এতটুকু থেকে যার স্বাদ পেয়েছি, তা কি কখনও ভোলা যায়? যে প্রাণ একদিন ধরা দিয়েছিল শ্যামল বাংলার কিশোর মনের কাছে, তারই স্পর্শ পেয়ে অমর হয়ে রইল জেলখানার মানুষ। ওইখানে গিয়েই তো আপনাকে আবার নতুন করে পেলাম। যা কাউকে বলবার নয়, এ বিড়ম্বিত জীবনের সেই তুচ্ছ কাহিনী নামিয়ে দিয়ে এলাম আপনার পায়ের কাছে। আশা আছে, যত তুচ্ছই হোক, আপনার স্নেহবর্ষী লেখনীর মুখে সে একদিন রূপ নেবে। শুধু আশা নয়, এটা আমার শেষ আবেদন।

আপনি হাসছেন ? না, অমর হবার সাধ নেই। শুধু একটি-বারের জন্য একজনের চোখের সামনে দাঁড়াতে চাই। সেদিন দেখে এলাম তাঁর লাইব্রেরি, পরিজনহীন শূন্য গৃহের যে কোণটিতে বসে তাঁর অবসর কাটে। আপনার লেখা একদিন নিশ্চয়ই তাঁর হাতে পড়বে। যদি পড়ে, হয়তো একবার চোখ মেলে দেখবেন সেই লজ্জাহীনা অপর্ণাকে, একদিন যার দিক থেকে কঠোর ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তারপর শত অনুনয়েও যাকে চোখের দেখা পর্যন্ত দেন নি। সেদিন হয়তো ক্ষণেকের তরেও মনে হবে, যতখানি হেয় বলে তার মুখদর্শন করেন নি, ঠিক ততখানি হেয় বোধ হয় সে নয়।

শত কোটি প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

আপনার স্নেহের অপর্ণা।

দুই

নাম, গোলাম মামুদ। চাকরি করেন লীগ সরকারের জেলখানায়। অথচ দাড়ি নেই, লুঙ্গি নেই, পরেন শান্তিপুরী ধুতি। তার পেছনে কাছা, সামনে কোঁচার বাহার। ফল যা হবার তাই হল। স্বজাতি মহলে চাঁইএর দল চঞ্চল হয়ে উঠলেন। শোনা গেল, এ হেন অনাচার কর্তৃপক্ষের নজরে না এনে তাঁরা কিছুতেই ঠাণ্ডা হবেন না। তাঁর নিজের আফিসেও স্বজাতির দলটাই তখন প্রবল। বলতে গেলে আমিই কেবল বিজাতীয়। তবু তাঁদের চেয়ে আমার উপরেই টানটা যেন বেশী পড়ল জেলর সাহেবের। আমি তাঁর জেলখানার অন্যতম অনুচর, কিন্তু বৈঠকখানার অদ্বিতীয় সহচর। একদিন সেখানে বসেই চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বলে ফেললাম, কাজটা ভালো হচ্ছে না, দাদা।

উনি তাকিয়া ঠেসান দিয়ে গড়গড়া টানছিলেন। হঠাৎ না বুঝতে পারার সুরে বললেন, কোন্ কাজটা ?

তাঁর সযত্ন-রচিত কোঁচাটা দেখিয়ে দিলাম।

মামুদ সাহেব হাসলেন, এ দিকে দেখছি তোমারও নজর পড়েছে। যাকে বলে, কোঁচায় সর্পভ্রম। কিন্তু যা ভাবছ তা নয়। এর পেছনে একটা মজার ইতিহাস আছে।

—কি রকম ? মজার গন্ধে একটু এগিয়ে বসলাম।

—তবে শোনো, বলে নলটায় গোটা কয়েক ঘন ঘন টান দিয়ে শুরু করলেন—

'বছর পাঁচেক আগেকার কথা। সিউড়ি থেকে বদলি হয়ে এলাম খুলনায়। চার্জ নেবার কদিন পর সন্ধ্যাবেলা বসে বসে ওয়ারেণ্ট চেক করছি। হাকিমের নামটায় নজর পড়তেই থেমে গেলাম। এস. বি. সেন। আমাদের সুনীল নয়তো? একসঙ্গে বি. এ. পাশ করেছি। তার কিছুদিন পরেই ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে কোথায় চলে গেল। অনেকদিন দেখা নেই। ও.-এস্‌কে ফোন করে জেনে নিলাম, হ্যাঁ, সুনীলই বটে। বাসার ঠিকানাটাও সংগ্রহ করে ফেললাম।

এই যা দেখছ, এইটাই আমার চিরকালের পেটেণ্ট চেহারা। আজন্ম ডিস্‌পেপটিক্‌। ভোরে উঠে এক চক্কর না ঘুরে এলে খিদে হয় না। পরদিন সকালেই বেড়িয়ে ফেরবার মুখে সুনীলের বাড়িতে গিয়ে হানা দিলাম। চাকর এসে বলল, বাবু এখনো ওঠেন নি। বাড়িতে মেয়ে-ছেলে নেই। ওর শোবার ঘরের দরজায় ধাক্কা দেওয়া গেল। ভেতর থেকে বিরক্ত সুরে সাড়া এল, কে? জবাব দিলাম না। মিনিট দুই অপেক্ষা করে একবার কড়া নেড়ে দিলাম। দরজা খুলে গেল। সুনীল সদ্যঘুমভাঙা রুক্ষ চোখ দুটো একবার আমার দাড়ি থেকে লুঙ্গি পর্যন্ত বুলিয়ে নিয়ে চড়া গলায় বলল, কাল না তোমাকে বলে দিলাম, আণ্ডা আমার চাই না? আবার এসেছ বিরক্ত করতে! আমি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললাম, না এসে উপায় কী হুজুর? আপনারা পাঁচজনে দুটো আণ্ডা না নিলে আমার পেট চলে কী করে?

আরে, এ যে মামুদ—বলেই কোমরের কাপড় সামলাতে সামলাতে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল।

বাসায় ফিরে প্রথমেই গিয়ে দাঁড়ালাম আমার শোবার ঘরে বড় আরশিটার সামনে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম নিজেকে। তারপর কী মনে হল, বৈঠকখানায় এসেই নাপিত ডেকে পাঠালাম। চেহারাটা খোদার দেওয়া। ওটা তো আর ছাড়া যায় না। ছাড়লাম আমার অনেকদিনের পুরোনো সাথী—দাড়ি আর লুঙ্গি।

আমি বললাম, কিন্তু দাদা, ওরা আপনাকে অত সহজে ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না। হয়তো এবার ঐ পাঁচ বছরের অবহেলার শোধ নিয়ে বসবে।

—দেখা যাক, বলে নলটা আবার তুলে নিলেন মামুদ সাহেব।

যে সময়ের কথা বলছি, তার কিছুদিন পরেই নোয়াখালির রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়েছিল সেই বীভৎস নাট্যলীলা। এটা ছিল তারই মহড়ার যুগ। সুতরাং জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ধ্বজা-ধারী একদল বীরপুরুষ আচকান আর পায়জামা চড়িয়ে হঠাৎ একদিন হানা দিলেন মামুদ সাহেবের বৈঠকখানায়। ভুল উর্দুর সঙ্গে খাঁটি স্বদেশী খিস্তি মিলিয়ে তাঁর ধুতি আর শ্মশ্রুহীন মুখের বিরুদ্ধে ঘোষণা করলেন জেহাদ। মামুদ দমবার পাত্র নন। নির্ভুল উর্দুতে মোলায়েম সুরে যে জবাব দিলেন, তার মানে হচ্ছে, ওটা তাঁর ব্যক্তিগত রুচির এলাকা, এবং সে জায়গায় অন্যের নির্দেশ বা উপদেশ তিনি অনধিকারচর্চা বলে মনে করেন।

এর মাসখানেক পরেই এল ওদের ঈদ্ পর্ব। স্থানে অস্থানে কোরবানির ধুম পড়ে গেল। মামুদের রন্ধনশালায় মাংস জিনিসটা নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু তার জাত সম্বন্ধে বাছ-বিচার ছিল। মুরগী এবং খাসী ছাড়া আর কোনো জন্তু সেখানে ঢুকবার অধিকার পায় নি।

ব্যাপারটা তাঁর স্বজাতি-মহলে তোলপাড় তুলেছিল। হঠাৎ কথা নেই, বার্তা নেই, ঈদের দিন সকালবেলা খান বাহাদুরের কুঠি থেকে কুলির মাথায় বিশাল একটা ঝুড়ি এসে হাজির। বিশ-পঁচিশ সের গোস্ত—জেলর সাহেব এবং তাঁর স্বধর্মী সহকর্মীদের জন্যে কিঞ্চিৎ উপহার! মামুদের আরদালি ছিল ইয়াসিন সেখ। সেই বৃহৎ মাংসখণ্ডগুলোর দিকে একবার তাকিয়েই তাড়াতাড়ি কুলিটাকে সরিয়ে দেবার আয়োজন করছিল। মামুদ বাধা দিলেন। ঐ ইয়াসিনকে পাঠিয়ে জেলের বাগান থেকে আনিয়ে নিলেন তুজন কোদালধারী কয়েদী। বাড়ির পেছনে খানিকটা পোড়ো জায়গা পড়ে ছিল। তারই এক কোণে খোঁড়া হল একটা ছোটখাটো কবর। মাংসের টুকরাগুলো সযত্নে মাটি চাপা দেবার পর, কুলির সঙ্গে যে মৌলভী গোছের লোকটি এসেছিলেন, তার দিকে ফিরে বিশুদ্ধ উর্তু ভাষায় বিনীত কণ্ঠে বললেন মামুদ, খান বাহাতুর সাহেবকে আমার হাজার হাজার আদাব জানাবেন। তাঁর উপহার পেয়ে আমি ভারী খুশী হয়েছি।

এই আদাবের উত্তর কখন কী ভাবে পাঠিয়েছিলেন খান বাহাতুর, সেটা জানবার আমার অবকাশ হল না। তার আগেই এসে গেল বদলির হুকুম।

মাস ছয়েক পরে আদালত থেকে কী একটা মামলায় সাক্ষীর সমন পেয়ে আবার যেতে হয়েছিল সেই পুরাতন কর্মস্থলে। শুনলাম, মামুদ সাহেব তখনো টিঁকে আছেন। কোর্টের কাজ সেরে গেলাম দেখা করতে। খবর পেয়েই ছুটে এলেন বৈঠকখানায়। পরনে শান্তিপুরী ধুতি নয়, হাওড়া হাটের লুঙ্গি; আর চিবুকের তলায়

কিঞ্চিৎ স্থুর। বাঁ হাতটায় একটা ব্যাণ্ডেজ। বোধ হয় একটু বিস্মিত দৃষ্টিতেই তাকিয়ে ছিলাম। উনি ম্লান হেসে বললেন, তোমার কথাই ঠিক হল, মলয়। এরা শোধ নিয়েছে, ভালো করেই নিয়েছে। ...সেবার মান রাখতে গিয়ে পোশাক ছেড়েছিলাম। এবার চাকরি রাখতে গিয়ে মান ছাড়লাম।

শেষের দিকে গলাটা কেমন উদাস হয়ে এল। আমি সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বললাম হাতে কী হল ?

—হাতে ? ও-ও, সেও এক মজার ব্যাপার। বলছি, বোসো।

মামুদ সাহেব ভিতর থেকে একবার ঘুরে এলেন। তার আগেই এল ঘরের তৈরী সন্দেশ আর চা। মিনিট কয়েক যেতে না যেতেই জমে উঠল আমাদের সেই পুরোনো দিনের আড্ডা। তারই ফাঁকে শুনতে পেলাম ওঁর ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতের কাহিনী।

তিন-চার দিন আগের ঘটনা। তখনো ঠিক ভোর হয় নি। জেলর সাহেবের ঘুম পাতলা হয়ে এসেছে। হঠাৎ কানে গেল একটানা বাঁশির স্থুর। এ সর্বনেশে বাঁশি তাঁর চেনা। বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। দু-তিন মিনিট না যেতেই জেল-গেটে উঠল পেটা ঘণ্টার আর্তনাদ। জেল-অ্যালার্ম! চলতি কথায় যাকে বলে পাগলা-ঘন্টি। হাতের কাছে যা পেলেন, তাই জড়িয়ে নিয়ে ছুটলেন মামুদ। ততক্ষণে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে গেছে লাঠি-পার্টি, আর তার সামনে রাইফেল-ধারী স্কোয়াড। হুকুম পেলেই ডবল মার্চ করে ঢুকে পড়বে জেলখানায়।

সদলবলে অকুস্থলে গিয়ে দেখলেন মামুদ, যা আশঙ্কা করেছিলেন, ঘটেছে ঠিক তাই। তেরো নম্বরের জানালার শিক ভেঙে উধাও হয়েছে

এক ছোকরা কয়েদী। জেলর সাহেবের নাকের উপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উঁচিয়ে আছে তার মরচে-ধরা ক্ষয়ে-যাওয়া ভাঙা ডগা। মুহূর্তমধ্যে সারা জেল জুড়ে শুরু হল তাণ্ডব। তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল প্রতিটি বাড়ির কোণ, পাঁচিলের ধার, গাছের ডাল আর নর্দমার তলা। কিন্তু পলাতকের সন্ধান পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল পাঁচিলের গায়ে দাঁড় করানো একটা বাঁশ আর তার পাশে একটা ছেঁড়া কুর্তা।

ছেলেটার নজর আছে, বললেন মামুদ সাহেব। এতদিন থাকল আমার হোটেলে। যাবার সময় বখশিশ দিয়ে গেল গায়ের একটা ছেঁড়া জামা।

পাগলা-ঘন্টি শেষ হবার আগেই এসে পড়লেন জেল-সুপার। পরীক্ষা করলেন ভাঙা শিক আর ছেঁড়া কুর্তা। তারপর চারটা সিপাইকে সাস্‌পেণ্ড করে উঠলেন গিয়ে গাড়িতে।

চারটা সিপাই! সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন মামুদ সাহেবের প্রতিবেশী এক উকিলবাবু। মিনিট দশেক আগে এসে আমার পাশে একটা চেয়ার দখল করেছিলেন।

মামুদ বললেন, সেইটাই সাধারণ নিয়ম। একটা 'এসকেপ' মানেই চারজনের গর্দান।

—তারা সব কারা? জানতে চাইলেন উকিলবাবু।

—এই ধরুন, এক নম্বর: বাবুটি যে ওয়ার্ড থেকে চম্পট দিলেন, তার ওয়ার্ডার-ইন্‌-চার্জ। দু নম্বর—যেখান দিয়ে তিনি পাঁচিল লঙ্ঘন করলেন, সেই অঞ্চলের ওয়াল-গার্ড। তিন নম্বর হল জানালা-ঠোকাই।

—সেটি আবার কে?—কৌতুককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন উকিল ভদ্রলোক।

মামুদ হেসে বললেন, জানালা-ঠোকাই চেনেন না! বড়ই মুশকিলে ফেললেন দেখছি। পরিচয়টা একটু জানিয়ে দাও তো, মলয়। আমি ততক্ষণ মৌতাতটা সেরে নিই। তোমরা তো এ রসে বঞ্চিতই রয়ে গেলে।

গড়গড়ার নলটা মুখে তুললেন জেলর-সাহেব। সদ্য-সাজা অম্বুরী তামাকের মিষ্টি গন্ধে ঘর ভরে উঠল। বললাম, একেবারে বঞ্চিত হই নি দাদা। ঘ্রাণেন কিঞ্চিৎ পাচ্ছি বৈকি। তবে সেটা হয়তো ঠিক অর্ধ-ভোজন নয়।

উকিলবাবুর দিকে ফিরে বললাম, আপনার তো জেলের পাশেই বাড়ি। রোজ দুটো আড়াইটার সময় সারা জেলে একটা শব্দ শোনা যায়—ঠন ঠন, ঠন ঠন, ঠক ঠক। কখনো লক্ষ্য করেন নি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ; মাঝে মাঝে শুনতে পাই বটে। বাড়িতে আমরা বলাবলিও করেছি। কেউ বলতে পারে নি ওটা কী।

—ওটা হচ্ছে, লোহার ডাণ্ডা দিয়ে জানলা-দরজার শিক ঠোকার শব্দ। একজন সিনিয়র ওয়ার্ডারের ওপর ঐ দরকারী কাজটার ভার পড়ে। তারই নাম জানলা-ঠোকাই। সন্ধ্যাবেলা 'লক-আপ'এর ঠিক আগে তাকে রিপোর্ট দিতে হয় জেলর সাহেবের কাছে, জানলা দরজা সব পরখ করে দেখলাম, 'সব ঠিক হ্যায়'। এই রকম আর একজন আছে; ঠিক সন্ধ্যার আগে টহল দিয়ে ফেরে সারা জেলখানা। দেখে বেড়ায়, কোথাও পড়ে আছে কিনা বাঁশ, দড়ি কিংবা ঐ ধরনের কোনো মারাত্মক জিনিস। তাকেও রিপোর্ট দিতে হয় লক-আপ

টেবিলে, তামাম জেলখানা ঘুম্-ঘাম্‌কে দেখা। বাঁশ রশি সব বন্ধ্ হ্যায়।

ঐ হল চার নম্বর, যোগ করলেন মামুদ সাহেব।

সুপার চলে যেতেই শুধু বড় জমাদারকে সঙ্গে নিয়ে জেলের ভিতরটা চুপি চুপি ঘুরে দেখছিলেন জেলর সাহেব। কয়েদীরা তখনো বন্ধ। ফিমেল ওয়ার্ডের পাশ দিয়ে পথ। হঠাৎ কানে এল কলকণ্ঠের হাসির ঝঙ্কার। কী ব্যাপার? একটু দাঁড়িয়ে গেলেন মামুদ সাহেব। শুনলেন, বলে উঠল কে একটি মেয়ে, কী মুশকিল! কতক্ষণ আর আটকে রাখবে?

—চুপ কর না, ধমকে উঠল আরেকজন। কী রকম মজাটা হল, মাইরি। সাহেব থেকে সিপাই সকলের মুখ চুন।

—যা বলেছিস ভাই, উচ্ছ্বলিত কণ্ঠ শোনা গেল আর-একটি মেয়ের। ওঃ, যা আনন্দ হচ্ছে! বাহাদুর বটে ছোকরা। একবার দেখতে ইচ্ছে করে, সত্যি।

এর পর যে মন্তব্য শোনা গেল, তার মধ্যে কিঞ্চিৎ আদি রসের আধিক্য। মামুদ লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলেন। কিন্তু ওদের ঐ অহেতুক উল্লাসের নিগূঢ় সত্যটি তাঁর মনের মধ্যে লেগে রইল। যে ছেলেটা পালিয়ে গেছে সে এদের কেউ নয়। তার কোনো পরিচয় এরা জানে না। কখনো দেখে নি, নামও শোনে নি কোনোদিন। পালিয়ে গেছে বলেই আজ সে ওদের আপনার জন। তার সঙ্গে এদের একাত্মতা। যে শৃঙ্খলে এরা বাঁধা পড়ে রইল, তারই বন্ধন সে ছিঁড়ে চলে গেছে, অগ্রাহ্য করে গেছে এই পাষাণ-প্রাচীরের অবরোধ, এই সিপাই-শান্ত্রী, লাঠি-বন্দুকের ভ্রূকুটি। ওদের মনেও

লেগেছে সেই মুক্তির বাতাস। সমস্ত জেলের আজ আনন্দের দিন।

গোটা দুয়েকের সময় আবার অ্যালার্ম বেজে উঠল।

—আবার!

মামুদ সাহেব বললেন, কী করা যাবে বল? কপালে দুঃখ থাকলে কেউ খণ্ডাতে পারে না। এবারকার ঘটনাস্থল জেনানা ফাটক। গিয়ে দেখলাম, জন চারেক পড়ে আছে দাঁত লেগে; একদল হাত-পা ছুঁড়ছে, মানে হিস্টিরিয়া; আর বাকীগুলো পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। ডাক্তার বেচারা যে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। কারো নাকে দিচ্ছে স্মেলিং সল্ট্, কারো মাথায় ঢালছে জলের বালতি। ব্যাপার যা শুনলাম, রীতিমতো ভৌতিক কাণ্ড।

শীতের দিন। খোলা উঠোনে বসেই মেয়েরা তাদের দুপুরের বিশ্রামটুকু সেরে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ একজনের নজর পড়ল কম্পাউণ্ড পাঁচিলের ওধারে একটা ছোট ব্যারাকের ছাদের উপর। সারি সারি মাটির গামলা উপুড় করে বসানো।

গামলা কেন? প্রশ্ন করলেন উকিলবাবু।

দেখছেন না? কোন্ শায়েস্তা খাঁর আমলের বাড়ি। তখন ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা ছিল ছাদ ফুটো করে। সেখান দিয়ে আবার বৃষ্টি আসবে তো? তাই ঐ গামলার ঢাকনা। মেয়েটার মনে হল ওরই ভেতর একটা বড় গামলা বেশ তালে তালে নাচছে।

তোমরা হাসছ; কিন্তু ওর হার্ট বেচারি তখন ফেল করে-করে। বেশ করে চোখ রগড়ে আরেকবার দেখল। নাঃ, ভুল নয়। দু-চার মিনিট বিশ্রাম নিয়ে গামলা-সুন্দরী আবার নৃত্য শুরু করলেন। সবাই

জানে, ওটা হচ্ছে কলেরা ওয়ার্ড, আর ওর ঠিক পাশেই হচ্ছে ফাঁসি-মঞ্চ, যাকে বলে gallows। কিছুদিন আগেই সেখানে একজনকে ঝোলানো হয়েছে। ব্যস্, আর যায় কোথায়! মেয়েটির জিব গেল টাকরায় আটকে, চোখ উঠল কপালে আর গলা থেকে বেরিয়ে এল একটা গোঁ গোঁ গোছের বিকট আওয়াজ। তার হাতের ইশারা লক্ষ্য করে আরো দু-চার জন যারা তাকিয়েছিল ঐ দিকে তারাও এক দফা নাচ দেখে নিল। তারপরে যে কাণ্ড হল, সেটা তোমরা কল্পনা করে নাও, আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। আমার ফিমেল ওয়ার্ডার ডিউটির নাম করে একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলেন। হাঁউ মাউ শুনে যখন জ্ঞান হল, দেখলেন situation out of control। তাঁর হাতে তখন একটিমাত্র অস্ত্র—ঐ বাঁশি। তাই প্রাণপণে ফুঁকে দিলেন।

এবার বিশাল বাহিনী নিয়ে হানা দিলাম কলেরা ওয়ার্ডের ফটকে। খালি বাড়ি পড়ে আছে। ছাতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এতগুলো লোকের ঘাড় ব্যথা হয়ে গেল। নৃত্যদর্শনের সৌভাগ্য হল না। ভৌতিক জগতের যাঁরা বাসিন্দা, তাঁদের স্বভাব চরিত্র ঠিক জানা নেই। তাঁরা ভয় দেখান শুনেছি। হয়তো জায়গা বিশেষে ভয় পেয়েও থাকেন। বিশেষ করে জেলখানার পাগলা-ঘন্টিকে কেয়ার করে না এরকম পাগলা ভূত পাওয়া দুষ্কর। রিট্রিট করব কিনা ভাবছি। হঠাৎ যেন মনে হল, গামলাটা একটু নড়ছে। সবাই রৈ রৈ করে উঠল, কিন্তু উপরে উঠে ব্যাপারটা পরখ করবার হুকুম যখন দিলাম, সব চুপ চাপ। তবে দু-একজন সাহসী মানুষ জেল ফোর্সেও থাকে। তারি একজন একটা মই লাগিয়ে খানিকটা উপরে উঠে গেল, এবং অনেক খানি দূর থেকে গামলা তাক করে ছুঁড়ে মারল লাঠি। গামলাটা

ভেঙে যেতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল খালি-গা, জাঙিয়া-পরা লিকলিকে এক ছোকরা। আমাদের দিকে চেয়েই কেঁদে উঠল ভেউ ভেউ করে।

পুরীর সমুদ্র দেখছ ? তার চেয়েও মহা বিক্রমে গর্জে উঠল আমার ফোর্স।

মইটাকে তৎক্ষণাৎ সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করলাম আর হাবিলদারকে বললাম রিজার্ভ ফোর্স ফিরিয়ে নিতে। নিতান্ত অনিচ্ছায় তারা মার্চ করে চলে গেল। আরদালি, বডিগার্ড গোছের ছ-চারজন যারা রইল, তাদের বিশেষ মারমুখী বলে মনে হল না। এইবার মই লাগিয়ে ছেলেটাকে বললাম নেমে আসতে। সে কি আসতে চায় ? ছাদের উপর দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল হাত জোড় করে। জিজ্ঞেস করলাম, পালিয়েছিলি কেন ?

—মেট মারত রোজ।

—কেন ?

আর কথা বলে না। ছ-চারটা ধমক দিতেই বলল, খারাপ কাজ করতে চেয়েছিল ; আমি দিই নি।

অসম্ভব নয়। ছেলেটা দেখতে সুশ্রী। বললাম, এখানে এসে জুটলি কী করে ?

সেও এক তাজ্জব কাহিনী। শেষ রাতে শিক ভেঙে তো বেরোল। রান্নাঘরের পাশ থেকে একটা বাঁশও যোগাড় হল। কিন্তু নানা রকম কসরত করেও পাঁচিলে ওঠার সুবিধে হল না। এদিকে ভোর হয়ে আসছে। হঠাৎ কারো নজরে পড়লে পাঁউরুটি বানিয়ে দেবে। তাই ফরসা হবার আগেই কোনোরকমে গা ঢাকা দিয়ে পাইপ বেয়ে

উঠল কলেরা ওয়ার্ডের মাথায় আর আশ্রয় নিল গামলার নীচে। তারপর সাত-আট ঘণ্টা বসে থেকে কোমরে আর পায়ে যখন খিল ধরে গেছে, তখন ঐ গামলা মাথায় দিয়েই মাঝে মাঝে উঠে একটু লেফট রাইট করবার চেষ্টা করছিল।

জেনানা ফাটক থেকে একজন যে সেদিকে চোখ দিয়ে বসে আছে, ও কেমন করে জানবে?

অনেক করে ভরসা-টরসা দেবার পর নামতে রাজি হল ছোকরা। মাটিতে পা দিতে যাবে, এমন সময় চোখের পলকে কোত্থেকে ছুটে এল চার-পাঁচজন বীরপুরুষ। একটা নিরীহ ছাগল ছানার ওপর লাফিয়ে পড়ল একপাল নেকড়ে। ও ব্যাটাও ওস্তাদ কম নয়। বেটনের বেড়াজাল এড়িয়ে কেমন করে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল এসে আমার পায়ের ওপর। বাঁ হাতটা বোধ হয় একটু বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। হঠাৎ তার ওপর সপাং করে উঠল বেটনের ঘা।

জেলর সাহেব আবার গড়গড়ার আশ্রয় নিলেন। বলবার মতো কিছু ছিল না। আমরা শুধু নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলাম। কয়েক মিনিট পর অনেকটা যেন কৈফিয়তের সুরে বললেন মামুদ, সকালে যাদের সাসপেণ্ড করা হয়েছে ঐ সিপাইটা তাদেরই একজনের ছেলে। ছোকরা মানুষ। নিজেকে ঠিক সামলাতে পারে নি।

বললাম, তা তো বুঝলাম। কিন্তু আপনার যে সামলে উঠতে বেশ কিছু দিন লাগবে।

—না হে। এমন কিছু নয়। ডাক্তারদের কাণ্ড তো? কেরামতি দেখাবার কোনো একটা সুযোগ পেলেই হল। অফিসে যেতে

পারতাম, কিন্তু ঐ হতভাগাটা শুনছি ঘুরঘুর করছে বাড়ির চারদিকে মতলব মোটেই ভালো নয়।

বলেন কী? রাগে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন উকিলবাবু। মামুদ সাহেবও চড়া গলায় বললেন, তাই দেখুন না? লাঠি ঠুকে নুলো বানিয়ে দিলি; তাতে আশ মিটল না। এবার কপাল ঠুকে খোঁড়া না বানিয়ে ছাড়বে না।

তারপর একটু হেসে স্বর নামিয়ে বললেন, তাই কটা দিন একটু গা ঢাকা দিয়ে আছি।

তিন

বছরটা ঠিক মনে নেই। ইংরেজি চুয়াল্লিশ কিংবা পঁয়তাল্লিশ সাল। দেশ জুড়ে চলেছে মন্বন্তর। দক্ষিণ বাংলার যে অঞ্চলে আমার আস্তানা, একদিন সে অন্ন জুগিয়েছে সারা বাংলার ঘরে ঘরে। সরকারী নথিপত্রে তার নাম ছিল Granary of Bengal. সেদিন এক গ্রেন শস্য নেই তার ভাণ্ডারে। মাঠভরা পাকা ধান। তারই পাশে দাঁড়িয়ে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে চাষীর দল। অজন্মা নয়, তাদের সোনার খেত শুষিছে মানুষ প্রেত। তার একহাতে দাঁড়িপাল্লা আর এক হাতে বন্দুক। তাই একদিকে চলেছিল অন্নের ছড়াছড়ি, আর এক দিকে নিরন্নের হাহাকার।

দেশের লক্ষ্মী যখন ছেড়ে যায়, জেলখানার তখন বাড়-বাড়ন্ত। যে জেলটা আমি তখন আগলে আছি, তার স্থায়ী পোষ্য ছিল পাঁচ-ছ শো। গোটা কয়েক ধাপ ডিঙিয়ে সংখ্যাটা হঠাৎ হাজারের কোঠা ছাড়িয়ে গেল। ওদিকটায় যেমন জোয়ারের জোর, ভাঁড়ারে তেমনি ভাঁটার টান। সেই নিত্যবর্ধমান গহ্বর কেমন করে পূর্ণ করি, এই ভাবনায় আমার ঘুম নেই। একদিন সন্ধ্যাবেলা আফিসে বসে বসে সেই কথাই ভাবছিলাম। পাঁচ-সেরী চাবির গোছা হাতে ঝুলিয়ে কুণ্ঠিত ভাবে এসে দাঁড়ালেন আমার স্টোর-কীপার, বিরাজ মুন্সী ; জেল পরিভাষায় যাঁর নাম—গুদামী বাবু। কারাভাণ্ডারের অন্নপূর্ণা, সুতরাং সহকর্মীদের চিরন্তন ঈর্ষার পাত্র, কিন্তু ঘটনাচক্রে সেদিন তাঁর

অবস্থাটা ঠিক অভাবগ্রস্ত বৃহৎ পরিবারের গৃহিণীর মতো। অপ্রসন্ন মুখে 'বাড়ন্ত' ছাড়া আর কোনো বার্তা নেই। দর্শনমাত্রেই কর্তার মেজাজ সপ্তমে চড়ে ওঠে। আমি যখন জিজ্ঞাসু চোখে মুন্সীর দিকে তাকালাম, সেখানেও তেমনি ফুটে উঠল সেই বিরক্তির রুক্ষতা।

বিরাজবাবু বিনা ভূমিকায় নিস্পৃহ কণ্ঠে রিপোর্ট দিলেন, আর পঁচিশ বস্তা আছে, স্যর।

পঁচিশ বস্তা! অর্থাৎ দিন তিনেকের সংস্থান। খবরটা আমার অজানা নয়, অপ্রত্যাশিতও বলা যায় না। তবু রূঢ় কণ্ঠ চাপা রইল না—মোটে পঁচিশ বস্তা! এই না সেদিন দু শ বস্তা যোগাড় করলাম কত কাণ্ড করে? এরই মধ্যে উড়ে গেল!

মুন্সীর মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। অনাবশ্যক মনে করে আমার প্রশ্নের জবাবটা আর দিলেন না।

চাল-সংগ্রহের প্রাথমিক প্রয়োজন—একখানা সরকারী পারমিট। তখন সিভিল্-সাপ্লাই নামক স্বনামধন্য সংস্থা জন্মলাভ করলেও, ডালপালা বিস্তার করে চারদিকটা জাঁকিয়ে বসে নি। পারমিট বস্তুটির ভার ছিল একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে। সেই রাত্রেই তাঁর দ্বারস্থ হলাম। বৈঠকখানা ঘরেই আফিস। হিসাবপত্র দেখে-শুনে বললেন, আপনার এই রাক্ষুসে খাঁই মেটাবার মতো মাল আমার হাতে নেই, মশাই। আপনি সাহেবের কাছে যান।

সাহেব, অর্থাৎ কালেক্টর ছিলেন একজন জবরদস্ত শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ান। সন্ধ্যার পরেই দ্রব্যগুণে তিনি এমন এক ঊর্ধ্বরাজ্যে বিচরণ করতেন যেখানে আমার মতো সামান্য ব্যক্তি কিংবা চালডালের মতো তুচ্ছ বস্তুর প্রবেশ একরকম অসম্ভব। তবু, নিতান্ত নিরুপায়

হয়েই তাঁর দরজায় ধন্না দিলাম, এবং বহু সাধ্যসাধনার পর দর্শনলাভও পাওয়া গেল। তথ্যাদি সহ আমার দাবি পেশ করে ব্যাপারটা যে অত্যন্ত জরুরি এবং সরকারের প্রাথমিক দায়িত্বের অন্তর্গত, সে বিষয়েও একটা ছোটখাট বক্তৃতা যোগ করে দিলাম। সাহেব অত্যন্ত ধীর ভাবে আমার বক্তব্য শেষ পর্যন্ত শুনে গেলেন এবং ততোধিক ধীরভাবে প্রশ্ন করলেন, জেলে একটা আর্মারি আছে না?

প্রশ্নটা ধাক্কা খাবার মতো হলেও জবাব দিলাম, আছে।

—কত বন্দুক হবে?

—একশো।

—এস্ পি-কে বলে দিচ্ছি, আর একশো ওদের স্টক্ থেকে ধার নিন। আপনার কয়েদী, বলছিলেন, এক হাজার? তাহলে রাইফল্-পিছু পাঁচজন করে পড়ছে। কতক্ষণ লাগবে, মনে করেন? পাঁচ মিনিট! না হয়, বড়জোর দশ মিনিট? কী বলেন?

বলা বাহুল্য, অঙ্কটা নির্ভুল হলেও প্রশ্নটার জবাব দিতে পারলাম না। কালেক্টর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, পারবেন না? বেশ; তাহলে এক কাজ করুন। দুটো গেট একসঙ্গে খুলে দিন। তারপর এক-একটা জানোয়ার ধরে এনে (অঙ্গবিশেষের নাম করে বললেন, তার ওপর) কষে গোটাকয়েক লাথি মেরে ঘাড় ধরে বের করে দিন।······আর তাও যদি না পারেন, চাকরি ছেড়ে বাড়ি চলে যান।

আপাতত সেইটাই একমাত্র পন্থা বুঝতে পেরে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালাম। দরজা পার হয়ে বারান্দায় পড়েছি, এমন সময় আবার ডেকে ফেরালেন কালেক্টর। বললেন, কত চাল চাই আপনার?

—যত দিতে পারেন। আমার দৈনিক প্রয়োজন সাড়ে বাইশ মন।

বিড়বিড়-করে গোটা কয়েক টমি-সুলভ শপথ উচ্চারণ করে কলিং বেলটা ঠুকে দিলেন। চাপরাশী ছুটে আসতেই হুকুম হল, হ্যারিকৃষ্টোবাবু। মিনিট তিনেকের মধ্যেই চাপরাশীর পেছনে হ্যারিকৃষ্টো অর্থাৎ আমাদের হরেকৃষ্ণ হালদার এসে উপস্থিত। নিচেই কোথাও অপেক্ষা করছিলেন, মনে হল। এই দুর্দান্ত শীতে একটা টুইলের শার্ট এবং তার উপর একখানা সাধারণ আলোয়ান ছাড়া আর কোনো আচ্ছাদন নেই। শহরের সবচেয়ে বড় আড়তদার। টাকা যে কত, লোকে বলে, সে হিসাব ওর নিজেরই জানা নেই। হয়তো তারই গরমে আর শীতবস্ত্রের প্রয়োজন হয় নি। আমার দিকে একটা ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি চালান করে কোমর দুভাঁজ করে সেলাম ঠুকলেন সাহেবের সামনে। সাহেব কড়া সুরে হুকুম করলেন, জেলের জন্যে দুশো মন চাল চাই।

—কবে, হুজুর?

—আজ রাতের মধ্যে।

—এত চাল তো হাতে নেই, স্যর।

—হোয়াট!—সাহেবের রক্তচক্ষু বিস্তৃত হল।

হরেকৃষ্ণ মাথা চুলকে বললেন, আজ্ঞে আমার রিটার্নটা যদি দেখেন হুজুর, তাহলে—

—হ্যারিকৃষ্টোবাবু! গর্জে উঠলেন কালেক্টর। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উপর বিপুল বজ্রমুষ্টি।

হরেকৃষ্ট আর মুখ খুললেন না; হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন। সাহেব কিঞ্চিৎ সুর নামিয়ে বললেন, লুক্ হিয়ার, হ্যারিকৃষ্টোবাবু,

তোমার সঙ্গে বেশি কথা বলবার সময় আমার নেই। এক ঘণ্টার মধ্যে মাল ডেলিভারি না দিলে আমি তোমার সমস্ত স্টক সীজ করব।

—আজ্ঞে, হুজুর যখন আদেশ করছেন, যেমন করে হোক দিতেই হবে যোগাড় করে। তবে—

—ব্যস।

হরেকৃষ্ণবাবুর সঙ্গে এক গাড়িতেই ফিরলাম। পথে আসতে আসতে বললেন, দেখলেন, ব্যাটার চোট? মদ খেলে আর কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান থাকে না। আরে, ভালো করে বললেই তো হয়। আমি কি বলেছি, দেব না? বিশেষ করে যখন গবর্মেন্টের দরকার……। আমার কোনো সাড়া না পেয়ে এবার ব্যঙ্গের সুরে বললেন, স্টক সীজ করবেন! হুঁঃ, সীজ অমনি করলেই হল! আমার হাতেও কলকাঠি আছে, মশাই। একবারটি ঘুরিয়ে দিলে আপনার জেলখানায় চাঁদের হাট বসে যাবে।……বলে টেনে টেনে হাসতে লাগলেন। আমি তার মাঝখানেই বলে ফেললাম, চালটা তাহলে কখন দিচ্ছেন, হরেকৃষ্টবাবু?

—দাঁড়ান, আর একটু রাত হোক। রাস্তায় লোকচলাচল বন্ধ হোক। তা না হলে রক্ষা আছে? আর, আপনিই বা মিছিমিছি কষ্ট করবেন কেন? বাসায় চলে যান। একজন কেরানী-টেরানী কাউকে পাঠিয়ে দেবেন। ওজন করে মাল বুঝে নিয়ে যাবে।

বললাম, আবার কাকে পাঠাব? এতটা যখন এসেই পড়েছি, চলুন নিজেই নিয়ে যাই।

মনে মনে বললাম, তোমাকে আমার এখনো বুঝতে বাকী আছে,

হ্যারিকুষ্ট? এক মিনিট কাছছাড়া হলে, এমন ডুব মারবে যে, আমার কেরানী কেন, তাদের সমস্ত পিতৃকুল এসেও তোমার টিকিটি খুঁজে পাবে না।

জেল-গেটে মাল পৌঁছে দিয়ে যখন বাড়ি ফিরলাম, রাত প্রায় একটা। ফটকের সামনে মনে হল একটা কাপড়ের পুঁটলি পড়ে আছে। আমার সাড়া পেয়ে ছিটকে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল পায়ের উপর। কাছেই যে সেন্ট্রি টহল দিচ্ছিল, রা-রা করে ছুটে এল। হাত তুলে থামিয়ে দিলাম। এদিকে পায়ের উপর যে পড়ল, তার আর নড়াচড়ার নাম নেই।

অনেক টানাটানির পর যখন মাথা তুলল, মুখটা দেখে মনে হল চেনা-চেনা। চোদ্দ-পনেরো বছরের একটা কঙ্কালসার দেহ। পরনে ছেঁড়া প্যান্ট। তার উপর জড়ানো একখানা জীর্ণ চাদর। বললাম, কে তুই?

—-আমি ফটিক।

—ফটিক কে রে?

—আপনার জেলে ছিলাম। ছ মাস মেয়াদ খেটে বেরিয়েছি আজ সাত দিন।

—এখানে এসেছিস কী করতে?

—তিনদিন কিছু খাই নি হুজুর। আমাকে আবার জেলে ভর্তি করে নিন। যা কাজ দেবেন, সব করব।- বলে মাথাটা আবার ঘষতে লাগল আমার জুতোর উপর।

সেন্ট্রি হেসে উঠল এবং তারপরেই একটা মোক্ষম ধমক দিয়ে টেনে তুলল হাত ধরে।

বললাম, জেলে ভর্তি করব কি রে! এটা কি হোটেল, যে যাকে তাকে ঢোকালেই হল?

—আপনি সব পারেন, হুজুর, রুদ্ধ কণ্ঠে বলল ফটিক। ক্ষীণ আলোতেও দেখা গেল, তার দুচোখের কোল বেয়ে বয়ে চলেছে জলের ধারা।

প্রশ্ন করলাম, কে আছে তোর? এ কদিন কোথায় ছিলি?

উত্তরে যা বলল, তার থেকে মোটামুটি ইতিহাসটা পাওয়া গেল।

শহর থেকে মাইল দশ-বারো দূরে কী একটা গ্রামে ওদের বাড়ি। অবস্থা একেবারে খারাপ ছিল না। খেয়েপরে কোনোরকমে চলে যেত। জেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেখে খাঁ খাঁ করছে বাড়ি। বাপ মা দুজনেই মারা গেছে খেতে না পেয়ে। একটা বয়স্থা বোন ছিল, সেও নেই। সবাই বলল, মকবুল চৌধুরীর ছেলেটার সঙ্গে কোথায় নাকি চলে গেছে। বছর দশেকের ছোট ভাই ছিল একটা। তার খোঁজ কেউ জানে না। গ্রামে কোনো কাজ নেই। কাজ দেবার মতো লোকও নেই। শহরে ফিরে এসেও কিছু জোটাতে পারে নি।

বললাম, সরকারী লঙ্গরখানায় যাস নি কেন?

—গিয়েছিলাম হুজুর। দুদিন যাবার পর একটা পুলিশ চিনে ফেলল। রটিয়ে দিল এটা জেলখাটা দাগী চোর। তারপর আর তারা খেতে দেয় না। বাবুরা তাড়া করে, বলে শালা পকেট মারতে এসেছে। একদিন খুব মেরেছিল। এই দেখুন, বলে কাঁদতে লাগল। দেখলাম, গোটা হাতটা ফুলে আছে।

পকেটে মনিব্যাগ ছিল। গোটা দুই টাকা বের করে ফটিকের হাতে দিতে গেলাম। হাত বাড়াল না। মাথা নেড়ে বলল, টাকা

চাই না, বাবু। আমাকে জেলে ভর্তি করে দিন। আপনি হুকুম করলেই হবে। আপনার পায়ে পড়ি—আরেকবার পা জড়িয়ে ধরবার উপক্রম করতেই, আটকে দিল আমার সেন্ট্রি।

অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, জেলে ভর্তি করবার ক্ষমতা আমার নেই। কোর্ট থেকে ওয়ারেন্ট নিয়ে যারা আসে, তারাই শুধু ঢুকতে পারে জেলখানায়। এ-সব আইন-কানুনের কথা সে কানে তুলতেও চাইল না। বললাম, আজ এই টাকা দুটো নিয়ে যা। কিছু কিনে-টিনে খেয়ে নে। কাল আবার আসিস। যাহোক একটা ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু ফটিক নাছোড়বান্দা। যেমন করে হোক, জেলেই তাকে ফিরিয়ে নিতে হবে। তা না হলে নড়বে না। অগত্যা, বাকী রাতটুকুর জন্যে আমার বাইরের বারান্দায় তার থাকবার ব্যবস্থা করে দিলাম। সেন্ট্রি আপত্তি করতে লাগল। এই সব চোর-চোট্টার উপর দয়া দেখাতে গিয়ে অনেকের অনেক বিপদ ঘটেছে, তার কয়েকটা পুরোনো নজিরও দাখিল করল। একটু কড়া নজর রাখবার নির্দেশ দিয়ে কোনো রকমে তাকে নিরস্ত করলাম।

পরদিন সকাল বেলা ও. সির নামে একটা চিঠি দিয়ে একজন সিপাই-এর জিম্মায় ফটিককে পাঠিয়ে দিলাম কোতোয়ালি থানায়। বিকেলে আফিসে যেতে হয়েছিল কী একটা দরকারী কাজে। টেলিফোন বেজে উঠল। পুলিস সাহেবের গলা—কী কাণ্ড বলুন তো? একেবারে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! খোদ কত্তার পকেটে হাত! তাও, তাঁরি এক পুরোনো মক্কেল! ভাগ্যিস, হাতে হাতে ধরে ফেলেছিলেন। যে-রকম দিনকাল পড়েছে মশাই, রাত-বিরেতে না বেরোনোই ভালো।

বললাম, আজই পাঠাচ্ছেন তো?

—বাপরে! আপনি দেখছি, বেজায় রেগে আছেন ব্যাটার ওপর। বাগে পেলে এক হাত না নিয়ে ছাড়বেন না? কিন্তু দেখছেন তো ক্রাইমের ঠেলা। বড় বড় রুই-কাতলা ধরে কূল পাচ্ছি না; আর ওটা তো একটা চুনোপুঁটি ছিঁচকে চোর। ও-সব যদি ধরতে শুরু করি জায়গা দেবেন কোথায়? খাওয়াবেন কী?…হ্যাঁ, আপনার চিঠি ও. সি. আমাকে পাঠিয়েছিল। আমি কিন্তু ব্যাটাকে ছেড়ে দিতে বলে দিয়েছি।

—ছেড়ে দিয়েছেন! হঠাৎ বেরিয়ে গেল আমার মুখ থেকে।

—হ্যাঁ; তবে একেবারে খালি হাতে যায় নি। দাওয়াই যা পড়েছে, বাছাধনকে এ জীবনে আর কারো পকেটে হাত দিতে হবে না। এ বিষয়ে আমার ও. সি. টির বেশ হাতযশ আছে—বলে হেসে উঠলেন পুলিশ-প্রধান।

চার

যতই বলুন, one cannot go against Nature. রক্তমাংসের ধর্মটাও ধর্ম।—বলতে বলতে আফিসের পরদা ঠেলে বেশ খানিকটা উত্তেজিত ভঙ্গীতে ঢুকে পড়লেন ডাক্তার সাহেব। একটা নারী-ঘটিত মামলার রায় পড়ছিলাম। বন্ধ করে বললাম, কী হল আবার? কার কথা বলছেন?

ঐ যে আপনার নিত্যানন্দ না কী নাম। দিন, দেশলাই দিন।

দেশলাইটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, নিত্যানন্দ নয়, সদানন্দ: ব্রহ্মচারী সদানন্দ। এই দেখুন, কত বড় জাজমেণ্ট।

আপনি দেখুন। ও-সব আমার অনেক দেখা আছে।

একটা চেয়ার টেনে বসে গোটা তিনেক কাঠি পুড়িয়ে সিগারেট ধরালেন ডাক্তার সাহেব। লম্বা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে নিয়ে বললেন, আসল ব্যাপারটা কী বলুন তো?

ব্যাপার রীতিমত জটিল। সারা জীবন ব্রহ্মচর্য করে, বুড়ো বয়সে একটা ঝিয়ের সঙ্গে—

এর মধ্যে জটিলটা কী দেখলেন। আমি তো দেখছি simple biological case. সেই কথাই বলছিলাম। সাধু-সন্ন্যাসীরা বলেন, নারী নরকের দ্বার। বেশ, মানলাম। কিন্তু আপনার দেহে রক্ত-মাংস যতক্ষণ আছে, ঐ দ্বারটি এড়াবার উপায় আছে কি? ব্রহ্মচর্যই করুন, আর গেরুয়াই ধরুন, ঘুরেফিরে ঐখানে এসেই হুমড়ি খেয়ে পড়তে হবে। সাপুড়েদের দেখেছেন তো? যতই সাবধান হোক,

একদিন ঐ সাপের হাতেই প্রাণ দিতে হয়। তেমনি বড় বড় শিকারীর শেষ গতি হল বাঘের পেট।

উপমাটা যে উলটো হল ডাক্তার সাহেব। সাপুড়ে আর শিকারীদের কারবারই হল ঐ নাগিনী-বাঘিনী নিয়ে। কিন্তু এঁরা যে স্ত্রী-জাতির ছায়াও মাড়ান না।

আরে মশাই, ছায়া মাড়ান না বলেই কায়ার ঠেলা সামলাতে পারেন না। যাকে আমি কামনা করি, তাকে যখন হাতের কাছে পাই, তার জন্যে লোভ বলুন বাসনা বলুন, হঠাৎ উগ্র হবার সুযোগ পায় না। কিন্তু সে যখন বেড়ায় আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে কোনো বাঁধ, হোক না সে আমার নিজের হাতে তৈরী, তখন আমাকে আর মোহ-মুদ্গর মেরে ঠেকানো যায় না। তখনই আসে ঐ বাঁধ-ভাঙার উন্মাদনা, যার চেয়ে মারাত্মক জিনিস আর কিছু নেই।

আমি মৃদু হেসে বললাম, আছে।

কী বলুন?

ডাক্তার যখন ছুরি ফেলে ফিলজফি ধরে।

ওঃ হো! ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। চারটে অপারেশন আছে। দুটো তার মধ্যে বেশ গোলমেলে। পালাই।—বলে লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন ডাক্তার সাহেব।

বললাম, কী রকম দেখলেন, বলুন।

কী রকম আবার? তিন দিন হয়ে গেল। ঐ তো শরীর। একদম নেতিয়ে পড়েছে। কাল সকাল থেকেই নাকে নল চালিয়ে দুধ ঢালতে হবে। তাই বলে এলাম ডাক্তারকে।

বলেন কী! তা হলে আমার কাজটা তো আজই সেরে নেওয়া দরকার।

আপনার আবার কী কাজ?

একটা হুমকি দিতে হবে, অবিলম্বে হাঙ্গার স্ট্রাইক প্রত্যাহার না করলে তোমাকে ফৌজদারী সোপর্দ করা করা হইবেক।

হুমকি দিতে হয় দিন, কিন্তু যা চীজ দেখলাম, বিশেষ কাজ হইবেক বলে তো মনে হয় না।

তবু ঐ হুমকি অর্থাৎ আইনানুসারে যথারীতি ওয়ার্নিং দেবার জন্যে সদলবলে হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ঠিকই বলেছেন ডাক্তার সাহেব। ব্রহ্মচারীর ক্ষীণ দেহ ক্ষীণতর হয়ে বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে। দিন তিনেক আগে নারী-ধর্ষণ মামলায় পাঁচ বছরের মেয়াদ নিয়ে তিনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। তারপর থেকে আর জলগ্রহণ করেন নি। অর্থাৎ জল ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করেন নি। কিসের জন্যে তাঁর এই কঠোর অনশন, বার বার প্রশ্ন করেও জানা যায় নি। এইটুকু শুধু জানিয়েছেন, এটা তাঁর হাঙ্গার স্ট্রাইক বা প্রায়োপবেশন নয়, কারও বিরুদ্ধে তাঁর কোনো ক্ষোভ বা অভিযোগ নেই। তবু আর-একবার ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম। উনি ম্লান হেসে বললেন, জবাব তো আমি আগেই দিয়েছি, সার্। কারণটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত।

কিন্তু আপনি যাকে ব্যক্তি বলছেন, জেলে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গত হয়েছেন। এখানে ব্যক্তিগত বলে আপনার কিছু নেই।

ব্রহ্মচারী চুপ করে রইলেন। আমি আর একটু পরিষ্কার করে বললাম, আপনার দেহ মন দুইই এখন সরকারের দখলে। তবে মন

জিনিসটা চোখে দেখা যায় না, ধরা-ছোঁয়া যায় না ; ওর ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করবার অস্ত্র আমাদের হাতে নেই। কিন্তু আপনার ঐ দেহটা সরকারী সম্পত্তি। যেমন করেই হোক ওকে বাঁচিয়ে রাখার দায় আমাদের।

ব্রহ্মচারী হাসলেন। নিজেকে দেখিয়ে কৌতুকের সুরে বললেন, কিন্তু এমন কিছু মূল্যবান সম্পত্তি নয় যে, সে দায় পালন না করলে সরকারের বিশেষ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

আপনি ভুল করলেন, ব্রহ্মচারী মশাই। মানুষ দায় বলে যাকে জানে, তাকে দায় বলেই পালন করে, লাভ-ক্ষতির হিসেব খতিয়ে দেখে না। সরকারের বেলাতেও সেই একই কথা।

সদানন্দ নিঃশব্দে চোখ বুজলেন। মুখে ফুটে উঠল গাম্ভীর্যের ছায়া। তার মধ্যে কয়েকটা বোধ হয় সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বের রেখা। বৃথা অপেক্ষা না করে এবার আমার আইন-প্রদত্ত অধিকার—অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশ দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করবার আদেশ জারি করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে উনি চোখ খুললেন, এবং অনেকখানি দ্বিধা ও সঙ্কোচের সুরে বললেন, আত্মহত্যা করা বা জেলের আইন-শৃঙ্খলা অমান্য করে আপনাকে বিব্রত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার এই উপবাসের মূলে আর কিছু নেই, ছিল শুধু একটু চিত্তশুদ্ধির চেষ্টা। কিন্তু তা সফল হয় নি। তাই আর অনাবশ্যক ঝঞ্ঝাট বাড়াতে চাই না। একটা নিবেদন শুধু আছে আপনার কাছে। অনুমতি করেন তো বলি।

বলুন না ?

চিরদিন—হ্যাঁ, তা চিরদিনই বলা যেতে পারে, গুরুগৃহ ত্যাগ

করবার পর থেকেই আমি স্বপাক-ভোজী। অবশ্য ভোজের ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর নয়। দু মুঠো আতপ চাল, তার সঙ্গে দুটো ঝিঙে-কাঁচকলা ফুটিয়ে নেওয়া। আধ ঘণ্টার মামলা। সাধারণ কয়েদী হিসাবে যে কাজ আমাকে দেবেন, তার কোনো রকম ক্ষতি না করে—

ব্রহ্মচারীর বক্তব্য শেষ হবার আগেই পাশে দাঁড়িয়ে আমার আইন-অভিজ্ঞ জেলর তাঁর কর্তব্য পালন করলেন। আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন জেল-কোডের অমোঘ নির্দেশ—No prisoner is allowed to cook for himself। জেলখানায় স্বপাক নিষিদ্ধ। খানিকটা চাপা গলায় এবং দৃশ্যত আমার উদ্দেশ্যে বললেও কথাটা যাতে ব্রহ্মচারীর শ্রুতিপথ এড়িয়ে না যায়, সে বিষয়ে নিশ্চয়ই সজাগ ছিলেন জেলরবাবু। তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। সদানন্দ তাঁর অসমাপ্ত নিবেদন আর শেষ করলেন না। আমি যে মৌন হয়ে রইলাম, তাকে সম্মতি মনে না করে জেলরবাবুর সমর্থন বলেই গ্রহণ করলেন। অপ্রিয় উত্তরটা আমাকে আর মুখ ফুটে দিতে হল না।

হাসপাতালের হাতা পেরিয়ে সবে সাধারণ এলাকায় ঢুকতে যাচ্ছি, আমার এসকর্ট-বাহিনীর বেড়া ডিঙিয়ে হঠাৎ কোত্থেকে একটা লোক বিদ্যুদ্বেগে ছুটে এসে সজোরে পা জড়িয়ে ধরল। অতি কষ্টে সিপাইদের হাত থেকে তাকে বাঁচানো গেল বটে, কিন্তু তারপরেও সে পা ছাড়বার নাম করে না। ধমক দিতেই কেঁদে ফেলল। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে কথা যেটুকু বেরুল, তার থেকে বুঝলাম ব্রহ্মচারী তার গুরুদেব, মানুষ নন, শাপভ্রষ্ট দেবতা, এবং এই মামলাটা একেবারেই মিথ্যা! আসল ব্যক্তব্যটা ছিল শেষের দিকে। উনি

যখন এই জেলখানার অন্ন কিছুতেই গ্রহণ করবেন না, এবং স্বপাকও সম্ভব নয়, তখন এই সামান্য রন্ধন-কার্যটি যদি দয়া করে ওর হাতে ছেড়ে দিই, গুরুর প্রাণরক্ষা হয়, শিষ্যও নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। বললাম, কিন্তু উনি তো নিজের হাতে ছাড়া আর কারও হাতে খাবেন না। শিষ্যটি সবিনয়ে নিবেদন করল, সেইটাই তাঁর সাধারণ নিয়ম বটে, কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো কোনো শিষ্যের হাতে অন্ন গ্রহণ করতে আপত্তি করেন না। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বুঝি সেই বিশেষ শিষ্যদের একজন ?

বিনীত কণ্ঠে উত্তর এল, গুরুদেব আমাকে কৃপা করেন।

কী কেসে এসেছ তুমি ?

মারপিট।

জমি নিয়ে ?

আজ্ঞে না ; জমির আইল নিয়ে।

কী নাম ?

সহদেব ঘোষ।

গোয়ালা ?

হুজুর।

তোমার সঙ্গে আর কজন আছে ?

আজ্ঞে তিনজন—ছেলে, জামাই আর সম্বন্ধী।

কিন্তু উনি তো ব্রাহ্মণ। গোয়ালার হাতে খাবেন কি ?

তা খাবেন। ওঁর জাতবিচার নেই। যাকে স্নেহ করেন, বিশ্বাস করেন, সে মুচি হলেও খান। তা না হলে ব্রাহ্মণের হাতেও জলস্পর্শ করেন না।

আচ্ছা, তোমার কথা আমার মনে রইল। ভেবে দেখব।

সহদেব ঘোষ আমার পা দুটো আবার চেপে ধরল। যে কোনো সমস্যাই হোক, তার মীমাংসা মুলতুবী রাখা ওদের স্বভাবের বাইরে। আলের স্বত্ব যেমন তৎক্ষণাৎ লাঠির জোরে সাব্যস্ত করে নিয়েছিল, থানা-আদালতের মুখ চেয়ে বসে থাকে নি, এখানেও তেমনি জেলের আইন-কানুন বা কর্তৃপক্ষের বিচার-বিবেচনার ভরসায় না থেকে গুরুসেবার অধিকারটা নিছক পা চেপে ধরার জোরেই আদায় করে নেবার ব্যবস্থা করল।

শাসনতন্ত্রের বিধানমাত্রেই অনম্য। শাসক তাকে প্রয়োগ করেন, কিন্তু নিজের খুশিমত ভাঙতে পারেন না, নোয়াতেও পারেন না। কারা-শাসনের ভার যাঁর হাতে, তাঁর বেলায় এ কথা বিশেষ-ভাবে প্রযোজ্য। কেন না, এখানে যাদের নিয়ে তাঁর কারবার, আইন পালনের চেয়ে লঙ্ঘনের দিকেই তাদের ঝোঁক বেশী। হয়তো সেই একই কারণে এখানকার যারা বাসিন্দা, তাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার প্রতিটি মুহূর্ত কড়া আইনের শক্ত শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধা। তাদের অশন, বসন, চলন, কথন, কর্ম, অবসর, সবখানি জুড়ে জেল-কোডের বিস্তৃত অধিকার। খাদ্যবস্তুর পরিমাণ যেমন বাঁধা, তার নাম এবং সংখ্যাও তেমনি নির্দিষ্ট। বস্ত্রের বেলাতেও তাই। আকার প্রকার সংখ্যা, সব বিধিবদ্ধ। তেঁতুলের বদলে আমড়া, কিংবা ধনের বদলে পাঁচফোড়ন যেমন অচল, জাঙিয়ার বদলে পায়জামা অথবা কুর্তার বদলে হাফশার্টও তেমনই না-মঞ্জুর।

একটা পুরনো ঘটনা মনে পড়ল। এই সেদিন পর্যন্ত নারী-কয়েদীরা যে শাড়ি পরত, তার জমিতে থাকত নীল রঙের ডোরা। উনিশ শো বত্রিশ সনে সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স করে যাঁরা জেলে এলেন তার মধ্যে কয়েকজন হিন্দু বিধবা ডোরা-কাটা শাড়ি পরতে অস্বীকার করে বসলেন। কোনো এক জেলের শ্বেতাঙ্গ সুপার খেপে উঠলেন : তোমরা আইন অমান্য করে জেলে এসেছ ; জেলে এসেও আইন অমান্য করবে, তা চলবে না। তাঁকে যখন বোঝানো হল, এদের আসল উদ্দেশ্য আইন লঙ্ঘন নয়, শাস্ত্র-পালন, তিনি জেল-কোডের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, কিন্তু আমার শাস্ত্রে যখন সাদা থানের ব্যবস্থা নেই, তখন ওই নীলস্ট্রাইপওয়ালা শাড়িই পড়তে হবে। মহিলারা বললেন, না। হুকুম হল, জোর করে পরিয়ে দাও। শুরু হল সংঘর্ষ। কারা-বিভাগের শ্বেতচর্ম বড়কর্তাও সুপারের পক্ষ নিলেন—'আইন অমান্য' চলবে না। মন্ত্রিসভার তখনও জন্ম হয় নি ; একজিকিউটিভ কাউন্সিলের যুগ। জেলের চার্জ ছিল জনৈক দেশীয় মেম্বারের হাতে। বিধবাদের শ্বেত বস্ত্র দাবির মধ্যে সিভিল-ডিসওবিডিয়েন্সের গন্ধটা তিনি ঠিক ধরতে পারলেন না। তবু জেল-কোডের সঙ্গে রফা করা সম্ভব হয় নি। গত্যন্তর না দেখে আইনের ওই ধারাটি সঙ্গে জুড়ে দিলেন একটা অ্যামেণ্ডমেণ্ট—বিধবাদের শাড়িতে স্ট্রাইপ থাকবে না।

অত দূর না গিয়েও সংঘর্ষ বাঁচাবার অন্য একটা পথ তখনও ছিল, এখনও আছে। কর্তৃপক্ষ—বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা—অনেক ক্ষেত্রেই তার শরণ নিতেন। সেবার ইচ্ছে করেই নেন নি। সেটা হচ্ছে জেল-কোডের ছিয়ানব্বই ধারা। বয়লারের মাথায় যেমন

একটা করে সেফটি ভাল্‌ভ্‌ থাকে—যার কাজ হল অতিরিক্ত বাষ্পের চাপ বের করে দিয়ে এঞ্জিনকে সচল রাখা, তেমনি ওই ধারাটিই হচ্ছে কারাতন্ত্রের সেফটি ভাল্‌ভ্‌—সময় বিশেষে অতিরিক্ত আইনের চাপকে কিঞ্চিৎ হালকা করে দেবার যন্ত্র। বয়লারের ভাল্‌ভ্‌ বোধ হয় স্বয়ংক্রিয়। কিন্তু ছিয়ানব্বই ধারাকে চালু করতে হলে একটি বিশেষ ব্যক্তির আনুকূল্য প্রয়োজন। তাঁর নাম মেডিক্যাল অফিসার। তিনি যদি মনে করেন জেলের কোনো বিধি বা আদেশ ক্ষেত্রবিশেষে কয়েদীর দেহ কিংবা মনের পক্ষে হানিকর, তালিকা-মাফিক খাদ্য বা বস্ত্র কারও দৈহিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিকূল, তা হলে ওই বিশেষ ক্ষেত্রে সুপার তাঁর উপর-মহলের অনুমতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট আইনটিকে শিথিল করবার ব্যবস্থা করতে পারেন।

বছর কয়েক আগেকার একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি। তখন জেলের আইনে ধূমপান সম্বন্ধে ভীষণ কড়াকড়ি। প্রথম শ্রেণীর কয়েদী (যাঁরা কালে-ভদ্রে আসেন) এবং হাজতী আসামী ছাড়া আর কারও কাছে বিড়ি সিগারেট কিংবা এক টুকরো তামাকপাতাও ছিল মারাত্মক নিষিদ্ধ বস্তু, জেল-কোডে যাকে বলে prohibited article. সেই সময়ে কোনো নামজাদা সেণ্ট্রাল জেলের মেডিক্যাল অফিসার একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীর টিকিটে দৈনিক দু প্যাকেট সিগারেট সুপারিশ করে বসলেন। সুপার মানতে চাইলেন না। জেলের যা বরাদ্দ, তার উপরে কারও বেলায় কিছু বাড়তি খাদ্য—যথা মাছ, মাংস, মাখন, ডিম, দুধ দই কিংবা ফলমূল, এ সবের ব্যবস্থা ওঁরা দিয়ে থাকেন। সেটা নতুন নয় অপ্রত্যাশিতও নয়। কিন্তু এ যে নেশা! জেলের আইনে যাকে বলা হয়েছে নিষিদ্ধ বস্তু! সিগারেট যদি

চলে, মদ গাঁজা চণ্ডু চরসেই বা বাধা কোথায়? তাঁর মতে এটা ছিয়ানব্বই ধারার অপপ্রয়োগ। মেডিক্যাল অফিসার বললেন, নেশার ব্যবস্থা কি সাধ করে করেছি? করেছি প্রাণের দায়ে।

কী রকম?

তবে শুনুন। দিন সাতেক হল এসেছে লোকটা। এসেই এ অসুখ, সে অসুখ। আমার দুজন ডাক্তার হিমশিম খেয়ে গেল। রোগটা যে কী ধরতেই পারল না। আমি গিয়ে দেখি রুগী ঘরময় ছুটে বেড়াচ্ছে। চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল। কী ব্যাপার? জিজ্ঞেস করতেই গরম মেজাজে শুরু করল লম্বা ফিরিস্তি। আমাদের শাস্ত্রে যে-সব বড় বড় রোগের বর্ণনা আছে, তার কোনোটার সঙ্গেই মেলে না। হঠাৎ আমার হাতের দিকে নজর পড়তেই থেমে গেল। মুখে কথা নেই, কিন্তু চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। হাতে কী ছিল বুঝতেই পারছেন। সিগারেটের টিন। একটা চান্স নেওয়া গেল। ওই থেকে একটা বের করে এগিয়ে ধরলাম। পাগলের মতো ছুটে এসে কেড়ে নিল আমার হাত থেকে। ধরাতে দেরি সয় না। তারপর সে কী টান! আর-একটা দিলাম। দু মিনিটে শেষ। চোখের সামনে চেহারা বদলে গেল। রীতিমত সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ। জিজ্ঞেস করলাম, কেমন লাগছে? খুব ভালো, সার্। কোনো অসুখ নেই আমার। জিজ্ঞেস করলাম, ক প্যাকেট চলত রোজ? একগাল হেসে বলল, আজ্ঞে, দেড় টিন। কোনোদিন পুরো দুটোও লেগে যেত।...তা হলেই বুঝুন।

সুপার হেসে উঠলেন। ডাক্তার সাহেব ভয়ে ভয়ে বললেন, খুব বেঁচে গেছি মশাই। ওই বস্তুটি দিতে আর একদিন দেরি হলেই ও

নির্ঘাত খুন করত। হয় নিজেকে, নয়তো আর কাউকে। তার মধ্যে আমারই সম্ভাবনা ছিল প্রথম নম্বর।

ছিয়ানব্বই ধারার আর-একটা বিচিত্র প্রয়োগ মনে পড়ে গেল। সে সম্বন্ধে দু-চার কথা বলেই এ অবান্তর প্রসঙ্গ শেষ করব।

চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট থেকে তিন মাসের জেল নিয়ে এল এক খোঁড়া পকেটমার। ফিরিঙ্গিপাড়ায় মাঝে মাঝে দেখেছি, টুপি উপুড় করে ভিক্ষা চাইছে পথচারীদের কাছে। জেলে যখন এল, পরনে তালি-মারা ট্রাউজার, ছেঁড়া শার্ট আর ময়লা হ্যাট। গায়ের রঙ তামাটে। নামটা বোধ হয় ডেভিস কিংবা ডেভিডসন। কথা বলে ইংরেজীতে, তবে তার সঙ্গে গ্রামারের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী। কিন্তু সকালবেলা লপসির থালা সামনে দিতেই ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মেটকে হুকুম করল, নেটিভকা খানা নেহি খায়গা। ব্রেড-বাটার আউর টী লেয়াও। মেট-লোকটার কিঞ্চিৎ রসজ্ঞান ছিল। সাড়ম্বরে সেলাম ঠুকে বলল, বিলেতে অর্ডার গেছে, সাহেব। আসতে দেরি হবে, ততক্ষণে লপসিটা খেয়ে লাও। এর পরে সাহেবের মেজাজ ঠিক থাকবার কথা নয়। হিন্দী এবং ইংরেজী মিশিয়ে মেটের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে দিল। শ্বেতাঙ্গ জেলরের কাছে নালিশ জানাল মেট। শুনানি মুলতুবী রেখে তিনি আসামীকে নিয়ে গেলেন সুপারের আফিসে। তার ঘণ্টাখানেক পরেই দ্বিতীয় শ্রেণীর দাবি জানিয়ে ডেভিড্সনের দরখাস্ত চলে গেল চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। তার সঙ্গে রইল জেল-সুপারিশ। আবেদনের উত্তর-সাপেক্ষ ওর জায়গা হল ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে এবং শ্বেতাঙ্গ কয়েদীদের কিচেন থেকে তৃতীয় শ্রেণীর বাবুর্চী-কয়েদীরা পৌঁছে দিল

বহুমূল্য বিলাতী খানা। পর দিন সরাসরি না-মঞ্জুর হয়ে ফিরে এল দরখাস্ত। মোটা লাল পেন্সিল নিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে লিখেছেন সিভিলিয়ান সি. পি. এঁম.—He is a beggar, and can't get Division II. ডিভিশন টু—অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠতে হলে তার আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা এবং সেই সঙ্গে জীবনযাত্রার মান সাধারণ স্তরের উপরে থাকা চাই। ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। কিন্তু ঐ লাল পেন্সিলের লেখা দেখে জেলর-সাহেবের লাল চোখ আরও লাল হয়ে উঠল। জেল-কোড বগলে করে ছুটলেন সুপার-বাহাদুরের কামরায়। শুধু সুপার নন, তিনিই আবার মেডিক্যাল অফিসার। লড়াই-ফেরতা দেশী আই. এম. এস.। ইংরেজ-সহকারীর অনুরোধকে আদেশ বলেই দেখতে শিখেছেন। সুতরাং ছিয়ানব্বই ধারা প্রয়োগ করে ডেভিডসনের পদোন্নতি বজায় রাখা হল।

এই পকেটমার সাহেবটির পিতৃ-পরিচয় আমরা পাই নি। যতদূর অনুমান হয় খঞ্জ পুত্রটিকে ঐ নাম ছাড়া আর কিছুই তিনি দিয়ে যেতে পারেন নি। কিন্তু সেটা যে কত বড় সম্পত্তি, হয়তো তাঁর কল্পনাতেও ছিল না। ঐ নামের দৌলতে জেলে এসেও গদি-আঁটা লোহার খাটে শুয়ে, সরকারী কোট-পেণ্টলুন পরে এবং চেয়ার-টেবিলে চপ-কাটলেট চিবিয়ে তিনটে মাস মনের আনন্দে কাটিয়ে দিল ভিখারী ডেভিডসন।

সেদিন ডেপুটি এবং কেরানীবাবুদের সান্ধ্য আফিসে ঐ নাম-মাহাত্ম্যই প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াল। সিতাংশুবাবু আপসোস করলেন : বড্ড ভুল করেছি, দাদা। নামটাকে যদি গোড়া থেকেই চ্যাটার্জির বদলে চ্যাটারটন করে দেওয়া যেত, এতদিনে আর

কিছু না হোক একটা পুলিস সার্জেন্ট অন্তত হতে পারতাম। হৃদয়দা ওয়ারেণ্ট চেক করছিলেন। চোখ না তুলেই বললেন, আমার মনে হয় নামের চেয়ে পোশাক-মাহাত্ম্যটা আরও বড়।

পোশাক-মাহাত্ম্য ?

হ্যাঁ, আর তার প্রমাণ আমিও একবার হাতে হাতে পেয়েছিলাম।

আপনি !—একসঙ্গে পাঁচ জনের কণ্ঠ।

হৃদয়দা ওয়ারেণ্ট বন্ধ করে চশমাটা খুলে হাতে নিয়ে বললেন, তখন কলেজে পড়ি। চুঁচড়ো থেকে রোজ খেলতে আসতাম গড়ের মাঠে। সাড়ে সাতটায় একটা গাড়ি ছিল; তাতে করে ফিরে যেতাম। একদিন একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। প্ল্যাটফর্মে ঢুকে দেখি, গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে। লাফিয়ে উঠে পড়লাম, সামনে যে কামরা পেলাম তাতেই। থার্ড ক্লাশ, কিন্তু একেবারে ফাঁকা। কারণ বুঝতে দেরি হল না। ওটা সাধারণ থার্ড নয়, ইউরোপীয়ান থার্ড। আমার পরনে ছিল ধুতি আর পাঞ্জাবি। গাড়িতে যে-কটি দেশী সাহেব, মেম ছিলেন, তাঁরা কেউ নাক সেঁটকালেন, কেউ চোখ কপালে তুললেন, কেউবা মুখ ফিরিয়ে বসলেন। একটি জামরঙের মেমসাহেব বেশ তেজ দেখাতে শুরু করলেন। শিভালরির সুযোগ পেয়ে এক ছোকরা মতন সাহেব এগিয়ে এসে একেবারে আমার নাকের ওপর ঘুসি বাগিয়ে হিন্দী ভাষায় কৈফিয়ত তলব করে বসল : এ গাড়িতে কেন উঠেছ ? জান না, এটা রিজার্ভড ফর ইউরোপীয়ানস ? বললাম, তাই নাকি ? আচ্ছা এক মিনিট সবুর করো। সঙ্গে যে পোঁটলাটা ছিল তাই নিয়ে ঢুকে পড়লাম বাথ-রুমে। ধুতি-পাঞ্জাবির ওপরেই চড়িয়ে দিলাম কাদা-মাখা হাফপ্যাণ্ট। স্যাণ্ডেল খুলে পরে নিলাম ফুটবলের বুট।

বাড়ি থেকে স্টেশনে আসতে হত সাইকেলে। রোদ লাগে বলে দাদার একটা ফেলে-দেওয়া ছেঁড়া হ্যাট মাথায় দিয়ে আসতাম। সেটাও ছিল পোঁটলার মধ্যে। পরে নিলাম। তারপর গ্যাটগ্যাট করে বেরিয়ে এসে একেবারে সেই মেমসাহেবের সামনে গিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, হ্যালো, হা-ডু-ডু!

আমাদের সম্মিলিত হাসির পর্দাটা বোধ হয় একটু বেশী চড়ে গিয়েছিল। লাল-মুখ জেলর যাবার পথে একবার উঁকি মেরে দেখে গেলেন।

যাক। আসল প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূর এসে পড়েছি। বলতে গিয়েছিলাম, সহদেব ঘোষ যখন তার দুটো হাতের জোরেই গুরুদেবের পাচক-সমস্যার সমাধান না করে ছাড়ল না, তখন বাকি যেটুকু, অর্থাৎ আতপ চাল, ঘি-কাঁচকলা এবং বৈকালিক দুধ আর ফলমূলাদির ব্যবস্থা, ঐ ছিয়ানব্বই ধারার আওতায় বসে আমি আর ডাক্তার সাহেব মিলে করে ফেললাম।

সদানন্দ চল্লিশোর্ধ্ব। ঘন ঘন উপবাস এবং (ডাক্তার সাহেবের মত) ব্রহ্মচর্যরূপ বায়োলজিক্যাল কারণে শরীর একেবারে শুষ্কং কাষ্ঠং। ডাল ভাঙা, গম পেষা, কোদাল চালানো কিংবা তাঁত বোনা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই তাঁকে কয়েদী-রাইটার (convict writer) বানিয়ে দেওয়া হল। জেলের যারা বাসিন্দা অন্যান্য দিকে তাদের বিদ্যা-বুদ্ধি যতই থাক, আক্ষরিক বিদ্যায় বড়ই খাটো। তাদের চিঠিপত্র এবং হরেক রকম দরখাস্ত লিখে দেবার জন্যে ওদের মধ্যে থেকেই মুনসী বেছে নিতে হয়। ব্রহ্মচারীর ওপর পড়ল সেই ভার। কার হালের বলদ কেড়ে নিয়ে গেছে বাদীপক্ষের লোক, মেয়েদের

ইজ্জত বাঁচানো দায় হয়েছে পাড়ার কোন গুণ্ডার হাত থেকে, খাজনার দায়ে কার বাস্তুভিটা নিলামে চড়েছে—এমনি ধারা যত অভিযোগ আসে আমার কাছে, প্রত্যেককে একখানা করে দরখাস্ত মঞ্জুর করি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বরাবর। সে সব দরদ দিয়ে, তথ্য এবং যুক্তি দিয়ে লিখে দেন ব্রহ্মচারী। আর-একটা জিনিস তাঁকে লিখতে হয়, জেল-আপীল। সাজা হবার পর উকিল মোক্তার লাগিয়ে ঊর্ধ্বতন আদালতে আপীল দায়ের করবার সামর্থ্য বা সুবিধা যাদের নেই, তারা বিনা খরচায় আপীল করে জেল থেকে। রায়ের নকল পায় বিনা ফী-তে। সমস্ত নথিপত্র তন্ন তন্ন করে মন দিয়ে পড়েন ব্রহ্মচারী। তারপর আপীলকারীর বক্তব্য শুনে নিয়ে বহু যত্ন এবং পরিশ্রম দিয়ে তৈরি হয় তাঁর মুসাবিদা।

একদিন জেলা-জজ এলেন জেল পরিদর্শনে। কথা-প্রসঙ্গে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার স্টাফে কি কোনো উকিল আছে?

উকিল!

হ্যাঁ; মানে ওকালতি পাস, কিংবা আগে প্র্যাকটিস করত?

কেন বলুন তো?

জেল থেকে যে-সব আপীল যায়, সেগুলো লেখে কে?

আমার স্টাফের কেউ নয়, লেখে একজন সাধারণ কয়েদী।

কয়েদী! বিস্মিত হলেন জজ-সাহেব। বললাম, হ্যাঁ; এবং তার ব্যবসা ছিল কথকতা আর গুরুগিরি, ওকালতি নয়। আপনিই পাঠিয়েছেন তাকে।

কী নাম বলুন তো?

ব্রহ্মচারী সদানন্দ।

ও-ও, সেই লোকটা ? আপীল যা লেখে মশাই পাকা উকিলও পেরে উঠবে না। অথচ, মজা দেখুন, নিজের কেসে সে কোনো ডিফেন্স দেয় নি।

আপনার রায়ে পড়লাম সে কথা।

আরও তাজ্জব ব্যাপার শুনুন, যা রায়ে লিখি নি। ওকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, তুমি দোষী না নির্দোষ, জোড়-হাত করে বলল, প্রশ্নটা কি নিরর্থক নয়, ধর্মাবতার ? জানতে চাইলাম, নিরর্থক কেন ? জবাব দিল, যদি বলি, দোষী, সে কথার উপর নির্ভর করেই তো আপনি আমাকে শাস্তি দিতে পারেন না, সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন হবে। আর যদি বলি আমি নির্দোষ, তা হলেও আপনি আমাকে ছেড়ে দেবেন না। সেখানেও ওই সাক্ষ্য-প্রমাণ। তবে আর এই অনাবশ্যক প্রশ্নের সার্থকতা কোথায় ?

বললাম, এ লোক যে পাকা উকিলের মতো আপীল লিখবে, তাতে আর আশ্চর্য কি ?

কিন্তু ওকালতি জ্ঞানটা ওর নিজের কাজে লাগাতে চাইল না, এইটাই আশ্চর্য।

শুনেছি, অনেক বড় বড় শিষ্য আছে ওর। তারাও তো একজন উকিল লাগাতে পারত।

সে চেষ্টা তারা কম করে নি। কিন্তু আসামী ওকালতনামায় সই না করলে উকিল দাঁড়াবে কেমন করে ? উকিল না দিক, নিজেও তো লড়তে পারত। সে দিক দিয়েও যায় নি। বাদীপক্ষের যা কিছু বক্তব্য সব আগাগোড়া শুনে গেছে। একটি কথাও বলে নি। অনেক মামলা করেছি মশাই। এ রকমটা কখনও দেখি নি।

এই পর্য[illegible] জজ-সাহেব কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আপনাকে বলতে বাধা নেই, লোকটা সত্যিই দোষী কিনা, সে সম্বন্ধে মনে মনে আমি নিঃসন্দেহ হতে পারি নি। কোথাও কোনো রহস্য আছে নিশ্চয়ই, যা আড়ালেই রয়ে গেল। জুরির মনের কথাও বোধ হয় তাই। কিন্তু আমাদের রাস্তা একেবারে বাঁধা। এভিডেন্সের বাইরে এক চুল নড়বার উপায় নেই। সেখানে এমন কোনও খুঁত পাওয়া যায় নি যার ওপর দাঁড়িয়ে জুরির পক্ষে দোষী ছাড়া অন্য ভার্‌ডিক্‌ট্‌ দেওয়া চলে। আর ওঁদের সঙ্গে আমারও একমত না হবার কারণ ছিল না। যাক, এবার উঠি। কোর্টের সময় হল।

জুরি হবার সৌভাগ্য আমার কোনোদিন হয় নি। তবু রায় পড়ে আমারও ওই কথাই মনে হয়েছিল। কোথাও কোনো রহস্য রয়ে গেল, যা ভেদ করা যায় নি।

বাদীপক্ষের কাহিনী সরল ও সংক্ষিপ্ত। একটি কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়ে একদিন সকালের দিকে কেঁদে পড়ল গিয়ে নবদ্বীপ থানার বড় দারোগার কাছে। তিনি জানতে চাইলেন, কী হয়েছে? মেয়েটি বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে, আর কিছুই বলতে চায় না। তার পর এল এক মোক্ষম পুলিসী ধমক, যার উত্তরে বলে উঠল, আমার ধম্মোনাশ করেছে কথক-ঠাকুর।

কোন্‌ কথক-ঠাকুর? জানতে চাইলেন বড়বাবু।

ওই মাঝের পাড়ার বেম্মচারী।

দারোগা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন মেয়েটার মুখের দিকে। তারপর বললেন, কোথায় করল তোমার ধম্মোনাশ?

ওর বাড়িতে।

তুমি সেখানে কী করছিলে ?

বাসন মাজতে গিয়েছিলাম।

কী নাম তোমার ?

ময়না।

ঠিকে-ঝি, না, দিন-রাতের ?

ঝি নই আমি।

ঝি নও, তবে বাসন মাজতে গিয়েছিলে কেন ?

উত্তর দিতে গিয়ে একটু বোধ হয় ইতস্তত করেছিল মেয়েটি। তারপর আর-এক ধমক খেয়ে খুলে বলল ঘটনার বিবরণ।

ব্রহ্মচারীর বরাবরকার ঝি পাঁচীর মা ওদেরই পাড়ার লোক। আগের দিন সন্ধ্যে থেকে জ্বরে পড়েছিল; সকালে আর কাজে বেরোতে পারে নি। অন্য সব বাড়ি, যেখানে সে কাজ করত, তাদের জন্যে বিশেষ ভাবনা ছিল না। তারা একরকম করে চালিয়ে নেবে। কিন্তু কথক-ঠাকুর একা মানুষ। সেই সকালে বেরিয়ে যায়, দেড়টা দুটোর আগে ফিরতে পারে না। তারপর নিজের হাতে দুটো চাল ফুটিয়ে খায়। বাসন দুখানা মাজা না পেলে বড্ড কষ্ট হবে বেচারার। ময়নার মা শুনে বললেন, তার জন্যে কী ? ময়না গিয়ে মেজে দিয়ে আসুক না! একলা মানুষের ভারী তো বাসন। কথক-ঠাকুরের বাড়ি চিনত ময়না। দরজা খোলাই ছিল। রান্নাঘর থেকে বাসন তুলে নিয়ে কুয়োতলায় বসে যতক্ষণ কাজ করছিল কারও কোনো সাড়া পাওয়া যায় নি। তারপর যখন হাত ধুয়ে চলে আসবে, ঠাকুর এসে দাঁড়াল তার সামনে। বলল, আমার শোবার ঘরটা একটু গুছিয়ে

দিয়ে যাও না। ঠাকুরের চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় হল ময়নার। বলল, না, আমি যাই। অনেক দেরি হয়ে গেছে। পা বাড়াতেই ওর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঠাকুর। বাঁ হাতে জাপটে ধরে ডান হাতে মুখ চেপে ধরল। তারপর টানতে টানতে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। ছেড়ে দিতেই চেঁচাতে যাচ্ছিল ময়না। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফুটল না। ঠাকুরের হাতে ঝকঝক করছে মস্ত বড় কাটারি। তারপর দরজায় খিল তুলে দিল।

দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর? ময়না জবাব দিল না। বসে রইল মাটির দিকে মুখ করে।

কোথায় সে ঠাকুর?

কাপড়-গামছা নিয়ে চলে গেল গঙ্গার দিকে। আমিও অমনি ছুটে এলাম থানায়।

গঙ্গার দিকে!—লাফিয়ে উঠলেন দারোগাবাবু। টুপিটা মাথায় চড়িয়ে একজন সিপাই নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সহকারীকে বলে গেলেন, মেয়েটাকে আটকে রেখো।

ঘাটে পৌঁছেই নিরাশ হলেন বড়বাবু। একবুক জলে দাঁড়িয়ে সরবে গঙ্গার স্তব আবৃত্তি করছেন ব্রহ্মচারী। টুপিটা খুলে অসহিষ্ণু হাতে চুলগুলো ধরে একবার টানলেন। একটা কুৎসিত গালাগালি উচ্চারণ করলেন মেয়েটার উদ্দেশে, খবরটা আর একটু আগে পাওয়া যায় নি বলে। তারপর জল থেকে উঠতেই আসামীকে গ্রেপ্তার করলেন।

থানায় আসবার পর ব্রহ্মচারীকে যখন জানানো হল, তাঁর বিরুদ্ধে কী অভিযোগ, তিনি চকিত দৃষ্টিতে একবার তাকালেন মেয়েটির দিকে,

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন নিস্পন্দের মতো, তার পর বললেন, কোথায় যেতে হবে ?

কোর্টে।

চলুন।

·

প্রত্যক্ষদর্শী এ-জাতীয় মামলায় বড় একটা থাকে না ; এ ক্ষেত্রেও ছিল না। কিন্তু পরোক্ষ সাক্ষ্যের অভাব হয় নি। ডাক্তারী রিপোর্ট তো ছিলই ; তা ছাড়া মাতব্বর-গোছের দুজন পাড়ার লোক হলপ করে বলেছিলেন, মেয়েটা যখন কাঁদতে কাঁদতে থানার দিকে যাচ্ছিল, তখনই তার মুখ থেকে তাঁরা সংগ্রহ করেছেন তার লাঞ্ছনার কাহিনী, আর তার সঙ্গে আসামীর নাম এবং পরিচয়। সঙ্গে সঙ্গে আসামীর সন্ধানও তাঁরা করেছিলেন ; কিন্তু তাকে পাওয়া যায় নি। আর একজনের সাক্ষ্যে জানা গেল, স্নান করে ফেরবার পথে তিনি দেখতে পেলেন, কথকঠাকুর হনহন করে ছুটে চলেছে গঙ্গার দিকে। অনেক দিনের জানাশোনা ; কিন্তু বার বার প্রশ্ন করেও তার গন্তব্য স্থান বা ব্যস্ত হবার কারণ সম্বন্ধে কোনো উত্তর পাওয়া যায় নি। উত্তর না দেবার কারণ বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েছিলেন সরকারী উকিল। সে সব এখানে নিষ্প্রয়োজন।

এই কটি তথ্যের উপর নির্ভর করে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় কি না—বিচক্ষণ বিচারক সে প্রশ্ন এড়িয়ে যান নি। ময়নার মতো মেয়ের জীবন-নাট্যে অন্য কোনো নায়কের আবির্ভাব অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তেমন যদি কেউ এসে থাকে, তাকে নেপথ্যে সরিয়ে রেখে এই নিরীহ লোকটাকে বিনা কারণে টেনে আনবার কোনো যুক্তি

খুঁজে পান নি। সাক্ষীদের অবিশ্বাস করবারও কোনো হেতু ছিল না। তা ছাড়া, অভিযোগের উত্তরে অভিযুক্তের নির্বাক ঔদাসীন্য—তার মধ্যে রহস্য যতই থাক—জজ বা জুরিদের মনে অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করে নি।

কিন্তু কী সেই রহস্য, বিচারক যা ভেদ করতে পারেন নি, জুরিরা যার সন্ধান পান নি, তার সম্বন্ধে কৌতূহল আমার যতই থাক, সেটা মেটাবার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা এই চেয়ার। আমার ও আমার বন্দীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। সে দূরত্ব ঘোচাতে পারি এমন কোনো মন্ত্র আমার জানা নেই। সে যখন আমার সামনে আসে, তার চারদিকে জড়িয়ে থাকে কয়েদীর খোলস। ভেতরে যে মানুষ, তাকে আমি পাই না। আমি যখন তার কাছে গিয়ে দাঁড়াই, সেও আমার নাগাল পায় না। যদি বা কেউ হাত বাড়ায়, সে হাতে ঠেকে শাসকের লৌহবর্ম।

আমার সাহিত্যিক বন্ধুদের বলতে শুনেছি, আমি তো প্লটের রাজা! অপরাধী মানুষের অন্তর্লোকে যেমন 'সাইকলজি'র ছড়াছড়ি, তার বহির্জীবনেও তেমনিই গড়াগড়ি যাচ্ছে 'ড্রামাটিক সিচুয়েশন'। ট্যাপ করলেই রসের স্রোত। ধরে নিয়ে শুধু পরিবেশন করা। আমি প্রতিবাদ করি না, মনে মনে শুধু হাসি। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কবিরা নাকি বলেছেন, তাদের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। কিন্তু এই কয়েদী-জাতটার শুধু বুক নয়, মাথা ফাটিয়ে দিলেও যে মুখ ফোটে না—সে কথা যদি জানতেন আমার বন্ধুগণ!

সহদেব ঘোষের গায়ে যে খোলসটা ছিল সেটা মাঝে মাঝে হঠাৎ খুলে পড়ত। ক্ষণেকের তরে বোধ হয় ভুলে যেত, সে জেলখানার লোক। এমনই একটা অসতর্ক মুহূর্তে একদিন চেপে

ধরলাম : সেদিন যে বলেছিলে মিথ্যা মামলায় জেল খাটছেন তোমার গুরু, তার প্রমাণ দাও। হেসে ফেলল ঘোষের পো। সামনের দুটো দাঁত ভাঙা। বছর কয়েক আগে একটা মরা তালগাছ বাঁচাতে গিয়ে ওই দুটিকে বিসর্জন দিতে হয়েছিল। সে জন্য কোনো ক্ষোভ নেই সহদেবের মনে। গাছের মূল্য থাক বা না থাক, সেটা যে ওর পৈতৃক সম্পত্তি। সেই ভাঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল গভীর বিস্ময় : প্রমাণ! প্রমাণ আমি কোথায় পাব হুজুর?

তবে এতগুলো সাক্ষীর কথা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিচ্ছ কিসের জোরে?

জোর আমার কিছুই নেই ধর্মাবতার, মিথ্যাবাদীও কাউকে বলতে চাই না। আমার চোখ যা দেখে, মন যা বলে, তাই আমি জানি। আদালতে দাঁড়িয়ে কোন্ সাক্ষী কী বলল আর না-বলল, তা দিয়ে আমার কিসের দরকার?

যে ব্যাপারে, মানে যে ঘটনায় জড়িয়ে ওঁর সাজা হল, তার সম্বন্ধে তুমি কিছু জান?

সহদেব দাঁতে জিব কেটে বলল, না হুজুর।

আমি হেসে ফেললাম : কিছু না জেনেই, অতবড় একজন জজ বিচার করে যা স্থির করলেন, সেটা বলতে চাও ভুল?

আমার উচ্চাঙ্গের হাসি দেখে সহদেব যে কিছুমাত্র অপ্রতিভ হয়েছে, তার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে থেকে হাত জোড় করে বলল, হুজুর, মুখ্যু মানুষ আমি, তায় জাতে গয়লা। গরিবের কথায় অপরাধ নেবেন না। আমার গুরুকে আমি দেখেছি সেই জোয়ান বয়স থেকে। আর জজ সাহেব তাঁকে

দেখেছেন সবে দুটো দিন। তাও নিজের চোখ দিয়ে নয়, অন্য লোকের চোখ দিয়ে। তবু তাঁরই কথা আমাকে মেনে নিতে হবে, আর আমি যা দেখলাম, যা পেলাম—সব ভুয়ো ?

শিষ্যের মুখে এ-হেন যুক্তি শোনবার পর গুরুর মামলা-ঘটিত রহস্য-মোচনের সব আশায় জলাঞ্জলি দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ রইল না।

মাস কয়েক পরে একদিন অসময়ে যেতে হয়েছিল জেলখানায়। বৈশাখের মাঝামাঝি। বেলা প্রায় দেড়টা। কিছুক্ষণ হল ভোজন-পর্ব সমাধা হয়েছে; এখন চলছে মাধ্যাহ্নিক বিরামের পালা। ওয়ার্কশপগুলো খালি। বড় বড় ব্যারাকে আরাম করছে কয়েদীরা। বেশীর ভাগই হাত-পা ছড়িয়ে গড়িয়ে নিচ্ছে খানিকক্ষণ। কোথাও কোথাও গোল হয়ে বসেছে দশ-পঁচিশের আসর। কারও বা ঝোলার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে লুকিয়ে-রাখা ময়লা তাসের প্যাকেট। একটা গোপন কোণ বেছে নিয়ে শুরু হয়েছে বিন্তি বা টোয়েনটি-নাইনের জুয়ো। কান রয়েছে বাইরে, ইয়ার্ডের পানে, কোন্ দিকে শোনা যায় টহলদার সিপাহীর ভারী বুটের আওয়াজ। রুদ্র আকাশের অগ্নিবর্ষণ মাথায় নিয়ে টহল আর দিচ্ছে কে ? পাগড়িটা খুলে বারান্দার কোণে কিংবা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে গেছে একটুখানি, কিংবা সুযোগ বুঝে বসেও নিচ্ছে কয়েক মিনিট। দুঃসাহস যাদের বেশী, তারা এরই মধ্যে দেয়ালে কিংবা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে পা দুটো। জানে না কখন নেমে এসেছে অবাধ্য চোখের পাতা। কতক্ষণ আর ? হঠাৎ কখন কানের কাছে ফেটে পড়বে শ্লেষতিক্ত ব্যাঘ্রগর্জন : শো গিয়া ! চোখ খুলেই দেখতে পাবে

জমাদারের রক্তচক্ষু। ধড়মড়িয়ে উঠে বেল্ট্ আঁটতে আঁটতে বলবে, নেহি হুজুর, জরাসে আঁখ লাগ গিয়া। জমাদারের দয়া হলে ওইখানেই শেষ। নয়তো ডিউটি-অন্তে যেতে হবে ওয়ার্ডার-গার্ডের ডেপুটিবাবুর কাছে। একদফা শুনানির পর অর্ডার-বুকে লেখা হবে রিপোর্ট : ডোজিং হোয়াইল অন ডিউটি। শাস্তির ডোজটা নির্ভর করবে ছুটো জিনিসের উপর, দণ্ডিতের ম্যানার এবং দণ্ডদাতার মূড।

বিশেষ একটি জায়গা আছে জেলখানায়, রৌদ্রদগ্ধ মধ্যাহ্নও যেখানে বিরামহীন কর্মমুখর। সেটি হচ্ছে এই বিরাট গোষ্ঠীর অন্নসত্রের যজ্ঞশালা। ভোর চারটেয় তার আরম্ভ, বেলা চারটেয় আহুতি। পূর্ণাহুতি নয়, সাময়িক বিরতি মাত্র। রাবণের চিতার মতো অগ্নি সেখানে অনির্বাণ ; কখনও ধিকিধিকি, কখনও দাউদাউ। মোটা লোহার পাত দিয়ে তৈরী একটি অতিকায় বাক্স, যার পোশাকী নাম কুকিং-রেঞ্জ, কয়েদীরা বলে—বাইলট। (কথাটা বোধ হয় বয়লারের কারা-সংস্করণ)। তার ডালার উপর সারি সারি গর্ত, ভেতরে জ্বলছে মোটা মোটা কাঁচা কয়লার চাঁই, ওপরে বসানো একটা করে প্রকাণ্ড পিপে-আকারের লোহার ডেক, যার ব্যাস চব্বিশ ইঞ্চি, দৈর্ঘ্য তিন ফুট। তার অর্ধেক অংশ ডুবে গেছে আগুনের মধ্যে, বাকী অর্ধেক জেগে আছে রেঞ্জের ওপর। এক-একটা ডেকে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ সের করে চাল কিংবা ডাল অথবা মন ছুই করে তরকারি চাপিয়ে দিয়ে ছু দিক থেকে খুন্তিনামধারী পাঁচ হাত লম্বা লোহার ডাণ্ডা চালায় যে সব কয়েদী, তাদের বর্ণ বা পরিধির সঙ্গে ওই ডেক-গুলোর বিশেষ তফাত নেই। তাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন ছুটি ব্যক্তি—কানায় লাগানো রাক্ষুসে কড়ার ভিতর দিয়ে

প্রকাণ্ড বাঁশ চালিয়ে দিয়ে বাইলটের ছ্ পাশে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যারা কাঁধে করে টেনে তোলে ফুটন্ত ভাত-ভর্তি ডেকগুলো, তারপর জলে-ভেজা সিমেন্টের মেঝের উপর দিয়ে বয়ে নিয়ে ঢেলে দেয় মাড়-নিকাশের অতিকায় ছাঁকুনির মুখে। যাকে-তাকে দিয়ে এ কাজ চলে না। এর পেছনে চাই এক দিকে যেমন অমিত গায়ের জোর, আর এক দিকে তেমনই যত্নায়ত্ত কৌশল, এবং সকলের ওপরে অবিচল সতর্কতা। কোনো একটার অভাব হলে যে বিপর্যয় ঘটে, তার নিদর্শন আমি নিজের চোখেই দেখেছি। একটা তো এই সেদিনের ঘটনা। হঠাৎ পা পিছলে ডেক উলটে দিয়ে সেই যে পড়ল লোকটা, আর উঠল না। সহবন্দীরা স্ট্রেচারে করে ঝলসানো দেহটাকে পৌঁছে দিয়ে এল হাসপাতালে। তার পর ফিরে এল ঘাম মুছতে মুছতে। শুধু কি ঘাম? তার সঙ্গে বোধ হয় খানিকটা চোখের জল। সে কথা এখন থাক।

সেদিন অসময়ে টেলিফোন এল জেলরবাবুর কাছ থেকে, ওই মানিক-জোড়ের এক মানিক হঠাৎ কী কারণে বিগড়ে গিয়ে বাঁশ ফেলে শুয়ে পড়েছে গুদামের বারান্দায়। জরুরী অবস্থায় কাজ চালাবার মতো ছ-একজন যারা ছিল, সময় বুঝে কারও ঘাড়ে চেপেছে বাত, কারও বা হাঁটুতে নেমেছে রস। এদিকে চার ডেক ভাত ক্রমাগত খুন্তির ঘায়ে লেই হবার উপক্রম। খুন্তি থামলেই তলা থেকে উঠছে পোড়া গন্ধ। খবর পেয়ে জেলর এসে লোকটাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, জানতে চেয়েছিলেন কী তার অভিযোগ। উত্তরে প্রথমে কিছুই বলতে চায় নি, অনেক পীড়াপীড়ির পর জানিয়েছে, 'বড়া সাব কো বোলেগা'। শাসন এবং তোষণ সমভাবে ব্যর্থ হবার পর, অন্য কোনো

অশক্ত বা অনিচ্ছুক লোকের ঘাড়ে ডেক চাপানো বিপজ্জনক মনে করে, গত্যন্তর না দেখে তিনি আমাকে স্মরণ করেছেন।

রন্ধন-মহলের বারান্দায় আসামীকে আমার সামনে হাজির করতেই নিখুঁত মিলিটারী কায়দায় সেলাম করে বলল, নালিশ হ্যয় হুজুর। সঙ্গে সঙ্গে বললাম, না। ওই ডেক যতক্ষণ না নামছে, ততক্ষণ কোনো নালিশ নেই। একটু যেন থমকে গেল লোকটা। চোখ দেখে বুঝলাম, এ উত্তর সে আশা করে নি। মিনিটখানেক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল আমার দিকে চেয়ে। তার পর সঙ্গীকে ইশারা করে ঘরের কোণ থেকে তুলে নিল বাঁশ। পর পর সব ডেকগুলো যখন নামানো হয়ে গেল, ডাকিয়ে এনে বললাম, বলো, কী তোমার নালিশ! গম্ভীর তাচ্ছিল্যের সুরে উত্তর এল: কুছ নেহি।—বলেই চলে গেল সামনে থেকে। জেলখানার বড় সাহেব আমি। একটা সাধারণ কয়েদীর এই উদ্ধত আচরণে অপরাধ নেবার কথা। নেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু ওই ছ-ফুট-লম্বা শিশুটার মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে হেসে ফেললাম। জেল-খাটা মানুষের সেই চিরন্তন অভিমান। এর পরের স্তরগুলোও আমার মুখস্থ। বিনা কারণে মেজাজ দেখানো, কাজ না করা, এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো হাঙ্গার-স্ট্রাইক। এই গ্রন্থেরই দ্বিতীয় পর্বে এ নিয়ে একটা গবেষণামূলক লেকচার দিয়েছি। পুনরুক্তি দিয়ে নতুন করে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। পদোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললাম, কী নাম তোমার?

গুলাব সিং।

মিথ্যা কথা বলছে হুজুর।—সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাল রন্ধনশালার মেট: ওর আসল নাম নসরুল্লা।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাতেই মাথা নেড়ে বলল, জী, ওভি মেরা নাম হ্যয়।

আমার অনুচরদের মুখে কিঞ্চিৎ চাপা হাসি দেখা দিল। জেলরবাবু বললেন, একই সঙ্গে গুলাব সিং আর নসরুল্লা! কোন্ জাত তুমি?

উত্তরে যা শুনলাম, সে এক বিচিত্র ইতিহাস। গুলাব সিং আসলে শিখ। বাড়ি ছিল পাঞ্জাবের কোন্ গ্রামে। ওর বয়স যখন তিন বছর, বাপ চলে গেল ফৌজে, আর ফিরল না। থাকবার মধ্যে ছিল শুধু মা। বছরখানেকের মধ্যে সেও চোখ বুজল। চার বছরের শিশুর আশ্রয় জুটল এক প্রতিবেশী মুসলমান-পরিবারে। সেইখানেই সে মানুষ, এবং তাদেরই দেওয়া নাম ওই নসরুল্লা। আঠারো বছরে পড়তেই ফৌজে নাম লিখিয়ে বর্মা ফ্রন্টে চলে গেল গুলাব সিং। লড়াই মিটে যাবার পর ঘরে ফিরে দেখল, তার আশ্রয়দাতাও ওপারে পাড়ি দিয়েছেন। সংসারে আর কোনো বন্ধন রইল না। দিন কয়েক এখানে ওখানে টহল দিয়ে রোজগারের খোঁজে চলে এল বাংলা মুলুক। নকরিও জুটে গেল হুগলির এক চটকলে। কিছুদিন পরে পাশের বস্তির একটি মেয়ের সঙ্গে হল মন-জানাজানি, তাকে নিয়েই ঘর বাঁধল নসরুল্লা। কিন্তু সে ঘর তার টিকল না। শয়তানের নজর পড়ল ওর সুন্দরী বিবির উপর; আর সেও গোপনে সাড়া দিয়ে বসল। সন্দেহের জ্বালা বুকে নিয়ে ছটফট করে দিন যায় নসরুল্লার। একদিন অসময়ে কাজ পালিয়ে ঘরে ফিরে যা দেখল, তার পর আর মাথা ঠিক রাখা সম্ভব হল না। পাশেই ছিল একটা নেপালী পরিবার। ছুটে গিয়ে তাদের ঘর থেকে নিয়ে এল ভোজালি।

এই পর্যন্ত এসে হঠাৎ থেমে গেল নসরুল্লা। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, দূরে একটা গাছের দিকে। আমরা রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করে রইলাম। তার পর চমকে উঠলাম।

তুনোকো কাট ।—সহজ শান্ত সুরে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল নসরুল্লা।

চমকে উঠেছিলাম; 'কাট দিয়া' শুনে নয় (আমার রাজ্যে ওটা নতুন নয়, অসাধারণ বস্তুও নয়), যে ভাবে, যে নিরুত্তাপ ঔদাসীন্যে কথাটা আউড়ে গেল, তাই দেখে। ভোজালির মুখে যেন উড়ে গেল তুটো হাঁস কিংবা মুরগির গলা।

হাকিমের কাছে সব কসুরই কবুল করেছিল গুলাব সিং। চরম দণ্ডের জন্যে জন্যে তৈরীও ছিল মনে মনে। কিন্তু কোর্টের কী মরজি হল! দশ বছর জেল দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন জেলখানায়। মাসখানেকের মধ্যেই ছোট জেল থেকে চালান হয়ে এল বড় জেলে। ফৌজী চেহারা দেখে বড় জমাদার লাগিয়ে দিল চৌকায়। তার পর থেকে ওই ডেক বয়ে বয়ে কড়া পড়ে গেছে কাঁধের ওপর। তার জন্যে তার কোনো ক্ষোভ নেই। নালিশ যা ছিল, তাও আর জানাতে চায় না।

বললাম, কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে জেলের যে নালিশ, তার বিচার এখনও হয় নি।

উসকো বাস্তে হাম হাজির হ্যয়, সাব।—অ্যাটেনশন হয়ে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল নসরুল্লা।

কতদিন ফৌজে ছিলে তুমি?

পাঁচ বরষ।

আজ এখানে যে কসুর তুমি করেছ, সে ঘটনা যদি ঘটত তোমার পল্টনের কুক-শেডে, বলতে পার কী হত সেই বাবুর্চীর ?

কোর্ট মার্শাল।

তার পর ?

গোলি।—বলে বুকের উপর আঙুল রাখল গুলাব সিং।

আর কিছু আমি বলতে চাই না। মনে রাখতে চেষ্টা কোরো—যেখানে আছ, এও তোমার সেই ফৌজ।

নসরুল্লা জবাব দিল না। তার সেই মিলিটারী স্যালুট ঠুকে নিঃশব্দে জানিয়ে দিল, সে কথা ভুলবে না।

গুলাব সিং মুখ ফুটে না বললেও তার নালিশের আসল বিষয়টা জানতে চেষ্টা করলাম। গোপন সূত্র থেকে কয়েকদিন পরেই সমস্ত ব্যাপারটা পাওয়া গেল।

ডেক-তোলা পল্টনের সৈন্য-সংখ্যা ছিল তিন। বাকী দুজনের নিয়মিত ডিউটি-বদল হতো। এ-বেলা যার খাটনি, ও-বেলা তার মাপ। কিন্তু নসরুল্লা ছিল কমন ফ্যাক্টর। ও-পাশে যেই থাকুক, এ-পাশের বাঁশ পড়বে তারই কাঁধে। তার কারণ, মেট নামক ব্যক্তিটিকে খুশী করবার যে সব আর্ট, সেগুলো সে আয়ত্ত করতে পারে নি কিংবা ইচ্ছা করেই করে নি। এ সব দিকে খেয়ালও বিশেষ ছিল না। হঠাৎ সে দিন কী মনে করে আপত্তি জানিয়ে বলে বসল : সব কাম বাইনাম্বারসে হোনা চাইয়ে। মেট এবং তার দলবল পল্টনিয়া বলে ওকে প্রায়ই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। বাইনাম্বার শুনে তারই মাত্রা গেল বেড়ে। মেজাজ চড়ে গেল নসরুল্লার। বাঁশ ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল চৌকা থেকে। বাকী দুজন যারা ছিল, তার মধ্যে একটি মেটের ইঙ্গিতে

'পেটমে দরদ হুয়' বলে চলে গেল্ল হাসপাতাল। একজন দিয়ে তো আর ডেক টানা চলে না। দেখা দিল, যাকে বলে, গুরুতর পরিস্থিতি। একটা বাইনাম্বার থেকে এক হাজার লোকের অনশনের উপক্রম।

রন্ধনশালার দিকে যথোচিত নজর দিলেন কর্তৃপক্ষ। মেটকে যেতে হল 'চক্কর'-পাহারায় ; অর্থাৎ তার মেটগিরির এলাকা মানুষের ওপর থেকে সরে গেল দেয়ালের ওপর। নির্জন পাঁচিলের একটা নির্দিষ্ট অংশে উদয়াস্ত টহল দেওয়া—ওইখান দিয়ে কেউ না পালায়। তার দুষ্টচক্রে আর যারা ছিল, তাদের কেউ গেল ডাল ভাঙতে, কারও হাতে উঠল তাঁতের মাকু কিংবা বাগানের কোদাল। ডেকের লোক বাড়িয়ে দিয়ে নিয়মমত 'স্থস্থি' বা বিশ্রামের ব্যবস্থা হল নসরুল্লার। দিন চারেক পরে চৌকা-মহলে রাউণ্ডে গিয়ে দেখি, বাঁশ হাতে দাঁড়িয়ে আছে গুলাব সিং, ঠিক সামনেই টগবগ করে ভাত ফুটছে, কখন তৈরি হবে তারই অপেক্ষায়। জিজ্ঞাসা করলাম, কী খবর, গুলাব সিং? এবার বাইনাম্বারসে কাজ হচ্ছে তো? সলজ্জ হাসির একটা ঝিলিক বিদ্যুৎচমকের মতো খেলে গেল তার মুখের ওপর। পরক্ষণেই গম্ভীর মিলিটারী কণ্ঠে সশ্রদ্ধ জবাব : জী সাব্।

সেদিন গুলাব সিংয়ের মামলা মিটে যাবার পর সদলবলে আপিসের দিকে ফিরছিলাম। 'রাইটার'দের গুমটির কাছে আসতেই কানে গেল একটি পাঠরত উদাত্ত গভীর স্বর—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥

ভগবদ্‌গীতার সেই বহুশ্রুত অমর শ্লোক। কিন্তু এই পরিবেশে এমন করে কোনোদিন শুনি নি। আপনা হতেই যেন যতি পড়ল আমাদের সমবেত গতিচ্ছন্দে। গীতা চণ্ডী কিংবা অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ আবৃত্তিই ছিল ব্রহ্মচারীর অবসরযাপনের সঙ্গী। এ খবর আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু সে আবৃত্তি যে এত মধুর, এমন স্বচ্ছন্দ-সুরময়, তার আবেদন যে এত অনায়াসে অন্তরকে স্পর্শ করে, সেটুকু জানবার সুযোগ হয় নি। মিনিট কয়েক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তার পর হঠাৎ খেয়াল হল, আমার পদমর্যাদা এবং অনুচরবৃন্দ-সহ এই মাঝপথে থেমে গিয়ে গীতাপাঠ-শ্রবণ—এ দুয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটা অসঙ্গতি রয়ে গেছে। অতএব ক্যারাভান সচল হল। 'সেল'-ব্লক পেছনে ফেলে এক নম্বর বাগানের পাশ দিয়ে বড় সড়কে গিয়ে পড়লাম। গুমটি অদৃশ্য হয়ে গেল। স্তব্ধ মধ্যাহ্নের রৌদ্রক্লান্ত গাছপালার ভিতর দিয়ে তখনও ভেসে আসছিল বহুযত্নে অধীত সু-উচ্চারিত দেবভাষার সুললিত ছন্দ—

অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ।

বিশ্বরূপদর্শন যোগের এই শ্লোক কটি আমিও একদিন নিষ্ঠা এবং যত্নের সঙ্গে পাঠ করেছি। কিন্তু সে শুধু পাঠ এবং তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ অর্থবোধ। শব্দ ও অর্থের বন্ধন অতিক্রম করে পঠিত বস্তু যে সমূর্ত ও সপ্রাণ হয়ে উঠতে পারে, সে দৃশ্য আজ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম।

"হে অনন্তবীর্য, তুমি অমিতবিক্রমশালী। তুমি সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছ, অতএব তুমি সর্বস্বরূপ। তুমি ভিন্ন অন্য কিছুরই স্বতন্ত্র সত্তা নাই।"

প্রথম দিকে ব্রহ্মচারীর গীতার আসরে শ্রোতার সংখ্যা ছিল সামান্য। তার প্রিয় শিষ্য সহদেব ঘোষ এবং তারই দু-একটি বন্ধু। ক্রমশ পাঠচক্র বিস্তৃত হল, এবং কয়েক সপ্তাহ যেতেই দেখা গেল, রবিবারের মধ্যাহ্ন-সমাবেশে শ্রোতার দল রাইটারদের গুমটি-ঘর ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সামনেকার আঙিনায়—বেলগাছের ছায়ায় ঠাসাঠাসি ভিড়। তারা এসেছে বিভিন্ন ইয়ার্ড থেকে, এবং এই বে-আইনী ব্যাপারে—জেলকোডে যার নাম 'ব্রেকিং ফাইল' · স্থানীয় আইন-রক্ষকদের বিশেষ কোনো কড়াকড়ি নেই। ভিড়টা শুধু কয়েদীর নয়, কোণের দিকে সাদা পোশাকে বসে গেছে কোনো তিলকধারী দেশোয়ালী সিপাই কিংবা পঞ্চাশোর্ধ্ব জমাদার। ব্যাপারটা সরকারীভাবে আমার গোচরে আনলেন সরকার-নিযুক্ত অবৈতনিক ধর্ম-শিক্ষক, সাপ্তাহিক আড়াই টাকা রাহাখরচের বিনিময়ে যিনি আমার পাপমগ্ন পোষ্যদের কানে কিঞ্চিৎ ধর্মোপদেশ দান করে থাকেন। কয়েদীমহলে ধর্মের প্রতি ঔদাসীন্য যে ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, সে জন্যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি কিঞ্চিৎ উষ্মার সঙ্গে বললেন, জঘন্য অপরাধ করে যে লোকটা জেল খাটতে এল, সে যদি ধর্মশিক্ষক হয়ে দাঁড়ায়—। কথাটা সম্পূর্ণ হল না; বাকিটুকু মুখে একটা শব্দ করে হাতের ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন। পণ্ডিত মশায়ের ক্রোধ সঞ্চারের কারণ ছিল। লোকসংখ্যা তাঁর ক্লাসে বরাবরই কম। সম্প্রতি সেটা দু-তিনজনে এসে ঠেকেছিল। বিষয়টা যে গুরুতর সবিনয়ে স্বীকার করে যথারীতি প্রতিকারের আশ্বাস দিলাম। কিন্তু তিনি বিশেষ আশ্বস্ত হলেন বলে মনে হল না। পরের সপ্তাহে তিনি এলেন না, তার বদলে এল তাঁর ছুটির দরখাস্ত।

ব্রহ্মচারীকে ডেকে পাঠিয়ে বললাম, শুনেছি জেলে আসবার আগে আপনি কথকতা করতেন ?

উত্তর এল সলজ্জ হাসির সঙ্গে, জীবিকার জন্যে লোকে অনেক কিছু করে। আমিও করতাম। তবে ওটা কথকতা নয়, কথা বেচা।

বললাম, এখানে অবশ্যি সে সুবিধে নেই। কিছুদিন বিনামূল্যে চালাতে আপত্তি কী ?

আমার ওপর আপনার অশেষ অনুগ্রহ। কিন্তু এ দায়িত্ব নেওয়া কি আমার পক্ষে উচিত হবে ?

অনুচিত মনে করছেন কেন ?

আমিও ওদের মতো কয়েদী। ওরা আমার কাছে আসবে কি ?

গীতাপাঠ শুনতে তো আসে, দেখছি।

ব্রহ্মচারী যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বললেন, ওই পবিত্র গ্রন্থের ওপর যাদের শ্রদ্ধা আছে তারাই বোধ হয় আসে। পাঠটা এখানে নিতান্তই গৌণ।

বললাম, আমিও ঠিক তাই চাই, ব্রহ্মচারী। ধর্মের ওপর যদি কারও অন্তরের টান থাকে, তারাই এসে বসুক আমাদের এই রবিবারের ধর্মসভায়। যাদের নেই, কিংবা বক্তব্যের চেয়ে বক্তার নাম-ধামের দিকে যাদের নজর বেশী, তাদের টেনে এনে কী লাভ ? আমার বিশ্বাস, জোর করে অনেক কিছু করা যায় ; কিন্তু মানুষকে ধার্মিক বানানো যায় না।

ব্রহ্মচারী এ প্রসঙ্গের কোনো উত্তর দিলেন না। জোড়হাত করে বললেন, আমাকে কী আদেশ করছেন ?

যা করতে বলছি, ঠিক 'আদেশে'র কোঠায় পড়ে না, বরং অনুরোধ

বলতে পারেন। নতুন কিছু নয়। যা করছিলেন, ওইটাই একটু ব্যাপকভাবে করতে হবে। অর্থাৎ রবিবারের আসরটা গুমটি-ঘরের সামনে থেকে তুলে নিয়ে যেতে হবে পাঁচ নম্বরের বারান্দায়। আর বক্তব্য বিষয়? সেটা আর আপনাকে কী বলব? সকলের না হলেও অনেকের যা মাথায় ঢোকে এবং মনটাও একটু ছুঁয়ে যায়, এমনি ধারা কিছু একটা বেছে নিলেই হল।

আমার তরফে চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না।—বলে নমস্কার করে প্রস্থান করলেন ব্রহ্মচারী।

একটা রবিবার পেরিয়ে যাবার দু-তিন দিন পর মাতব্বরগোছের কয়েকজন কয়েদী জেলরবাবুর আপিসে এসে জানালেন, তাঁরা আমার দর্শনপ্রার্থী। প্রার্থনা মঞ্জুর হল। ওঁদের মধ্যে সবচেয়ে যিনি বিজ্ঞ, মুখপাত্ররূপে নিবেদন করলেন: বাইরে থেকে যে পণ্ডিতজী এসে থাকেন, তাঁকে আর কষ্ট দেবার প্রয়োজন নেই; এখন থেকে তাদের সাপ্তাহিক ধর্মোপদেশের ভারটা ব্রহ্মচারীর উপরেই ছেড়ে দেওয়া হোক। তাঁকে সমর্থন করলেন ডেপুটেশনের দ্বিতীয় মেম্বর, আমাদের গোশালার মেট: হ্যাঁ, হুজুর, ওই ব্যবস্থাই পাকা করে দিন। আহা! পাগলা ঠাকুরের গল্প যা শুনলাম, কেউ আর শুকনো চোখে উঠে যেতে পারে নি।

পাগলা ঠাকুরের গল্প!

পরমহংসদেবের কথা বলছে, স্যর।—সস্নেহ হাসির সঙ্গে বললেন মুখপাত্র: তাঁরই লীলা-প্রসঙ্গ আলোচনা করছিলেন ব্রহ্মচারী।

হংস-টংস জানি না বাপু।—একটু বিরক্তির সুরে মন্তব্য করলেন মেট, সোজাসুজি বুঝি আমাদের পাগলা ঠাকুর। বিছানার তলায়

কোথায় ছুটো পয়সা পড়ে আছে ; তার জন্যে সারারাত ঘুম নেই ; এক হাতে টাকা আর এক হাতে মাটি নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছ—টাকা মাটি, মাটি টাকা, তারপর সবসুদ্ধ গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলে তবে নিশ্চিন্দি। এ কি যে-সে পাগল!

অথচ সেই টাকার জন্যে কী না হচ্ছে ছুনিয়ায়!—দার্শনিক গাম্ভীর্যের সঙ্গে যোগ করলেন তৃতীয় ব্যক্তি, আমাদের দরজিশালায় পাহারা। টুপির চারদিকে লাল ফিতার বর্ডার দেখে বুঝলাম তিনি একটি দায়মলি, অর্থাৎ খুনের অপরাধে যাবজ্জীবন দণ্ড নিয়ে এসেছেন জেলখানায়। মেটের তখন রীতিমত ভাব এসে গেছে। সেই আবেগের সুরেই বলে চললেন, অনেকটা আপন মনে: মাঘ মাসের কনকনে শীত। কোঁচার খুঁট ছাড়া দ্বিতীয় বস্তর নেই। রানীমা নিজে হাতে একখানা দামী শাল দিয়ে গেলেন। গায়ে দিয়ে কোথায় বাঁচবে, না, হাঁপ ধরে গেল ঠাকুরের। টান মেরে ফেলে দিয়ে প্রাণটা জুড়োয়।···কী সুন্দর করে বললে আমাদের বেহ্মচারী: মা যাকে ছু হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে আছেন, শাল দিয়ে সে করবে কী? মাঘের শীত তার গায়ে লাগলে তো?

জেলখানার জনমত যাই হোক, একজন কয়েদীকে সরকারীভাবে তাদের ধর্মশিক্ষক নিযুক্ত করা যায় না। সে এক্তিয়ারও আমার নেই। রিলিজিয়স্ টীচারদের নিয়োগকর্তা ডিভিশনাল কমিশনার। সে নিয়োগ ঘোষণা করে সরকারী গেজেট। ব্রহ্মচারীর পক্ষে এ-হেন পদলাভ কোনোমতেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু সপ্তাহান্তে পদহীন শিক্ষকের বেসরকারী আসন প্রায় স্থায়িভাবেই তার দখলে এসে গেল। দেখলাম, পণ্ডিতজী লোকটি সত্যই পণ্ডিত। ধন এবং মান

দুটো যেখানে ধরে রাখা সম্ভব নয়, বুদ্ধিমানের মতো অর্ধং ত্যজতি সূত্র গ্রহণ করে প্রথমটা. অর্থাৎ মাসিক দশ টাকার মায়া ত্যাগ করলেন। ছুটি ফুরিয়ে যাবার পরেও প্রতি রবিবারে তাঁর 'কাজের চাপ' কিংবা 'শারীরিক অসুস্থতা' নিয়মিতভাবে দেখা দিতে লাগল, এবং আমার গোশালার মেট ও তার বন্ধুদের পাগলা ঠাকুরের গল্প শোনায় কোনো বাধা রইল না।

অনেক দিন আগে একটি ভ্রমণকারী ইংরেজ-দম্পতি আমার জেল দেখতে এসেছিলেন। কথায় কথায় স্ত্রী প্রশ্ন করলেন, যারা জেল খাটে, ডু দে আর্ন এনিথিং? বললাম, না। স্বামীটি সুরসিক। সহাস্যে প্রতিবাদ করলেন, হোয়াই, দে আর্ন দেয়ার ফ্রীডম! ঠিকই বলেছিলেন ভদ্রলোক। আমার এই পান্থশালায় অনির্দিষ্ট বাস নিষিদ্ধ। নির্ধারিত কাল শেষ হলে সবাইকেই যেতে হয়। একটি করে দিন যায়, আর সেই মুক্তির দিনটি এক ধাপ করে এগিয়ে আসে। জেলখাটা মানেই মুক্তি-অর্জনের সাধনা। সে দিন কারও দ্রুত আসে, কারও বা বিলম্বে। ডোরাকাটা জাঙিয়া কুর্তা এঁটে কোমরে গামছা জড়িয়ে দিনের পর দিন যাকে দেখে এসেছি মাকু চালাতে কিংবা লোহা পিটতে, হঠাৎ একদিন সকালবেলা আপিসে গিয়ে দেখলাম, সদ্য-কাচা ধুতি আর পাটভাঙা শার্ট পরে সে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার টেবিলের ও পাশটিতে। খালাস-দপ্তরের ডেপুটিবাবু ওয়ারেণ্ট থেকে উচ্চকণ্ঠে মিলিয়ে নিলেন তার নাম-ধাম-বিবরণ। তার পর তার প্রসারিত হাতের ওপর গুনে দিলেন খোরাকির পয়সা আর সেই সঙ্গে একখানা রেলের পাস। সেলাম করো।—শেষ হুঙ্কার

দিলেন বড় জমাদার। শেষবারের মতো পালিত হল তাঁর অমোঘ আদেশ। কেউ আবার সেলামের ঠিক ভঙ্গিটি এড়িয়ে গিয়ে মৃদু হেসে হাত দুখানা তুলল একবার কপালের কাছাকাছি। বোধ হয় জানাতে চাইল, এতদিন যে সম্পর্ক ছিল আমাদের মধ্যে—শাসক আর শাসিতের সম্পর্ক—আজ তার অবসান; তাই রেখে যাচ্ছে একটি সসঙ্কোচ নমস্কার বিদায়—বেলার শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন।

এমনই ভাবেই একদিন দেখা হয়ে গেল সহদেব ঘোষের সঙ্গে। অ্যাটেনশন নয়, নত হয়ে জোড় হাত করে দাঁড়িয়ে ছিল আমার টেবিলের ও-পাশে খালাসী-কয়েদীর নির্দিষ্ট জায়গায়। বড় জমাদারের হুকুম শুনে না ঠুকল সেলাম, না জানাল নমস্কার; কেঁদে উঠল হাউ হাউ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল পা দুটো, যেমন করে ধরেছিল আর-একদিন, আদায় করেছিল গুরুসেবার অধিকার। সেদিনের অভিজ্ঞতার পর, আজ আর বাধা দেবার চেষ্টা করলাম না। খানিকক্ষণ পরে ও নিজেই উঠে বসল এবং চোখ মুছে বলল, আমার গুরুকে দেখবেন। আমার তো আর থাকবার উপায় নেই। ছেলেটা রইল; ওই দুটো ভাত ফুটিয়ে দেবে।

বললাম, বেশ; তাই হবে।

আর-একটা ভিক্ষা চাইছি যাবার সময়। জানি, না বললেও আপনি করবেন। তবু মন মানে না। আপনার কলমে যতখানি আছে, মাপ দিয়ে গুরুকে আমার তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন।

কিন্তু আমার কলমের দাক্ষিণ্য পুরোপুরি বর্ষণ করবার আগেই হঠাৎ একদিন হুকুম এল: স্ট্রাইক দি টেণ্ট। শুরু হল প্যাকিং। ওখানকার মেয়াদ আমার শেষ হল। কিন্তু ব্রহ্মচারীর মেয়াদ তখনও

বছর তিনেক বাকী। চার্জ দেবার আগের দিন সমস্ত কয়েদীর স্পেশাল ফাইলের হুকুম দিলেন জেলরবাবু। শেষবারের মতো শুনতে হবে বাকী রইল কার কী নালিশ, অপূর্ণ রইল কার কোন্ আবেদন। শুনলাম, এবং যা শুনলাম, তার কতক মিটিয়ে আর বেশীর ভাগ মেটাবার বৃথা আশ্বাস দিয়ে আপিসে ফিরে এসেই ব্রহ্মচারীকে ডেকে পাঠালাম। সঙ্গের সিপাইটিকে ইঙ্গিতে সরিয়ে দিয়ে বললাম, কই, তুমি তো কিছুই চাইলে না ব্রহ্মচারী? কুণ্ঠানত চোখ দুটো হঠাৎ একবার চমকে উঠে তাকাল আমার দিকে। তার কারণ বোধ হয় যাবার দিনে আমার এই প্রথম 'তুমি' সম্বোধন। আমার মুখে 'আপনি' শুনতেই সে অভ্যস্ত। এই কথাটির মধ্যে যে দূরত্ব আছে, তার জন্যে সদানন্দের মনে মনে একটা গোপন দুঃখ ছিল, যা কোনো-দিন মুখ ফুটে না বললেও আমি টের পেয়েছি। তবু আমার রাজ্যে সে একক, সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র, এই সুস্পষ্ট সত্যকে স্বীকৃতি দেবার জন্যেই বোধ হয় আমার মুখ থেকে আপনা হতেই 'আপনি' বেরিয়ে যেত। চলে যাবার ক্ষণে তেমনি আপনা হতেই আজ 'তুমি' বেরিয়ে গেল।

ব্রহ্মচারীর শীর্ণ মুখের উপর ফুটে উঠল একটি জোরকরে-টেনে-আনা ম্লান হাসি। আমার প্রশ্নের সরাসরি জবাব পেলাম না। তার বদলে এল একটি সনিশ্বাস স্বগতোক্তি; না চাইতেই যা পেয়েছি, সে শুধু আমার অন্তর্যামীই জানেন।

হয়তো তাই। দার্শনিক মানুষ; কী দেখেছে, কী পেয়েছে, সে-ই জানে আর জানেন তার অন্তর্যামী। আমার অ-দার্শনিক সাদা চোখে তা পড়বার কথা নয়। আমি জানি, ওর জন্যে যা করব

ভেবেছিলাম, তা করতে পারি নি। ভেবেছিলাম, আরও কিছুদিন গেলে বাকী মেয়াদটা মকুব করবার সুপারিশ জানিয়ে একটা প্রস্তাব পাঠাব সরকারের কাছে। কোন্ ভরসায় এবং কোন্ যুক্তিবলে এ ইচ্ছা আমি মনে মনে পোষণ করেছিলাম, সেটা একটু বিশদভাবে বলা প্রয়োজন।

বিচারককে যে রাস্তায় চলতে হয়, তার পরিসর অতি সংকীর্ণ, চারদিকে প্রসিডিওর-কোড এবং এভিডেন্স-অ্যাক্টের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেখানে হৃদয়বৃত্তির প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু সরকার নামক যে সর্বশক্তিমান যন্ত্র মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে, তার পথ অনেক প্রশস্ত। সেটাও আইনের প্লাস্টার দিয়ে গাঁথা কংক্রীট রোড, কিন্তু তার মাঝে মাঝে আছে নরম মাটির ফাঁক কিংবা কোমল ঘাসের আস্তরণ। আদালতের প্রধান লক্ষ্য অপরাধী নয়, তার অপরাধ। যে ব্যক্তিটি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, সে লঘু না গুরু, সে প্রশ্ন অবান্তর; বিচার্য বিষয় তার কৃতকর্মের লঘুত্ব বা গুরুত্ব। বিচারককে অন্ধ বলা হয়। আসলে তিনি অন্ধ নন, একচক্ষু। রেল-কোম্পানির একমুখী লণ্ঠনের মতো তাঁর দৃষ্টিও শুধু একটি দিকে প্রসারিত—উপস্থাপিত অভিযোগের সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পর্ক কী এবং কতখানি, সাক্ষ্যপ্রমাণের আলোয় তারই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। সে সম্পর্ক সাব্যস্ত হল কি না এবং কতটা সাব্যস্ত হল, এইটুকু দেখেই তিনি নিশ্চিন্ত। পিছনে দাঁড়িয়ে যে বিচিত্র মন, যে দুর্জ্ঞেয় প্রেরণা, যে আবাস্থিক জটিলতা ওই লোকটিকে টেনে নিয়ে গেছে ওই বিশেষ অপরাধের আওতার মধ্যে, বিচারশালার একদর্শী লণ্ঠনের সন্ধানী আলো সেখানে পৌঁছয় না।

কিন্তু সরকারের হাতে যে লণ্ঠন, সেটা চতুর্মুখ অপরাধের যে চিত্র আদালতে উদ্ঘাটিত হল, তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার আলো ছড়িয়ে আছে ওই অপরাধী মানুষটার পেছনে সামনে, ডাইনে বাঁয়ে। সে কোথায় ছিল, কোথায় এসেছে, কেন এল এবং ভবিষ্যতে কোথায় যাবে, সব দিকে দৃষ্টি রেখে রাষ্ট্রকে চলতে হয়। বিচারক দণ্ড দিয়েই ক্ষান্ত; পরের অংশ অর্থাৎ দণ্ডিতের বোঝা পড়ল গিয়ে শাসকের ঘাড়ে। সে ভার বইতে গিয়ে তাকে তাকিয়ে দেখতে হয় কাঠগড়া এবং কারাপ্রাচীরের বাইরে, খুঁজতে হয় অপরাধ নামক ওই বিশেষ কার্যটির অন্তরালে লুকিয়ে আছে কোন্ রহস্যময় গোপন শক্তি, কোন্ সামাজিক পারিবারিক কিংবা পারিপার্শ্বিক ব্যাধির তাড়না। সেইখানেই শেষ নয়। সেই সঙ্গে দেখতে হয় তাদেরও, অপরাধী লোকটার চারদিকে যারা ছড়িয়ে আছে কিংবা একদিন জড়িয়ে ছিল।

তা ছাড়া, যাকে আমরা ক্রিমিন্যাল বলি, তার সবখানিই তো ক্রিমিন্যাল নয়। জেলের মধ্যে তার যে পরিচয়, তার বাইরেও তার একটা সত্তা আছে, যেখানে সে বৃহত্তর সমাজের জীব, মানুষের দরবারে একাধারে দাতা এবং প্রার্থী। সমাজকে সে কিছু দিতে চায়, কিছু আবার পেতেও চায় তার হাত থেকে। সেই আদানপ্রদানের জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে দীর্ঘ অবরোধে যখন তার জীবন কাটে, সেটা শুধু তার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ক্ষতি নয়, সামাজিক অপচয়।

এই সব দিকে তাকিয়ে এবং এই কথা মনে রেখে আদালত যে দণ্ডবিধান করেন, রাষ্ট্র তাকে অনড় ও অব্যয় বলে মেনে নিতে পারে না। মানবগোষ্ঠীর সর্বব্যাপী স্বার্থের দিকে চেয়ে আইনপ্রদত্ত অবরোধ বা কারাবন্ধনের কবল থেকে কোনো কোনো বন্দীকে ফিরিয়ে আনতে

হয় তার ফেলে-যাওয়া বৃহত্তর জীবনের মধ্যে; প্রয়োগ করতে হয় দণ্ডিতের দণ্ড হ্রাস করবার বিশেষ ক্ষমতা। আইনের দাবি অলঙ্ঘ্য হলেও চূড়ান্ত নয়। তার কারণ, আইনের চেয়েও মানুষ বড়।

এই সূত্রে সুধীন ব্যানার্জি নামে একটি ছোকরা-কয়েদীর কথা এসে পড়ল। সেটুকু শেষ করেই আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসব।

ঘন ঘন খানাতল্লাশ জেল-ডিসিপ্লিনের একটি প্রধান অঙ্গ। এমন অনেক জিনিস আছে, যেগুলো জেলের বাইরে নিতান্ত নির্দোষ, কিন্তু পাঁচিল পার হয়ে ভিতরে এলেই মারাত্মক। আপনার পকেটে একখানা ছুরি বা হাতে এক টুকরা দড়ি দেখলে আমি বিচলিত হব না। কিন্তু ওই ছুটি তুচ্ছ বস্তু যখন বেরিয়ে আসে আমার কয়েদীর কম্বলের ভাঁজ কিংবা স্যাণ্ডালের সুকতলার তলা থেকে, তখন আর আমি নির্বিকার থাকতে পারি না। নস্যের মতো নিরীহ দ্রব্য সংসারে আর কী আছে? মানুষের সমাজে সবচেয়ে যারা নির্বিরোধ, যাদের আমরা বলি ব্রাহ্মণপণ্ডিত, তাদেরই ওটা নিত্যসহচর। পাত্রাধার তৈল কিংবা তৈলাধার পাত্র এই-জাতীয় সূক্ষ্ম নৈয়ায়িক তর্কের সহজ মীমাংসার জন্যেই নস্যের প্রয়োজন, এই কথাই তো জানা ছিল। জেলখানায় এসে দেখলাম, নস্য নামক মহাবস্তুর আর-এক মূর্তি, বড় বড় পণ্ডিতের কল্পনায় যা কোনোদিন আসে নি। এক দল ভারী-মেয়াদী ছুর্দান্ত কয়েদী চালান হয়ে যাচ্ছিল এক জেল থেকে আর-এক জেলে। লোহার জালে ঘেরা সুরক্ষিত প্রিজন-ভ্যান। চল্লিশ মাইল বেগে ছুটে চলেছে ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে। ছু পাশে ছুটি রাইফেলধারী সিপাই। হঠাৎ এক কয়েদীর দেহের কোন গুপ্ত স্থান থেকে বেরিয়ে এল একটি সুদৃশ্য নস্যের ডিবা এবং তারই সুগন্ধিচূর্ণে আচ্ছন্ন হয়ে গেল ছু জোড়া

সতর্ক চক্ষু। চোখের পলকে একখানা ক্ষিপ্র হাত তাদেরই একজনের পকেট থেকে তুলে নিল চাবির গোছা। দরজা খুলতে লাগল কয়েক সেকেণ্ড। সিপাইদের হল্লা শুনে ড্রাইভার গাড়ির গতি কমিয়ে দিয়েছিল। খানিকটা গুঁড়ো চোখে পড়তেই পায়ের চাপ পড়ল ব্রেকের উপর। মিনিট কয়েক পরে তাকাবার মতো অবস্থা যখন ফিরে পেলেন সিপাইজীরা, দেখলেন, প্রিজন-ভ্যান শূন্য এবং ফাঁকা মাঠের এখানে ওখানে দু-চারজন নিরীহ গোপালক ছাড়া জনমানবের চিহ্ন নেই।

যথাসময়ে সার্চ বা তল্লাশি নামক অস্ত্রটি যদি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা হত, ওই ডিবাটি এত বড় একটা বিপর্যয় ঘটাতে পারত না। সুতরাং জেলকর্মীদের কর্মসূচির একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে ওই সার্চ। যখন-তখন ছোট-বড় দল নিয়ে এখানে-ওখানে হানা দিয়ে তারা খুঁজে বেড়ায়, জেল-কোডের ভাষায় যার নাম prohibited article বা নিষিদ্ধ বস্তু। ওই বিশাল গ্রন্থের একটা গোটা পাতা জুড়ে রয়েছে তার দীর্ঘ তালিকা। অস্ত্রশস্ত্র, দড়ি, বাঁশ, টাকাকড়ি, হরেক রকম নেশার উপকরণ—এ সব তো বটেই, তা ছাড়াও ওই দলে পড়ে বই খাতা চিঠিপত্র কিংবা অন্য কোনো জিনিস, তার পেছনে যদি না থাকে কর্তৃপক্ষের অনুমতি বা অনুমোদন।

এমনি এক সার্চ-পার্টি একদিন সুধীন ব্যানার্জির কম্বলের তলা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এল খান দুই চিঠি, যার উপরে না ছিল জেল-অফিসের রবারস্ট্যাম্প, না পাওয়া গেল সুপারের স্বাক্ষর। মাল-সমেত আসামীকে আমার দরবারে হাজির করা হল। তার সঙ্গে লিখিত অভিযোগ—ফাউণ্ড ইন পজেশন অফ্ আন্‌অথরাইজ্‌ড্

লেটার্‌স্‌। দুখানা চিঠিই ওর চিঠির উত্তরে লেখা ; এসেছে ওর মায়ের কাছ থেকে, এবং কারা-প্রবাসী পুত্রের জন্য মায়ের যে স্বাভাবিক ব্যাকুলতা—তার বেশী অর্থাৎ জেলের তরফ থেকে আপত্তি করবার মতো কিছুই নেই তার কোনোখানে। কাগজ দুখানা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কী করে এল এগুলো ? কাকে দিয়ে আনলে ?

অনুনয়ের সুরে উত্তর এল : অন্যায় করেছি সার্‌। এবারটির মতো মাপ করুন।

আমার কথার জবাব দাও।

সুধীন ক্ষণেকের তরে আমার মুখের দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে বলল, এনেছে একজন সিপাই ; কিন্তু তার কোনো দোষ নেই। আমিই তাকে আনতে বলেছিলাম।

তোমার চিঠিও বুঝি সে-ই নিয়ে গিয়েছিল ?

মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

বললাম, জেল থেকে চিঠি পাঠাবার নিয়ম কী, জান ?

জানি, আপিসে দিতে হয়।

তা না করে, গোপনে লোক দিয়ে পাঠালে কেন ? কী ছিল চিঠিতে ?

সুধীন নিরুত্তর। একটু জোর দিয়ে বললাম, বলো।

উত্তর এল মৃদু ভীরু কণ্ঠে, তার সঙ্গে জড়ানো অনেকখানি সঙ্কোচ ও লজ্জা : মা বড্ড কান্নাকাটি করছিল আসবার সময়। আর কোনোদিন করব না, সার্‌।

চোখের কোণ বেয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছিল। তাড়াতাড়ি মুছে ফেলল।

আমার প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর পেলাম না। কিন্তু এটুকু বোঝা গেল, সে চিঠিতে যা ছিল সেটা বিশেষ কিছু না হলেও এমন কিছু, যা শুধু মায়ের কাছেই বলা যায়, সরকারী সেন্সরের স্থূল দৃষ্টির সামনে তুলে ধরা যায় না ; অন্তত একটি পনেরো বছরের ছেলের পক্ষে তা অত্যন্ত কঠিন।

টিকিট উলটে দেখলাম, ৩০২ ধারার কেস। খুনের অপরাধে যাবজ্জীবন, অর্থাৎ কুড়ি বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন সেসন-জজ। আপীলও না-মঞ্জুর হয়ে গেছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, 'খুন করেছিলে ?' অভ্যাসের বশে এ-জাতীয় প্রশ্ন অনেককেই করে থাকি। উত্তরে 'না' শুনে শুনে কানও অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রেও তার পুনরুক্তির জন্য প্রস্তুত ছিলাম। তাই বিস্মিত হলাম যখন কানে এল একটি মৃদু কিন্তু দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট উত্তর : 'হ্যাঁ'।

মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে গেল, কাকে খুন করেছ ?

দাদাকে।

দাদাকে ! নিজের দাদা ?

হ্যাঁ, সৎভাই।

কেন ?

সুধীন উত্তর দিল না। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল, ঠিক পাশটিতে দাঁড়িয়ে ছিল যে গার্ড, তার মুখের দিকে। হাতের ইঙ্গিতে লোকটিকে সরিয়ে দিয়ে ওকে কাছে ডেকে নিলাম। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দাঁড়াল আমার চেয়ারের হাতলের পাশে। কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইল মুখের দিকে। তারপর হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল :

আমার মায়ের অপমান সইতে পারি নি, সার্। শান্ত হবার সময় দিলাম। দ্বিতীয় প্রশ্নের আর প্রয়োজন হল না। দ্বিধাহীন সহজ সুরে সুধীন বলে গেল তার খুনের ইতিহাস। তা থেকে যে তথ্যটুকু সংগ্রহ করা গেল, তাকে মোটামুটি রূপ দেবার চেষ্টা করছি।

সুধীনের মা ওর বাবার দ্বিতীয় পক্ষ। প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর বৃদ্ধবয়সে আবার যখন টোপর পরলেন ভদ্রলোক, তাঁর বড় ছেলের বয়স তখন বাইশ পেরিয়ে গেছে। অর্থাৎ নববধূর চেয়ে তিন-চার বছরের বড়। তা ছাড়া আরও চারটি ছেলে-মেয়ে। সবগুলোই নতুন মাকে বাইরে মেনে নিলেও মনে মনে সয়ে নিল না। বিশেষ করে তাঁর লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো রূপ শুধু ওদের নয়, আত্মীয়স্বজন সকলেরই চক্ষুশূল হয়ে উঠল। এক বছর পরেই সুধীন এল তাঁর কোলে, এবং তার বছর দুই পরে কর্তা হঠাৎ ওপারে যাত্রা করলেন। উইল একটা রেখে গিয়েছিলেন, এবং তার মধ্যে মা ও ছেলের স্বচ্ছলভাবে চলার মতো ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু প্রথম পক্ষের তরফ থেকে সেটাকে ভুয়ো প্রমাণ করবার জন্যে আদালতে মামলা দায়ের হল। তারপর যা হয়ে থাকে। নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালত এবং সেখান থেকে উচ্চতর আদালত ঘুরে এসে বছর বারো পরে লড়াই যখন থামল, তার আগেই মামলার আসল লক্ষ্য, অর্থাৎ উইল-বর্ণিত বিষয়-আশয় তৃতীয় পক্ষের হাতে চলে গেছে এবং তার সঙ্গে গেছে বনেদী পরিবারের লোহার সিন্দুকের সঞ্চয়—নগদ টাকাকড়ি এবং সোনা-দানা।

সুধীনের মামার বাড়ির অবস্থা ভালো ছিল না। ধন জন দুয়েরই অভাব। বিপদের দিনে অসহায় বিধবাকে সাহায্য করবার জন্যে

এগিয়ে এসেছিলেন একটি উকিল—ওর মায়ের দূর-সম্পর্কের কোন জ্ঞাতি-ভাই। যে-হেতু সে ব্যক্তিটি বয়সে যুবক, ওঁদের দুজনকে যুক্ত করে নিত্য নতুন মুখরোচক কাহিনী পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সে সবগুলোর রচনা এবং প্রচারের প্রধান অংশে ছিল সুধীনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। সাহায্যকারী তার ইয়ার-বন্ধুর দল। মামলায় হেরে যাবার পর ওই অস্ত্রটাকেই তারা সমস্ত শক্তি এবং উৎসাহ দিয়ে নির্লজ্জভাবে কাজে লাগাতে লাগল। একদিন সন্ধ্যার পর কী একটা দরকারী কাজে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তার উকিল-মামা। কথা হচ্ছিল ভিতরের মহলে একটা বারান্দায়। এমন সময় হঠাৎ সেখানে হানা দিল বিমাতা-পুত্র এবং তার দলবল। সুধীন ছিল তার পড়বার ঘরে। হৈ-হল্লা শুনে ছুটে এসে দেখল, দাদার দুটি বন্ধু তার মামাকে দু দিক থেকে ধরে আছে, আর সবাই মিলে কুৎসিত চিৎকার করে যা বলতে চাইছে, তার অর্থ—এই মাত্র একটা অতি জঘন্য কাণ্ড তারা হাতে হাতে ধরে ফেলেছে। ও-তরফের সঙ্গে যুক্ত দু-একজন প্রতিবেশীও এসে পড়েছিলেন। তাঁদের একজনের মন্তব্য শোনা গেল : দুটোকেই থানায় নিয়ে যাও। দঙ্গলের ভেতর থেকে মহাকলরবে উঠল তার সমর্থন। সেই কদর্য দৃশ্যের একান্তে দু হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে নিঃশব্দে বসে আছেন তার মা। মনে হচ্ছিল যেন একখানা শ্বেতপাথরের গড়া মূর্তি। প্রবীণ প্রতিবেশীর প্রস্তাব শুনে নিশ্চল দেহটা যেন একবার নড়ে উঠল। সুধীনের দাদা তখন এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে মায়ের ঠিক সামনে। হাত-পা নেড়ে চিৎকার করে বলছে, কী হল? গায়ে হাত দিতে হবে, না, নিজেই উঠবে? মায়ের কোনো সাড়া নেই। মাথাটা আরও নুয়ে পড়েছে মাটির

দিকে। জ্ঞান আছে কি না বোঝবার উপায় নেই। কে একজন বলে উঠল, হাত ধরে টেনে তোল। যত সব নষ্টামি। সেই মতলবেই বোধহয় আরও খানিকটা এগিয়ে আসছিল ওর দাদা। কিন্তু হাত বাড়াতে না-বাড়াতেই গর্জে উঠল রিভলভার। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, সব অন্ধকারে একাকার হয়ে গেছে। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে যাবার পর চেতনারাজ্যে আবার যখন আলো জ্বলে উঠল, চোখ খুলে দেখল সুধীন, বারান্দার উপর পড়ে আছে একটা নিশ্চল দেহ। কপালের একটা ধার থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। সেইদিকে ভীতিবিহ্বল তীব্র দৃষ্টি মেলে তেমনই মূর্তির মতো চেয়ে আছেন তার মা। কানে গেল একটা ফিসফিস আওয়াজ : 'এ কী করলি খোকা ?' আঙিনায় জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই।

সকলের অলক্ষ্যে কখন যে সে নিঃশব্দে সরে গিয়েছিল, মায়ের ঘরের আলমারির ভিতর থেকে তুলে এনেছিল গুলিভরা রিভলভার, কিছুই আর মনে তার পড়ে না।

আপনি বলুন তো সার, অন্যায় করেছি আমি ?—উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল সুধীন। খানিকটা বোধ হয় তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ যেন ধাক্কা খেয়ে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। চেয়ে দেখলাম, সরল নিষ্পাপ দুটি কিশোর-চোখ সাগ্রহ প্রশ্ন তুলে তাকিয়ে আছে আমার মুখের পানে। নরহন্তা জানতে চাইছে, সে অন্যায় করেছে কি না! তবু সহজ উত্তরটা আমার জিভে এসে আটকে গেল।

হ্যাঁ, একটা অন্যায় আমি করেছি।—এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল সুধীন, কিন্তু সে শুধু মার কথায়। আমার মাকে তো আপনি

দেখেন নি, সার্! দেখলে বুঝতেন, তাঁর চোখের দিকে একবার তাকালে কিছুতেই 'না' বলা যায় না।

জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, কী সে অন্যায়? তার আগেই জবাব পাওয়া গেল—কোর্টে দাঁড়িয়ে কতকগুলো মিথ্যা বলে এলাম। ইচ্ছে করে, মারব বলেই মেরেছি—এ কথা কিছুতেই বলতে দিলে না মা। বলতে হল, উকিলদের বানানো কথা—রিভলভার নিয়ে এসেছিলাম, লোকগুলোকে ভয় দেখাতে। দাদা ছুটে এসে হাত চেপে ধরল, কেড়ে নিতে চাইল রিভলভার। আমি ছাড়তে চাই নি। ধস্তাধস্তির সময় কখন গুলি ছুটে গেছে, আমি জানি না। যখন বলি, হাকিম আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। একবার ইচ্ছে হল বলে দিই—এ সব মিথ্যা কথা; দাদাকে খুন করেছি আমি। বলতেও যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, মার সেই চোখ দুটো, আর বলতে পারলুম না। কিন্তু জজসাহেব বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন, সব বানিয়ে বলছি। তাই এত চেষ্টা করেও মা আমাকে ছাড়িয়ে নিতে পারল না।

মিনিট কয়েক বিরতির পর আবার শুনতে পেলাম, সুধীন বলছে—তার জন্যে আমার মনে কোনো কষ্ট নেই সার্। খুন করেছি, তার শাস্তি তো পেতেই হবে। কিন্তু যখন মনে পড়ে, কুড়ি বছর পরে ফিরে গিয়ে মাকে আর দেখতে পাব না, মাথাটা একদম খারাপ হয়ে যায়।

শুষ্ক সান্ত্বনার সুরে বললাম, কেন, দেখতে পাবে না কেন?

মা কিছুতেই বাঁচবে না অতদিন।

চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। এবার আর

মুছে ফেলবার চেষ্টা করল না। কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর বললাম, মাকে লিখে দাও, মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখে যাবেন।

তা হয় না সার্। বড্ড সেকেলে বনেদী ঘর আমাদের। জেলখানায় মা আসতে পারে না। না আসাই ভালো। আমার এই পোশাক মা সইতে পারবে না।

খুনের অপরাধে এই ষোলো বছরের ছেলেটাকে যাবজ্জীবন দণ্ড দিয়ে বিচক্ষণ বিচারক তাঁর আইন-প্রদত্ত কর্তব্য পালন করেছিলেন তার উপরে ছিল মহামান্য হাইকোর্টের সমর্থন। বিচারে নিশ্চয়ই কোনো খুঁত ছিল না। তবু সেদিন মনে হয়েছিল, এইটাই কি শেষ কথা? এর পরে আর কিছু নেই? সুধীন ব্যানার্জি খুনী। সমাজের কাছে, রাষ্ট্রের কাছে, দুনিয়ার মানুষের কাছে এই কি তার একমাত্র পরিচয়? তার বাইরে সে আর কিছু নয়? কোনোদিন কিছু ছিল না, কোনোদিন কিছু হতেও পারবে না?

মনে হয়েছিল, যে যাই বলুক, আইনের এই সূক্ষ্ম চোখটাই সব নয়। মানুষকে দেখবার চেনবার আরও অনেক চোখ আছে। অনেক দিক থেকে দৃষ্টি ফেললে তবে তার পূর্ণ রূপ ধরা পড়ে। মানব-সমাজের পক্ষ থেকে সে দৃষ্টিপাতের দায়িত্ব সরকারের। হয়তো এই রকম একটা মনোভাব থেকেই একদিন সুধীনকে ডেকে বলেছিলাম, মাকে লিখে দাও লাটসাহেবের কাছে দরখাস্ত করতে।

কিসের জন্যে সার্?

তোমার খালাসের জন্যে।

সুধীন হাসল; একটুখানি ম্লান হাসি। তারপর বললে, আপনি ভাবছেন, এ-সব কথা তাকে মনে করিয়ে দিতে হয়? কোনো দিকে

কোনো চেষ্টাই বাকী রাখে নি মা। লাট সাহেবের কাছেও পিটিশন করতে চেয়েছিল। কিন্তু উকিল-মামা বড় বড় উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ করে এসে বললেন, এখনও তার সময় হয় নি। আরও কিছুদিন না গেলে কোনো ফল হবে না।

হয়তো সেই কিছুদিন অপেক্ষা করেই আবেদন পাঠিয়েছিলেন উকিলবাবুরা, এবং যথাসময়ে তার ফলও দেখা দিয়েছিল। কারাবাসের আড়াই বছর পূর্ণ হলে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১ ধারা প্রয়োগ করে বাকী অংশটা মকুব করবার আদেশ দিয়েছিলেন প্রাদেশিক সরকার। আদেশ দেবার আগে যথারীতি তার চরিত্র এবং চালচলন সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, এবং আমরা যে তার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিলাম সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

সুধীন ব্যানার্জির সঙ্গে ব্রহ্মচারীর কোথাও কোনো মিল নেই। অমিলের অংশটাই বরং অতিমাত্রায় ব্যাপক এবং গভীর। প্রথম জন হত্যা করেছিল মানুষ, দ্বিতীয় জন মনুষ্যত্ব। নরঘাতক একদিন ক্ষমা পেলেও পেতে পারে, কিন্তু নারীধর্ষকের মার্জনা নেই। সুধীনের তরফ থেকে মানবতার দুয়ারে আবেদন করবার অবসর ছিল। সংবেদনশীল মানবসমাজের পক্ষে সরকার সে আবেদন গ্রহণও করেছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মচারীর বেলায় সে অবকাশ কোথায়? সংসারের কাছে রোষ এবং ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই তার প্রাপ্য নেই। তবু যে সরকারী দাক্ষিণ্য লাভের জন্য সুপারিশ পাঠাবার কথা আমার মনে হয়েছিল, তার কারণ আমিও স্পষ্ট করে জানি না। হয়তো মনে করেছিলাম, জঘন্য অপরাধে দণ্ডিত এই সদানন্দের মধ্যে আর-একটা

যে মানুষ আছে, যার পরিচয় আমি পেয়েছি, পেয়েছে আমার জেলখানার লোক, তাকে যদি দীর্ঘকাল ধরে এই পাঁচিলের আড়ালে পঙ্গু করে ফেলে রাখা হয়, তাতে কারও কোনো লাভ নেই। তার চেয়েও বড় কারণ, কোন্ যুক্তিবলে জানি না, আমার মনের কোণে একটা বিশ্বাস ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, ব্রহ্মচারী নির্দোষ। যে অপরাধের দণ্ড সে ভোগ করেছে, সেটা সে করে নি, করতে পারে না। সেদিন বিদায়-মুহূর্তে ব্রহ্মচারীর সেই স্বগত উক্তির উত্তরে আমার এই যুক্তিহীন বিশ্বাসটাই বাইরে বেরিয়ে এল। বললাম, কী পেয়েছ, তা তুমিই জান। আমি তো জানি, কিছুই দিই নি, দিতে পারি নি। যা হয়তো পারতাম, মনে মনে যা ভেবে রেখেছিলাম, সেটুকুও শেষ পর্যন্ত করে উঠতে পারি নি। চক্রান্তের জালে জড়িয়ে একটা নির্দোষ মানুষ জেলে পচতে থাকল, আর—

হঠাৎ কেমন যেন বিচলিত হয়ে পড়ল ব্রহ্মচারী। চকিতে একবার আমার দিকে চেয়ে কথাটা শেষ করবার আগেই বলে উঠল, নির্দোষ! না না; নির্দোষ আমি নই।

নির্দোষ নও!—যন্ত্রচালিতের মতো আবৃত্তি করে গেলাম। ব্রহ্মচারী সে প্রশ্নের আর জবাব দিল না; মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল।

জীবনে অনেক কারণে অনেক আঘাত পেয়েছি। কিন্তু সেই দিন যা পেয়েছিলাম, আজও বোধ হয় কাটিয়ে উঠতে পারি নি।

জেলখানার লোক আমি। আমার সঙ্গে আমার বন্দীদের সম্পর্ক, যতক্ষণ তারা থাকে আমার পাঁচিলের মধ্যে। বাইরে এলে তাদের

আলাদা রূপ। সেখানে তারা আমার কেউ নয়, আমিও তাদের কেউ নই। সুতরাং ব্রহ্মচারী-উপাখ্যান এইখানেই শেষ হবে, এইটাই ছিল সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। কিন্তু হল না। বছর তিনেক পরে, আমার মনের কোণ থেকে যখন সে নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে, হঠাৎ আমার গৃহকোণে তার দেখা পেলাম। শুধু দেখা নয়, তার সঙ্গে পেলাম তার প্রমাণিত অপরাধ এবং তারও পূর্বেকার সুদীর্ঘ কাহিনী। এই কথাগুলো শোনাবার জন্যেই খালাস হবার কদিন পরেই আমার নতুন কর্মস্থলে তার আকস্মিক আবির্ভাব। কুশল-প্রশ্নাদির পর বলল, জেলে থাকতেই বলতে পারতাম ; অনেক দিন বলবার আকাঙ্ক্ষাও যে না হয়েছে তা নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে নিরস্ত করেছি।

বললাম, কেন ?

একটু ইতস্তত করে উত্তর দিল ব্রহ্মচারী, আপনার দয়ার ওপর নতুন করে আর-এক দফা অত্যাচার করতে মন সায় দেয় নি।

কথাটা এক রকম করে বুঝলাম। পাছে আমার মনে হয়, সত্য কাহিনী বলবার ছলে এ শুধু নিজের অপরাধ ঢেকে রেখে সুবিধা বা অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা, তাই নিজের সম্বন্ধে সে আগাগোড়া মৌন থেকে গেছে। আজ আর সে আমার কয়েদী নয়। তাকে দেবার মতো অনুগ্রহ বা নিগ্রহ কোনোটাই আমার হাতে নেই। তাই বলবার যে বাধা ছিল, তাও চলে গেছে।

কিন্তু সে কাহিনীর পুনরুক্তি করতে গিয়ে আমি যে মস্ত বড় বাধায় এসে ঠেকলাম! সেটা হচ্ছে তার ভাষা। সুনির্বাচিত সংস্কৃত শব্দের পরিমিত প্রয়োগ ব্রহ্মচারীর প্রতিটি বাক্যকে যে মার্জিত এবং মধুর রূপ দান করে থাকে, তার সামান্য অংশ আয়ত্ত করতেই আমার

জীবন কেটে যাবে। তা হলে তো আর এ কাহিনী বলা চলে না। তাই নিরুপায় হয়ে এবং আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমার এই জেলের তৈরী অন্ত্যজ ভাষাতেই শুরু করে দিলাম।

যে বংশে ব্রহ্মচারীর জন্ম, গুরুগিরি এবং পৌরোহিত্যই তাদের কৌলিক পেশা। তার বাবা হৃষীকেশ আচার্য পর্যন্ত এই কুলধারা অব্যাহত ছিল। যজন, যাজন, অধ্যাপনা—এই ত্রিবিধ বৃত্তির অন্তত দ্বিতীয়টি তিনি সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু পুত্রদের আমলে এসে কোনোটাই আর বজায় রইল না। প্রথম পুত্র মোক্তারি পাস করে শহরে গিয়ে পসার জমিয়ে বসল। দ্বিতীয়টিও শহরের কোনো বড় রাস্তার মোড়ে সাজিয়ে বসল মনিহারী দোকান। তৃতীয় এবং কনিষ্ঠ এই সদানন্দ তখন গ্রামের ইস্কুলে উপর-দিকের ছাত্র। হেডমাস্টার মুক্তকণ্ঠে তার ইংরেজী-জ্ঞানের প্রশংসা করেন। তাই শুনে গোপনে নিশ্বাস ফেলেন হৃষীকেশ। ছেলেদের সম্বন্ধে বাবার মনের এই অনুক্ত ক্ষোভটুকু সদানন্দের কাছে লুকনো ছিল না। নিজের অবর্তমানে গৃহদেবতা নারায়ণ-শিলার ভবিষ্যৎ ভেবে তিনি যে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে এটাও সে এক রকম করে বুঝতে পেরেছিল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল তার অ্যাল্‌জেব্রা এবং গ্রামারের আড়ালে একখানা নতুন বইয়ের আমদানি হয়েছে। তার নাম নিত্যপূজা-পদ্ধতি। একটা ছুটির দিনের দুপুরবেলা সদ্য নিদ্রা-ভঙ্গের পর বড় বউঠাকুরানী যাচ্ছিলেন তার ঘরের পাশ দিয়ে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। বন্ধ দরজার আড়াল থেকে ভেসে আসছিল অনুচ্চ কণ্ঠের গুঞ্জরণ—খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্র-বদনং লম্বোদরং প্রস্যন্দন-

মদগন্ধ-লুব্ধ-মধুপব্যালোল গণ্ডস্থলং…। বামাকণ্ঠের হাসির শব্দে থেমে গেল গণেশের ধ্যান। দরজার এ পাশ থেকেই পরিহাসতরল কণ্ঠে বললেন বউদিদি, সাবাস! তুমিই দেখছি বংশের ধারা বজায় রাখবে ঠাকুরপো। যাই, নাপিত ডেকে পাঠাই। সামনের চুলটা কদমছাঁট করে পেছনে বেশ মোটা একটা—কী যেন বলে?

গড়িয়ে পড়ল হাসির ফোয়ারা। সদানন্দের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু বউঠাকুরানীর অপেক্ষায় না থেকে সে নিজেই নাপিত ডেকে পাঠাল; এবং চুল ছাঁটবার পর পিছন দিকের পুষ্ট শিখাটি কারও নজর এড়াল না। তার পরদিন সকাল সকাল পড়া শেষ করে স্নান সেরে ওই বইখানাকে নিয়েই ঢুকল গিয়ে ঠাকুর-ঘরে। দৈনন্দিন রুটিনমতো হৃষীকেশ নদীতে স্নান সেরে কমণ্ডলু হাতে গঙ্গাস্তব পাঠ করতে করতে ফিরছিলেন। বাড়ি ঢুকতেই কানে গেল ঘণ্টার শব্দ। ঠাকুর-ঘরের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। নিষ্পলক চক্ষে দেখতে লাগলেন কিশোর পূজারীর সেই অপটু হাতের দেব-পূজার প্রয়াস।

সদানন্দের চোখে পড়ল, বৃদ্ধ পিতার উপবাস-ক্লিষ্ট শীর্ণ মুখখানা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কী যেন বলতে গিয়ে নিজেকে সংবরণ করলেন হৃষীকেশ। তারপর সহজ সুরে বললেন, আজ ইস্কুল নেই তোর?

পুজোটা সেরে নিয়েই যাব।—লজ্জিত মৃদু সুরে উত্তর করল সদানন্দ, মুদ্রাটা কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না, একটু দেখিয়ে দেবেন?

সেইদিন থেকে কুলবিগ্রহের নিত্যপূজার ভার নিল বালক সদানন্দ। দাদাদের তর্জন, বউদিদের পরিহাস, সহপাঠীদের বিদ্রূপ

তাকে নিরস্ত করতে পারল না। প্রথম দিকে ক্রুটি-বিচ্যুতি যেটুকু ছিল, পিতার সাহায্যে দু-দিনেই কাটিয়ে উঠল। একটু একটু করে অন্যান্য পূজা-প্রণালীও যত্ন করে শেখালেন হৃষীকেশ। ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ হল না, কিন্তু পড়াশুনায় আগের মতো অখণ্ড মনোযোগ বজায় রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

হৃষীকেশকেও অনেক অনুযোগ শুনতে হল ছেলেদের কাছে। স্বর্গতা জননীর উল্লেখ করে বললেন মোক্তারবাবু, মা বেঁচে থাকলে কি তাঁর কোলের ছেলেটার ভবিষ্যৎ এমন করে নষ্ট করতে পারতেন আপনি ?

হৃষীকেশ প্রথমটা চমকে উঠলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, নষ্ট কাকে বলছ ?

ছেলের মেজাজ ফেটে পড়ল : পুরুতগিরি করতে গিয়ে লেখাপড়া যে গোল্লায় গেল, দেখতে পাচ্ছেন না ?

হৃষীকেশ ধীরভাবেই বললেন, ওর দাদারা যদি লেখাপড়া করেও গোল্লায় গিয়ে থাকে, ও না হয় না করেই যাবে।

বছর দুই পরে সদানন্দের ইস্কুলে পড়া শেষ হল। পাস করে গেল ভালোভাবেই। জলপানির আশা করেছিলেন হেডমাস্টার। তা আর হল না। কিছুদিন আগে ব্যাধি আর বার্ধক্যের চাপে প্রায় অচল হয়ে পড়েছিলেন হৃষীকেশ। যজমান-বাড়ির ক্রিয়াকর্মে প্রায়ই গিয়ে উঠতে পারতেন না। সে দায়টাও এসে পড়েছিল সদানন্দের ঘাড়ে। পরীক্ষার ফল বের হবার কয়েকদিন পরে তার ভবিষ্যতের ভাবনা যখন নতুন করে দেখা দিয়েছে সমস্ত পরিবারের মনে, এমনি সময়ে একদিন পাশের গ্রামের কোনো এক পুরাতন যজমানের

বৃষোৎসর্গের অনুষ্ঠান শেষ করে বাড়ি ফিরেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। দীর্ঘ চেষ্টায় জ্ঞান ফিরল; কিন্তু সে শুধু ক্ষণেকের জন্যে। মনে হল, শেষবারের মতো কাকে যেন খুঁজছেন চারপাশে। ছেলেমেয়েরা কাছেই ছিল। ছুটে এসে ঝুঁকে পড়ল। একে একে সবার দিকে চেয়ে চোখ দুটো স্থির হয়ে দাঁড়াল কনিষ্ঠ পুত্রের মুখের ওপর। ঠোঁট দুখানা নড়ে উঠল কয়েকবার, কিন্তু স্বর ফুটল না। চোখের কোণ বেয়ে বেরিয়ে এল কয়েক ফোঁটা জল। আর কেউ বুঝুক না বুঝুক, রুদ্ধবাক্ মৃত্যু-পথযাত্রীর সেই দুটি আকুল চক্ষের শেষ আবেদন সদানন্দের কাছে অস্পষ্ট রইল না। কানের কাছে মুখ নিয়ে অশ্রুজড়িত কণ্ঠে চিৎকার করে বলল, বাবা, আপনার সব কাজ আমি মাথায় তুলে নিলাম। আপনি নিশ্চিন্ত মনে ভগবানের নাম করুন।

ক্ষণেকের তরে, মনে হল, সেই যন্ত্রণা-বিকৃত রেখাকীর্ণ মুখের উপর ফুটে উঠল প্রশান্তির চিহ্ন। আশ্বাসময় গভীর তৃপ্তিতে চোখ দুটো বুজে এল; আর খুলল না।

শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে যাবার পব যথারীতি শহরে গিয়ে কলেজে ভরতি হবার তাগিদ যখন এল, সদানন্দ প্রস্তুত হয়েই ছিল; জবাব দিতে দেরি হল না: তা কী করে হয়? ঠাকুরপুজো কে করবে? তা ছাড়া, এত সব যজমান শিষ্য—

চুলোয় যাকগে যজমান শিষ্য।—রুখে উঠলেন বড়দাদা: সারাজীবন চাল-কলা বেঁধেই চলবে তোর? নিজের ভবিষ্যৎটাও দেখতে হবে না?

সদানন্দ হেসে ফেলল: কী করব, বলুন? ভবিষ্যতের চেয়েও বড় ভবিতব্য। তাকে কেউ খণ্ডাতে পারে না।

বড়দাদা আর সইতে পারলেন না ; উঠে চলে গেলেন। বউদিদি বললেন, তার মানে, পড়াশুনা আর করবে না ?

করব, তবে কলেজে নয়।

কলেজে নয়, তো কোন্‌খানে ?

জায়গাটা তোমাদের পছন্দ হবে না।

তবু বলো না একবার, শুনি ?

টোলে।

বউদিদি হেসে উঠলেন : এইবার তা হলে ষোলো কলা পূর্ণ হল।

হৃষীকেশের এক সতীর্থ এবং বন্ধু ছিলেন সিলেটের কোন্ গ্রামে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত এবং টোলের অধ্যাপক। মাঝে মাঝে ওঁদের পত্র-বিনিময় হত। ঠিকানাটা বাড়িতেই ছিল। পিতৃ-বিয়োগের দুঃসংবাদ জানিয়ে তাঁরই আশ্রয় প্রার্থনা করে চিঠি লিখল সদানন্দ। সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল। দুঃখ প্রকাশ এবং যথারীতি সান্ত্বনা দিয়ে শেষের দিকে লিখলেন অধ্যাপক—'ছাত্রাভাবে আমার চতুষ্পাঠী কিছুদিন হইল বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে। উদরান্নের জন্য অন্য বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছি। নিয়মিত অধ্যাপনার ব্যবস্থা নাই। তবু তোমার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলাম। তুমি তো এখানে ছাত্র হিসাবে আসিবে না, পুত্র হিসাবে আসিবে। যত শীঘ্র সম্ভব চলিয়া আসিও।'

শুভলগ্ন দেখে একদিন সিলেটের পথে পা বাড়াল সদানন্দ। সঙ্গে রইল সামান্য পরিধেয় এবং তারই সঙ্গে সযত্নে জড়ানো গৃহদেবতা শালগ্রামশিলা। কয়েকজন শিষ্য এবং যজমান তার ভরণপোষণের ভার সমেত লেখাপড়া এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা করে দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। সদানন্দ গ্রহণ করে নি। বিনীত কণ্ঠে জানিয়েছিল,

আপনাদের দেবার মতো প্রাণ আছে, সামর্থ্যও আছে। কিন্তু আমার যে নেবার মতো যোগ্যতা নেই। সেইটুকু অর্জন করবার জন্যেই এটা আমার তীর্থযাত্রা। দুটো বছর সময় চাইছি। ফিরে এসে আপনাদের কাছেই থাকব।

সন্ধ্যার দিকে অধ্যাপকের ঘাটে এসে নৌকা ভিড়ল। সেই দিনটি তার সমস্ত প্রীতি, মাধুর্য, বিস্ময় ও শঙ্কার শিহরণ নিয়ে আজও অম্লান হয়ে আছে সদানন্দের বুকের মধ্যে। হয়তো চিরদিন থাকবে। এগিয়ে এসে সস্নেহ সমাদরে এই বিনয়-নম্র প্রিয়দর্শন ছেলেটিকে গ্রহণ করলেন সস্ত্রীক অধ্যাপক। দুজনকে প্রণাম করে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াতেই চোখ পড়ল দরজার সামনে। হঠাৎ শিউরে উঠল সদানন্দ, এবং সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল চোখের পাতা। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে পেছন দিকে তাকিয়ে অধ্যাপক-গৃহিণীর স্নিগ্ধ হাসিটিও অকস্মাৎ নিবে গেল। তার সঙ্গে বেরিয়ে এল একটি গভীর নিশ্বাস।

ভয়ে ভয়ে আর-একবার চোখ তুলল সদানন্দ। চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। মুখের বাঁ দিক পুড়ে বিস্তৃত দাহচিহ্ন। কুঁচকে-যাওয়া চামড়ার পাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে এক পাটি দাঁত। তার উপরে স্থির হয়ে আছে একটি বিকৃতবিকল চোখ। বাঁ দিকটা যেমন বীভৎস, মুখের ডান অংশটা তেমনই নিটোল সুন্দর। তার চেয়েও আশ্চর্য তার অপরূপ দেহশ্রী। একরাশ কালো কোঁকড়ানো চুলের আড়ালে নাতিপ্রশস্ত কপাল। তার উপরে সযত্ন-রচিত কাঁচপোকার টিপ। গ্রীবার বাঁকটি অনবদ্য। সুগঠিত উন্নত বুক, সুঠাম পেলব বাহু। ক্ষীণ কোমর এবং যৌবন-পুষ্ট নিম্নাঙ্গের চারদিক ঘিরে বুকের উপর দিয়ে কাঁধের আড়ালে নেমে গেছে যে সাধারণ

শাড়িখানা, সে শুধু অঙ্গাবরণ নয়, অঙ্গশোভা—এমন একটি বিশেষ ভঙ্গিতে জড়ানো, যাতে করে দেহকে আড়াল করেছে যতখানি, তার চেয়ে বেশী করেছে প্রকাশ।

কন্যার এই অপূর্ব অঙ্গবিন্যাস ও তপ্তকাঞ্চনবর্ণের দিকে চেয়ে বোধ হয় মহাদেবীর ধ্যান মনে পড়েছিল ন্যায়রত্নের। তাই তার নাম দিয়েছিলেন চণ্ডী। সদানন্দের চোখে সে ধরা দিল আর-এক রূপে। অপরাহ্ণের আবছায়া আলোয় ওই দ্বারলগ্না নারীমূর্তির দিকে তাকিয়ে বিচিত্র রোমাঞ্চে কেঁপে উঠল তার ভীরু হৃদয়। বিস্ময়, বেদনা এবং ভয়ের সঙ্গে জড়ানো আর একটা অনাস্বাদিত অনুভূতি, যাকে সে চেনে না। তার জাগ্রত যৌবনের দুয়ারে এই প্রথম নারীর পদক্ষেপ। কিন্তু পূজারীর শ্রদ্ধাপ্লুত পুলকে মন ভরে উঠল কই? ওই নারীদেহ এবং তাঁর দাঁড়িয়ে থাকবার প্রগল্‌ভ ভঙ্গি, বিশেষ করে ডান দিকের ওই মোহন চক্ষুটির নির্লজ্জ চটুল হাসি গোপন অন্তর্লোকে কোন্ এক সুপ্ত প্রবৃত্তির ঘুম ভাঙিয়ে দিল! সে কী কদর্য রূপ তার! নিজের অশুচি অন্তরের দিকে চেয়ে শিউরে উঠল সদানন্দ। চোখ বুজে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করতে চেষ্টা করল। কিন্তু দ্বার জুড়ে রইল ওই কদাননা নারী।

অপুত্রক গৃহে পুত্রের স্থান পেল সদানন্দ। নিজের বাড়িতে তার ডাকনাম ছিল সদা। এখানে হল আনন্দ, আর চণ্ডীর মুখে আনন্দদা, কখনও বা আরও সংক্ষেপে নন্দদা। আবেগে, উচ্ছ্বাসে, সোহাগে জড়ানো সে ডাক যখন কানে যায়, সমস্ত দেহমূল যেন নড়ে ওঠে। শান্ত, গম্ভীর সংযমশীল ব্যাকরণের ছাত্র কিসের যেন উন্মাদনা অনুভব করে তার বুকের মধ্যে। এড়িয়ে চলতে চায়। গুরুনির্দিষ্ট নীরস পাঠের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে চায় একাগ্র মন। তার পর হঠাৎ

এক সময়ে অনুভব করে, কখন সে মন মোহাচ্ছন্ন হয়ে গেছে দুখানি শুভ্র সুকোমল হাতের স্পর্শ-সুখের স্মৃতি-নেশায়; অজ্ঞাতসারে কামনা করছে সেই নিষিদ্ধ পঙ্কিল সুখের পুনরাবৃত্তি।

সে কামনা অপূর্ণ থাকে না। নির্জন ঘরে কখন ঝড়ের মতো এসে পড়ে উদ্বেলিত প্রাণরসে ভরা একটি যৌবন-মত্ত দেহ। পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে যায় অর্থহীন প্রলাপ। তারপর হঠাৎ সামনে এসে মুগ্ধবোধ বন্ধ করে দিয়ে তেমনই ঝড়ের মতো ছুটে চলে যায়। কোনো কোনো দিন চুপিচুপি এসে বসে পড়ে একান্ত কাছটিতে। গলা জড়িয়ে ধরে আশ্চর্য করুণ কণ্ঠে বলে, আমাকে তুমি দু চক্ষে দেখতে পার না—তাই না, নন্দদা। সদানন্দের শিরায় শিরায় উদ্দাম হয়ে ওঠে রক্তস্রোত, বন্যার বেগে ভেঙে যেতে চায় সংযমের বাঁধ। ইচ্ছা হয়, নিবিড় পেষণে লুঠে নেয় ওই উত্তপ্ত উদ্ধত বুকের সুধার ভাণ্ডার। হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে আসে। খানিকটা সরে গিয়ে বলে, বিরক্ত কোরো না, পড়তে দাও।

না, দেব না পড়তে।—কোঁকড়ানো খোলা চুলে ছন্দময় দোলা দিয়ে বলে ওঠে মোহিনী। ব্যবধানটুকু আবার ঘুচে যায়। বলে, আচ্ছা নন্দদা, এই সব অং বং পড়তে গেলে কেন তুমি? সুধার বর কেমন তিনটে পাস দিয়েছে। মস্ত বড় চাকরি পাবে এবার।

কে সুধা?

ও হরি! সুধাকে চেন না? ওই বোসেদের মেয়ে! কত ঘটা করে বিয়ে হল, তুমি আসবার ঠিক সাত দিন আগে। চাকরি পেলেই ওরা বাসা করবে, বলছিল সুধা।

বেশ, এবার একটু ওদিকে যাও দিকিন। জ্যাঠাইমা ডাকছেন।

চণ্ডীর কানে বোধ হয় সে কথা পৌঁছল না। কেমন উদাস কোমল হয়ে এল কণ্ঠস্বর। আপন মনে বলে চলল, সুধা আর আমি একসঙ্গে তিন বছর পড়েছি শিবু পণ্ডিতের পাঠশালায়। সবাই বলত, চণ্ডীর কাছে সুধা দাঁড়াতেই পারে না। রূপেও না, গুণেও না। তারপর এই দশা হল। বাবা বললেন, এ মুখ নিয়ে আর পাঠশালায় যেতে হবে না। কারও বাড়ি গিয়ে একটু বসি, তাও পছন্দ করেন না। লুকিয়ে লুকিয়ে যেতে হয়। একলা একলা কি ভালো লাগে সব সময়? বলো, নন্দদা, লাগে?

সদানন্দ উত্তর দিল না। এ দুর্ঘটনার ইতিহাস সে আগেই শুনেছিল। মামার বাড়িতে স্টোভ জ্বালতে গিয়ে হঠাৎ কী করে আগুন লেগেছিল মুখের বাঁ দিকটায়, তার পর কেমন করে ওই অত রূপ চিরদিনের তরে হারিয়ে প্রাণটুকু শুধু ফিরে পেল হতভাগিনী, সব কথাই শুনিয়েছিলেন অধ্যাপক-গৃহিণী। কিন্তু নিজের মুখে সে কিছুই বলে নি। জীবনের এত বড় একটা বিপর্যয় তাকে যে কোথাও স্পর্শ করেছে তারও কোনো আভাস পায় নি সদানন্দ। উদ্দাম কলহাস্যমুখর চিরচঞ্চলার কণ্ঠে আজকার এ সুর একেবারে নতুন। এর কোনো উত্তর ছিল না। পরক্ষণেই আবার ফিরে এল সেই উচ্ছল কণ্ঠ: জান নন্দদা, সুধার ছোড়দা ওই অশোকটা কী পাজী! বলে কি শুনবে?—অনেক রাত্তিরে একবার আসিস চণ্ডী। দরজা ভেজানো থাকবে। কী অসভ্য!

সদানন্দের মনে হল, এই গোপন অভিসারের সমস্ত কলুষ-রস উপচে পড়ছে ওই মেয়েটার চোখ-মুখের প্রতিটি রেখায়। সেই নেশার মত্ততা ফুটে উঠেছে তার প্রতিটি অঙ্গে। হঠাৎ ছুটে এসে তার গায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে চিবুকে হাত দিয়ে বলল, মুখ গোমড়া

করে রইলে যে বড়? হিংসা হচ্ছে বুঝি? সত্যি, ব্যাটাছেলেগুলো ভা—রি হিংসুটে। তবু অমন করে থাকবে? বেশ, চললাম আমি অশোকের কাছে।—বলেই লুটিয়ে-পড়া আঁচল কুড়িয়ে নিয়ে হাসির লহর তুলে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে চলে গেল।

নারীর সঙ্গে নদীর এবং যৌবনের সঙ্গে জোয়ারের মিল আছে—এটা কাব্যের কথা। কবিরা বলেন, নদীর যেমন রূপ বদলায়, গতি বদলায়, তেমনি ক্ষণে ক্ষণে নব রূপ আর নতুন পথ নেয় নারী। তার হৃদয়স্রোত বেশীদিন এক খাতে বয় না। সদানন্দ কাব্যচর্চা করে না, নীরস ব্যাকরণের ছাত্র। তবু গুরুগৃহে মাস কয়েক কেটে যাবার পর এই রকম একটা অনুভূতি তার মধ্যে জেগে উঠল। মনে পড়ল তাদের গ্রামের নদীতে একবার বান ডেকেছিল। কোথা থেকে এক উদ্দাম জলোচ্ছ্বাস নির্লজ্জের মতো দু তীরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভেঙে দিয়েছিল কঠিন মাটির বন্ধন, ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল গৃহস্থের সম্ভ্রম ও আশ্রয়। তার পর দেখা গেল, সে প্রচণ্ড গতিবেগ আর নেই, পড়ে আছে শুধু একটা নিস্তেজ জলধারা। কিন্তু নদীর গতি কোনোদিন শেষ হয় না, শুধু তার দিক বদলে যায়। তাদের গ্রাম ছেড়ে নবগঙ্গাও চলে গেল দূরান্তরে। আর-এক গ্রামের বুক চিরে বয়ে চলল তার বিপুল স্রোত।

বাড়ি থেকে মাইল খানেক দূরে অধ্যাপকের কয়েক বিঘা জমি ছিল। মাঝে মাঝে যখন তিনি শিষ্য-পরিক্রমায় বেরুতেন, চাষবাস তদারক করবার ভার পড়ত সদানন্দের উপর। একদিন দুপুর-রোদে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে দেখল, চণ্ডী বসে বসে কী একটা সেলাই করছে। কিছুদিন আগেও এমনি মাঠ থেকে ফিরে এলে সে পাখা

নিয়ে ছুটে আসত ; গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে হাওয়া করতে শুরু করত ; ঘাম ঝরে গেলে কোনোদিন টেনে খুলে দিত গায়ের জামা। বাধা-নিষেধ, সঙ্কোচ-আপত্তি সব উড়ে যেত তার উচ্ছ্বসিত হাসির তোড়ে। আজ তার ওঠবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। একবার শুধু চোখ তুলে দেখে সেই সেলাই নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রইল। নিজের ঘরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে এক গেলাস খাবার জল চাইল সদানন্দ। মৃদুকণ্ঠে সাড়া দিয়ে এবার উঠে দাঁড়াল চণ্ডী। জল গড়িয়ে নিয়ে গেলাসটা রাখল একটা টুলের ওপর। খাওয়া হলে তুলে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সেই অপস্রিয়মাণ দেহের দিকে চেয়ে সদানন্দের মনে পড়ল তার গ্রামের নদী নবগঙ্গার কথা। তার মতো এই নারীও একদিন উত্তাল তরঙ্গ তুলে এসেছিল তার জীবনে, আশৈশব-গড়ে-তোলা কঠোর সংযমের বাঁধের উপর হানা দিয়ে তার অস্তিত্বের মূল ধরে নাড়া দিয়েছিল। আর একটু হলেই হয়তো সব ভেঙে পড়ত। কিন্তু তার আগেই সে সরে গেছে। পড়ে আছে শুধু ওই নির্জীব নিস্তরঙ্গ রূপধারা, এইমাত্র যে চলে গেল তার সুমুখ দিয়ে। স্রোত সরে গেলেও মরে যায় নি। অনুকূল হাওয়ায় এখনও সেখানে উদ্দাম জোয়ারের আলোড়ন দেখা দেয়। আর-এক কূলে গিয়ে আছড়ে পড়ে তার ঢেউ।

কূলনাশিনীর এই নতুন অভিযান সদানন্দের কাছে গোপন ছিল না। বোধ হয় গোপন রাখতে সে চায়ও নি। চরম উপেক্ষায় নিতান্ত অবহেলাভরে নিজেকে সে সরিয়ে নিয়ে গেছে এই নীরস শুদ্ধাচারীর নিরুত্তাপ সংস্রব থেকে। সব দেখে সব জেনেও একটি কথা বলে নি সদানন্দ। সে যেন শুধু নিস্পৃহ দর্শক মাত্র, তার বেশী আর কিছু নয়।

মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, এই যে সে নির্বাক্ ঔদাসীন্যে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছে, এটা সংযম নয়—কাপুরুষতা, ক্ষমা নয়—অক্ষমতা। এগিয়ে গিয়ে পথ রোধ করাই পৌরুষের লক্ষণ। কেউ নেমে যেতে চাইলেই তাকে পাপের পথে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া, ও তো শুধু 'কেউ' নয়। ওর সঙ্গে সম্পর্ক যদি নাও থাকে, যাঁরা তাকে স্নেহ এবং আশ্রয় দিয়ে আপনজনের অধিকার দিয়েছেন, সেই পরিবারের মান-সম্ভ্রম-কূল-মর্যাদার দিকে চেয়ে তাঁদের এই বিপথগামিনী কন্যাকে রক্ষা করতে হবে।

এই সব যুক্তি দিয়ে নিজেকে বোঝাতে চেয়েছে সদানন্দ। কিন্তু এই কর্তব্যবোধের অঙ্কুশ তাকে সাময়িকভাবে সজাগ করে তুললেও কাজের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি। মনের গহনে চোখ পড়তেই সন্দেহ জেগেছে, এর সবটাই হয়তো আত্মপ্রবঞ্চনা। যে-বস্তু তাকে চালনা করছে সে কি নিছক শুভাকাঙ্ক্ষী আশ্রয়দাতার প্রতি কর্তব্যবোধ, না, তার সঙ্গে জড়ানো কোনো কামনাবিদ্ধ প্রবৃত্তির তাড়না? যে ধরা দিতে এসেছিল, যাকে অনায়াসে লাভ করা যেত, নিজেই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। আজ যদি সে অন্য কারও হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে থাকে, আমার অন্তরে এ যন্ত্রণা কেন? এরই নাম কি ঈর্ষার জ্বালা? একেই কি বলে পরাজয়ের গ্লানি? কিংবা, আমি স্বেচ্ছায় তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি, এ কথা সত্য নয়। অক্ষম বলে তাকে ধরে রাখতে পারি নি। আমি হেরে গেছি, আর জয়ী হয়েছে ওই অশোক। আমার অত্যুচ্চ আদর্শের ধ্বজা আঁকড়ে ধরে আমি ছটফট করে মরছি, আর আমার এই অশক্ত মুষ্টির বন্ধন থেকে আমার কামনার ধন কেড়ে নিয়ে ভোগ করছে এমন একজন, রূপে গুণে বিদ্যায়

চরিত্র-গৌরবে মহত্তর জীবনের মাপকাঠিতে যে আমার চেয়ে সর্বাংশে নিকৃষ্ট।

দুর্বল মুহূর্তে এই সব কথা মনে হত সদানন্দের। কোনো কোনো দিন সমস্ত রাত এপাশ ওপাশ করে কেটে যেত। কখনও উঠে গিয়ে কতো গভীর রাত্রির চঞ্চল প্রহর পায়চারি করে কাটিয়ে দিত বাড়ির সামনেকার মাঠটায়। এমনি এক বিনিদ্র রাত্রে সেই মাঠের ধারে একটা গাছের গোড়ায় বসে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল, এই যে আজ সে দেশ ছেড়ে আত্মীয়-পরিজন সকলের একান্ত ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে চলে এসেছে, বরণ করে নিয়েছে এই অধ্যয়নকঠোর নিরানন্দ জীবনের দীনতা, তার একমাত্র উদ্দেশ্য স্বর্গত পিতার শেষ অভিলাষ পূর্ণ করে তাঁর আধ্যাত্মিক আদর্শকে রূপ দান করা। একটা চটুল-প্রকৃতি দুশ্চরিত্রা নারীর সঙ্গে নিজের পবিত্র মহান জীবনকে জড়িয়ে ফেলে আত্মহত্যা করতে সে আসে নি। সে নারী যে আজ তাকে স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়ে গেছে, এটা নিতান্তই বিধাতার আশীর্বাদ। সে একান্ত ভাগ্যবান। স্বর্গত পিতার পুণ্যবলই তাকে শেষ মুহূর্তে রক্ষা করেছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দু হাত কপালে ঠেকিয়ে পিতার উদ্দেশে প্রণাম জানাল সদানন্দ।

কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। খণ্ড খণ্ড মেঘে ছেয়ে আছে শুক্লপক্ষের স্বচ্ছ আকাশ। তারই একখানার আড়াল থেকে হঠাৎ যেন ডুব-সাঁতার দিয়ে বেরিয়ে এল দ্বাদশীর চাঁদ। দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল জ্যোৎস্নার প্লাবন। হেসে উঠল সিক্ত-পত্র গাছপালার দল। পাতার আড়ালে এখানে ওখানে শোনা গেল দু-চারটি হঠাৎ-জেগে-ওঠা কাকের ডাক। আলো দেখে মনে করেছিল,

ভোর হয়ে গেছে। ভুল ভাঙতেই আবার নেতিয়ে পড়ল ঘুমের কোলে। বিশ্বপ্রকৃতির এই স্থির প্রসন্ন মূর্তির দিকে চেয়ে সদানন্দের সমস্ত অন্তর নির্মল আনন্দে ভরে উঠল। ইষ্টদেবতাকে প্রণাম জানিয়ে হৃষ্ট মনে পা বাড়াল ঘরের দিকে।

কয়েক পা গিয়েই থমকে দাঁড়াল। এত রাত্রে কার ছায়া পড়ল ওই হিজল গাছের ধারে ? শুধু ছায়া নয়, তার পেছনে কায়াও আছে যার প্রতিটি রেখা ওর চেনা। একটিবার তাকিয়েই গভীর ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল, কিন্তু ফিরে যেতে পারল না। মুহূর্ত-পূর্বেকার সমস্ত সংকল্প ভাসিয়ে দিয়ে বুকের মধ্যে জ্বলে উঠল দুর্নিবার জ্বালা। কঠোর স্বরে বলল, দাঁড়াও। কায়া ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়াল। যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাবে অত্যন্ত সহজ সুরে বলল, কী বলছ ?

কোথায় গিয়েছিলে ?

তুমি বুঝি পাহারা দিচ্ছিলে বসে বসে ?—বলে হেসে উঠল চাপা হাসি।

চুপ করো। হাসতে লজ্জা করে না ?

না, করে না। দীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠল চণ্ডী।

এত অধঃপাতে গেছ !

যদি গিয়ে থাকি, তোমার কী ! তুমি সে কথা বলবার কে ?

ডান চোখের ভিতর থেকে ঠিকরে এল অগ্নিশিখা। জ্যোৎস্নালোকে স্পষ্ট দেখতে পেল সদানন্দ। কিন্তু বলবার মতো আর কোনো কথা খুঁজে পেল না। তার জন্যে অপেক্ষাও করল না নির্লজ্জ অভিসারিণী। দৃপ্তভঙ্গিতে দ্রুত পায়ে চলে গেল। তার পরেই শোনা গেল খিড়কির কপাট বন্ধ করবার শব্দ।

কম্বল-শয্যায় ফিরে গিয়ে আত্মস্থ হবার চেষ্টা করল সদানন্দ। ঠিকই বলেছে চণ্ডী।—তুমি সে কথা বলবার কে? সত্যিই কেউ নয়। এ শুধু চণ্ডীর কথা নয়, কিছুক্ষণ আগে সে নিজেও তো মনে মনে এই সঙ্কল্পই গ্রহণ করেছে, এই পথেই চালিত করতে চেয়েছে তার ভবিষ্যৎ-জীবনধারা। ওই মেয়েটা তার কেউ নয়। ওর শুভাশুভের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। ওই পাপস্পর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখাই তার সাধনা। সুস্পষ্ট ভাষায় সেই একই কথা ও জানিয়ে দিয়ে গেল; সহজ এবং সুগম করে দিয়ে গেল তার অভীষ্টসিদ্ধির পথ। তবে কিসের এ ক্ষোভ? কেন মনে হচ্ছে এটা তার অপমান, এটা তার পরাজয়? বুকের এ-প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত মুচড়ে উঠেছে কিসের বেদনায়? কে যেন বলছে তার কানে কানে, যে তোমার ছিল, মনের গোপন গহনে একদিন মোহ-সঞ্চার করেছিল যার মোহনস্পর্শ, আজ সে তোমার কেউ নয়। তোমার জীবন থেকে সে হারিয়ে গেছে; আর তারই জন্যে তোমার অন্তর-জোড়া এই হাহাকার।

না, না। তীব্র প্রতিবাদের আঘাতে সমস্ত সত্তাকে সচেতন করে উঠে বসল সদানন্দ। এই দৌর্বল্য তাকে জয় করতেই হবে। ছিঁড়ে ফেলতে হবে এই মোহপাশ। সমূলে উপড়ে দিতে হবে আবাল্যশুদ্ধ অন্তরের এক কোণে দেখা দিয়েছে যে পাপের অঙ্কুর। সেই সন্ধ্যা থেকে যে কলুষ চিন্তা তাকে অবিরাম অনুসরণ করে চলেছে, চোখ বুজলে পাছে আবার তার কবলে গিয়ে পড়তে হয়, তাই বাকী রাতটুকু জেগে কাটিয়ে দেবে, এই হল তার সিদ্ধান্ত। শুধু জেগে থাকা নয়, নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া কোনো ধর্মগ্রন্থের পবিত্র পরিবেশের মধ্যে। কম্বল গুটিয়ে রেখে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বেলে

গীতা খুলে বসল সদানন্দ। দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্যযোগ। মোহাবিষ্ট অর্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উদাত্ত বাণী : ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ—হে পার্থ, কাপুরুষতাকে আশ্রয় কোরো না। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ—ওঠো, হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতা ত্যাগ করো।

গোবর-নিকানো আঙিনার কোণে উত্তর ভিটিতে একখানা লম্বা-ধরনের ঘর। খড়ের ছাউনি, মুলিবাঁশের বেড়া, মাটির দাওয়া। পুবে-পশ্চিমে ছোট বড় দুটি কামরা। তাদের মাঝখানেও ওই ছ্যাঁচা বাঁশের দেওয়াল। ছোটটিতে থাকে সদানন্দ, বড়টি অধ্যাপকের। তারই পাশে আড়াআড়িভাবে আর-একখানা পুব-দুয়ারী চালাঘর। সেখানে থাকেন সকন্যা গৃহিণী। দু দিন হল শিষ্যবাড়ি গেছেন অধ্যাপক। এখনও ফিরতে পারেন নি। নিজের ঘরে খোলা দরজার দিকে মুখ করে গভীর রাত্রির গীতাধ্যয়ন প্রথমে নীরবেই শুরু করেছিল সদানন্দ। তার পর কখন সেই পাঠ ক্রমশ মৃদু থেকে কিঞ্চিৎ উচ্চতর গ্রামে পৌঁছে গেছে, বোধ হয় বুঝতে পারে নি। হঠাৎ দরজায় কার সাড়া পেয়ে চোখ তুলতেই কণ্ঠ থেমে গেল। রুক্ষ দৃষ্টি মেলে বিস্ময়-মেশানো বিরক্তির সুরে বলল, তুমি এখানে কেন?

ভয় নেই।—মুখ টিপে হেসে জবাব দিল চণ্ডী, কেউ দেখে ফেলবে না। মা অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

ঘরে যাও। আমার কাজ আছে।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কোথায় গিয়েছিলাম, জানতে চেয়েছিলে। তাই বলতে এলাম।

কোনো দরকার নেই।—বইয়ের দিকে চোখ রেখেই বলল সদানন্দ।

রাগ করেছ বুঝি ?

সদানন্দ এ কথার কোনো জবাব দিল না। চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঠিক তার সামনেটায় মেঝের উপর বসে পড়ল চণ্ডী। কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে থেকে যখন কথা বলল, তার সেই চপল স্বর কোথায় মিলিয়ে গেছে, তার জায়গায় ফুটে উঠেছে গভীর করুণ রেশ। বলল, আমার দিকে একবার চেয়ে দেখো।

সদানন্দ ক্ষণেকের তরে চোখ তুলেই আবার নামিয়ে নিল। বোধ হয় সে দৃষ্টি সইতে পারল না। সেই স্বরেই বলল চণ্ডী, আমি কুৎসিত। আমার মুখের দিকে চাইলে লোকে আঁতকে ওঠে। তাই বলে আমার এই রক্তমাংসের শরীরটাও কি মিথ্যা হয়ে গেছে? আমার কোনো সাধ নেই, লোভ নেই ? সংসারে মেয়েমানুষ যা চায় তার কোনোটাই আমার জন্যে নয় ?

সদানন্দের কাছে এ প্রশ্নের কোনো জবাব ছিল না। থাকলেও বোধ হয় দিতে পারত না। ক্ষণকাল অপেক্ষা করে আবার বলল চণ্ডী, আমার বয়সী যে সব মেয়ে, আমরা যারা একসঙ্গে বড় হয়েছি, একে একে তারা সবাই চলে গেল—ঘর পেল, বর পেল। আমি কী পেলাম ? আমি কী পাব ? কী নিয়ে কাটবে আমার সারা জীবন ? কেউ ভেবে দেখেছ সে কথা ? কেউ না। তাই আমার পথ আমি নিজেই বেছে নিলাম। অশোক আমার মুখের দিকে চায় না, চাইতে ভয় পায়। আমার মনের খবরও সে জানে না। সে চেয়েছিল আমার এই দেহ। আমি দিয়েছি। কেন দেব না ? আর কেউ তো তাও কোনোদিন চায় নি।

লজ্জাহীনা প্রগল্‌ভার দিকে ঘৃণারক্ত রূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল

সদানন্দ। শুধু ঘৃণা নয়, তার মধ্যে অপরিসীম বিস্ময়। পাপের এ কী অসঙ্কোচ স্বীকারোক্তি! বলতে ইচ্ছা হল: এ পথ ধরবার আগে, এই কলঙ্কের কথা মুখ ফুটে উচ্চারণ করবার আগে ওই পুকুরটা কি একবার চোখে পড়ে নি, কলঙ্কিনী? বলতে ইচ্ছা হল, কিন্তু বলা গেল না কিছুই। দীর্ঘদিনের বাক্‌-সংযম রসনার গতি রুদ্ধ করে দিল। কিন্তু অন্তরের সমস্ত ঘৃণা এবং রোষ বেরিয়ে এল দুটি জ্বলন্ত চোখের ভিতর দিয়ে। সেই দিকে চেয়ে চণ্ডীর মনেও বোধ হয় লাগল তার উত্তপ্ত স্পর্শ। উত্তেজিত দীপ্তকণ্ঠে বলল, কী দেখছ অমন করে? তুমি বলতে চাও, আমি নষ্ট হয়ে গেছি। হাঁা, হয়েছি। কিন্তু তার জন্যে দায়ী কে?

সে কথা কেমন করে বলবে সদানন্দ? তাকে কিছুই বলতে হল না। চণ্ডীর নিজের মুখ থেকেই এল তার প্রশ্নের উত্তর, দায়ী তুমি।

আমি!

হ্যাঁ, তুমি।

এই আকস্মিক আক্রমণে সদানন্দের স্নায়ুকেন্দ্র যেন হঠাৎ বিকল হয়ে গেল। সেই বিমূঢ় মূর্তির দিকে চেয়ে বোধ হয় কিঞ্চিৎ দয়ার উদ্রেক হল নির্দয়ার। অনেকটা যেন সস্নেহ সমবেদনার সুরে বলল, সত্যি তোমার জন্যে দুঃখ হয়, নন্দদা। লোভ আছে, কিন্তু ভোগ করবার ক্ষমতা নেই, সাহস নেই। যার উপরে লোভ, তাকে আঁকড়ে ধরতে পার না। সেদিকে হাত বাড়াতেও ভয়। সেই না-পারাটাকে ফলাও করে বল—সংযম। আরও কী যেন একটা গালভরা নাম আছে তোমাদের শাস্ত্রে? ব্রহ্মচর্য। না?—বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল।

সেই হাসির তীক্ষ্ণ ফলাগুলো কেটে কেটে বসে গেল সদানন্দের সমস্ত দেহের পরতে পরতে। ওই মধুবর্ষী রসনায় এত বিষ, কেমন করে জানবে সে? কিন্তু যতই বিষাক্ত হোক, ওই অভিযোগের প্রতিটি বর্ণ সতেজ ও প্রাঞ্জল। মিথ্যা বলে প্রতিবাদ করবার সাধ্য নেই, হীন বলে উপেক্ষা করবার শক্তি নেই। তাই বলে সয়ে নেওয়াও যায় না। নিষ্ফল ক্ষোভ এবং অক্ষম লজ্জায় মাথাটা আরও নুয়ে পড়ল বুকের ওপর।

সামনের দিকে আর একটু কাছে সরে এল চণ্ডী। আবেগভরা কণ্ঠে আবদার ঢেলে বলল, তুমি রাগ করলে! বাঃ, একটু ঠাট্টাও বুঝি করতে নেই? আচ্ছা, যা বলেছি, সব ফিরিয়ে নিলাম। এবার হল তো? শোনো! একটিবার তাকাও দিকি।···বেশ, এ পোড়া মুখ দেখতে না চাও, দেখো না। নিজের মনের দিকে চেয়ে বুকে হাত দিয়ে বলো তো--চণ্ডী তোমার কেউ নয়, কোনোদিন কেউ ছিল না। এই চোখেই কি দেখেছ তাকে এতদিন?···বিশ্বাস করো নন্দদা, যতই নেমে গিয়ে থাকি, আজও আমি তোমারই আছি। তুমি আমাকে টেনে তোলো। একটিবার, শুধু একটিবার মুখ ফুটে বলো—

পায়ের উপর আচমকা স্পর্শে চমকে উঠল সদানন্দ। পদ্মকোরকের মতো ছুখানা হাত, নবনীর মতো কটি আঙুল, কবিরা যার নাম দিয়েছেন চম্পকাঙ্গুলি, একদিন যার মদির স্পর্শ নেশা ছড়িয়ে দিয়েছে সমস্ত চেতনায়, এই মুহূর্তে হঠাৎ মনে হল, কতকগুলো কুৎসিত বিষধর সাপ জড়িয়ে ধরেছে তার পায়ের পাতা। ছু হাত পেছনে ছিটকে গিয়ে চিৎকার করে উঠল: ছুঁয়ো না; সরে যাও।

বিস্ময়বিহ্বল করুণ কণ্ঠে বলল চণ্ডী, সরে যাব! এ কথা তুমি বলতে পারলে নন্দদা!

দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোকের ছায়া মাড়ালেও পাপ। যাও, বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে।

সমস্ত দেহটাকে একটা রূঢ় ঝাঁকানি দিয়ে ভয়াল ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল চণ্ডী। যেন একখণ্ড জ্বলন্ত ইস্পাত। ডান দিকের চোখটা জ্বলে উঠল। তর্জনী তুলে বলল, দুশ্চরিত্র! বেশ আমিও দেখে নেব কোথায় থাকে তোমার চরিত্রের অহঙ্কার! যে পাঁকে আমি ডুবেছি, তোমাকেও সেখানে নামতে হবে। তা যদি না পারি

বাকী কথাগুলো অসমাপ্ত রেখেই বিদ্যুৎ-চমকের মতো মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

চণ্ডীকে সে ভালোবাসে, একদিন নিজের মনকে এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিল সদানন্দ। আজ মনে হল, সে শুধু ভাবের ঘরে চুরি। ভালোবাসা নয়; রূপজ মোহ, নারী-মেধের দুর্বার আকর্ষণ। সেই কলুষ স্পর্শ দিনের পর দিন তার দেহে মনে যে ঝড় তুলেছিল তাকে শত চেষ্টাতেও শান্ত করতে পারে নি। মাঝে মাঝে আশঙ্কা হত, আজই হয়তো ঘটে যাবে তার ব্রহ্মচর্য-জীবনের সেই চরম পতন, যার দাগ কোনোদিন মোছে না। বহু কষ্টে সে পতন রোধ করে গেছে। তারপর ঘটনা-স্রোত চলে গেল অন্য পথে। সেই সঙ্গে সে আশঙ্কাও দূরে চলে গেছে; ফিরে এসেছে আত্মবিশ্বাসের জোর। চণ্ডীর সেই গভীর রাত্রির স্পর্ধিত প্রতিজ্ঞা: তোমাকেও নেমে আসতে হবে সেই পাঁকের মধ্যে—আজ আর তাকে বিচলিত করে না। কিন্তু পতনের

ভয় না থাকলেও ওই মেয়েটা তার জীবনের মধ্যে এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে, এইখানে বসে তার গ্রন্থিমোচন কেমন করে সম্ভব? ওকে আশ্রয় করে যে বিপর্যয় ঘটে গেল তার অন্তর্লোকে, তার পর আর যাই হোক, বিদ্যার্থীর শান্ত সাধনার পথ খোলা থাকে না। গুরুগৃহ-বাস তার শেষ হল; এবার চলে যাবার পালা। যে উদ্দেশ্য নিয়ে ঘর ছেড়েছিল, এখানে আর তার সিদ্ধির সম্ভাবনা রইল না। মুগ্ধবোধ খুলে রেখে এই সব কথাই ভাবছিল সদানন্দ। অধ্যাপক ফিরে আসবার পর বিদায়ের প্রস্তাবটা কী ভাবে উপস্থিত করলে তাদের সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হবে না, অথচ ফললাভের পথ সুগম হবে, সেটাও ছিল চিন্তার বিষয়। এমন সময় এল তাঁর চিঠি। অন্যান্য কথার পর জানিয়েছেন, কোনো এক শিষ্যের বিশেষ অনুরোধে পক্ষকাল ভাগবতপাঠের ভার গ্রহণ করতে হয়েছে। মঙ্গলময়ের ইচ্ছা হলে ওই শুভকাজ শেষ করেই তিনি গৃহযাত্রা করবেন। চাষবাস এবং স্থানীয় যজমানদের ক্রিয়াকর্মের দায়িত্ব সদানন্দের উপর অর্পণ করে তিনি নিশ্চিন্ত আছেন। ইত্যাদি।

দিনের বেশীর ভাগ যতদূর সম্ভব বাড়ির বাইরেই কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করে সদানন্দ। বাকী সময়টা থাকে নিজের ঘরে। দু বেলা খাবার সময় দেখা হয় অধ্যাপক-পত্নীর সঙ্গে। দু-চারটি সাংসারিক কথাবার্তাও হয়। চণ্ডী থাকে নেপথ্যে। দৈবাৎ একদিন সামনে পড়তেই চোখাচোখি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল দুজনেই। সমানন্দের মনে হল, কেমন যেন রক্তহীন পাণ্ডুর দেখাল মুখখানা। পরক্ষণেই নিজের মনকে সরিয়ে নিয়ে এল অন্য কোন কাজের মধ্যে।

একদিন সন্ধ্যার পর অধ্যাপক-গৃহিণী তার ছোট ঘরটিতে দেখা দিলেন। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে একখানা জলচৌকি এগিয়ে দিল সদানন্দ। তিনি সেটি গ্রহণ করে বললেন, বোসো বাবা, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

সদানন্দ তার কম্বলের আসনে বসে অপেক্ষা করে রইল। তিনি ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললেন, কদিন থেকেই বলব মনে করছি। আজ-কাল করে হয়ে ওঠে নি। এদিকে ওঁরও ফেরবার সময় হল। তার আগেই সব ঠিকঠাক করে ফেলা দরকার। আর তো দেরি করা চলে না।

কার কথা বলছেন? কিসের দেরি?—বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করল সদানন্দ।

দেরি বইকি বাবা। দু মাস পেরিয়ে তিন মাসে পড়ল। চোখ-মুখের চেহারা যা হয়েছে! বেরুতে দেওয়া যায় না। এর পরে জানাজানি হয়ে পড়বে। এই মাসের মধ্যেই একটা ভালো দিন দেখে দু হাত এক করবার ব্যবস্থা করে ফেলতে চাই।

একটা কালো পরদা যেন উঠে গেল সদানন্দের চোখের উপর থেকে। বেরিয়ে পড়ল তারও চেয়ে কুৎসিত দৃশ্যপট। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অন্তরাত্মা বিষিয়ে উঠল। ঘুলিয়ে উঠল বুকের ভেতর। হঠাৎ কোনো উত্তর দেবার মতো মনের অবস্থা রইল না। গুরুপত্নী মুহূর্তকাল অপেক্ষা করে বললেন, দেশের বাড়ি থেকে কাউকে আনাতে চাও? আমি বলছিলাম, ভাইদের সঙ্গে যখন তেমন যোগাযোগ নেই, আর আমরাই যখন একরকম তোমার বাপ-মা, তখন—

তিক্ত কণ্ঠে বাধা দিল সদানন্দ : ও, সেই জন্যেই বুঝি ওই মেয়েকে আমার গলায় ঝুলিয়ে দিতে চান ?

ও মা! সে কি কথা! গলায় ঝুলিয়ে দেব কেন? তুমি তো নিজেই ওকে পায়ে ঠাঁই দিয়েছ বাবা।

পায়ে ঠাঁই দিয়েছি! আমি!

তা না হলে কি ওই অতবড় আইবুড়ো মেয়েকে এতটা মেলামেশা করতে দিই, না, সব জেনে-শুনেও নিশ্চিন্দি হয়ে বসে থাকি ?

সব জেনে-শুনে!—অনেকটা যেন আপন মনে আবৃত্তি করে গেল সদানন্দ। তার পর সুর চড়িয়ে বলল, কী জানেন আপনি? কতটুকু জানেন? আপনার ধারণা, ওর এই অবস্থার জন্যে দায়ী আমি ?

তুমি একা কেন দায়ী হবে বাবা? সন্তানের দায়িত্ব মায়েরও কম নয়।

কী বলছেন আপনি!—চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল সদানন্দ : এ সব ভুল, সব মিথ্যা। আমি এর কিছুই জানি না।

জান না!—বিস্ময়াহত শুষ্ক ক্ষীণ স্বরে বললেন চণ্ডীর মা। ও যে বললে—

ও বলেছে এই কথা? মিথ্যাবাদী! শয়তানী!—গর্জে উঠেই হঠাৎ থেমে গেল সদানন্দ। মনে পড়ল সেই গভীর রাত্রির দম্ভোক্তি : দেখে নেব কোথায় থাকে তোমার অহঙ্কার। এই ভাবে শোধ নিল শেষকালে!

গুরুপত্নী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন : এ তুমি কী বললে সদানন্দ? তোমাকে যে আমরা ছেলের চেয়েও আপনার বলে জেনেছি।

ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকল চণ্ডী। মাকে ধরে টেনে তুলে বলল, কী করছ এখানে বসে? চলে এসো।

মেয়েকে দেখেই আরও ভেঙে পড়লেন তিনি: এ কী করলি সর্বনাশী! তোকে নিয়ে কোথায় যাব আমি!

তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। যেতে হয় তো আমি একাই যাব।—বলে আর কোনো কথা বলবার আগেই তাঁকে এক রকম টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল।

গুরুগৃহে সেই রাতটাই সদানন্দের শেষ রাত। কয়েকখানা পাঠ্যগ্রন্থ সম্বল করে নিশীথ-রাত্রির অন্ধকারে চিরদিনের মতো যখন বেরিয়ে এল, তখন এ কথা তার মনে হয় নি, সকলের অলক্ষ্যে এই যে পালিয়ে যাওয়া—এ শুধু কাপুরুষতা নয়, নিজের উপরে আরোপিত অপরাধের নীরব স্বীকৃতি। যে মিথ্যা কলঙ্কের ভয়ে সে গৃহত্যাগ করছে, তাই সকলের চোখে সত্য হয়ে উঠবে। এ-সব কথা সেদিন বিচার করে দেখবার অবসর হয় নি। শুধু মনে হয়েছিল, যে পরিকল্পিত জঘন্য অভিযোগ, যে হীন ষড়যন্ত্র অক্টোপাসের মতো অষ্টবাহু বিস্তার করে তাকে জড়িয়ে ধরেছে, তার কবল থেকে নিজেকে বাঁচাবার একমাত্র পথ দূরে চলে যাওয়া। তাই গিয়েছিল। তার পর যখন পূর্ণ দৃষ্টিতে নিজের দিকে তাকাবার অবসর হল, দেখতে পেল দূরে গিয়েও বাঁচতে পারে নি। সর্বাঙ্গে জড়িয়ে গেছে দলিতা নাগিনীর প্রতিহিংসার বিষ। অন্যের চোখে না পড়লেও নিজের চোখকে এড়াবে কেমন করে?

যে কারণে ওখান থেকে চলে আসা, ঠিক সেই কারণেই বাড়ি ফিরে যাওয়া চলে না। দুর্নাম এবং কলঙ্কের বিষদাঁত নিয়ে অক্টোপাস সেখানেও ধাওয়া করবে। তাই সেই দিন থেকেই শুরু হল সদানন্দের নিরুদ্দেশ ভ্রমণের দীর্ঘ সূচী। সে এক বিচিত্র জীবন! কখনও

অনাহার, কখনও ভিক্ষা। কোথাও সাদর আহ্বান, কোথাও বা রূঢ় প্রত্যাখ্যান। এমনই ভাবে কেটে গেল কতদিন। তার পর আশ্রয় জুটল নবদ্বীপে এক পুথি-পাগল পণ্ডিতের জীর্ণ বৈঠকখানায়। কাজ, তাঁর চেয়েও জীর্ণ পুথির পাঠোদ্ধার, তার অনুলিপি-লেখন এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে কখনও মুগ্ধবোধ কখনও ভট্টিকাব্য কখনও বা রঘুবংশ। সেই বৈঠকখানার অন্ধকার কোণ থেকেই একদিন বেরিয়ে এল নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীসদানন্দ আচার্য কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ।

ব্রহ্মচারী সদানন্দ আচার্যের বৃত্তি ছিল ত্রিবিধ—যাজনিক ক্রিয়া, দীক্ষাদান এবং কথকতা। ক্রমে ওই তৃতীয়টিই প্রধান হয়ে দাঁড়াল। ওদিকেই দেখা দিল শক্তির বিকাশ। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল খ্যাতি। অর্থ হল, প্রতিষ্ঠা হল। কর্মজীবনে পুরুষ যা কামনা করে, যা পেলে নিজেকে মনে করে কৃতী এবং সফলকাম, সবই পেল সদানন্দ। সাধারণ জনের প্রীতি ও সম্মান, পণ্ডিতজনের স্বীকৃতি। তবু এই কর্মময় জীবনের কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেল। গৃহ? হ্যাঁ, গৃহ-বন্ধনের রঙিন আকর্ষণ নির্জন অবসরে দেখা দিত বইকি ব্রহ্মচারীর গোপন মনে। সে বন্ধনের মূল যে জায়গায়, যাকে আশ্রয় করে পুরুষ গৃহ-রচনা করে, গৃহী হয়, সেখানটার কথা ভাবতে গেলেই তার চোখের উপর ভেসে উঠত একটি কুৎসিত কিন্তু অনিন্দ্য-তনু অতৃপ্ত-যৌবনার উগ্রমূর্তি। ওই একটি নারীই এসেছিল সদানন্দের জীবনে, দিয়েছিল তার উত্তপ্ত দেহ-মনের নিবিড় স্পর্শ। কিন্তু তার মধ্যে মধু নেই, গন্ধ নেই, নেই দীপশিখার স্নিগ্ধতা। নারী যে কল্যাণদাত্রী, আরও যে কত রূপ আছে তার—প্রেমময় সুধাময়, সে কথা সে পেয়েছে শুধু কাব্যের মধ্যে; অন্তরের মধ্যে নয়। গৃহিণী

গৃহমুচ্যতে—মহাকবির এই বাণী রইল শুধু তার জ্ঞান এবং প্রচারের মধ্যে ; জীবনের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠল না।

এমনই করে অজ্ঞাতে কখন গড়িয়ে গেল বেলা। হঠাৎ চমক ভেঙে দেখতে পেল ব্রহ্মচারী, তার জীবনের আঙিনায় নেমে এসেছে অপরাহ্নের ছায়া।

রাস-পূর্ণিমার উৎসব চলেছে নবদ্বীপে। কত যাত্রী এসেছে দেশ-দেশান্তর থেকে। রাস্তার দু ধারে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে দেখেছে দীর্ঘ শোভাযাত্রা, ভিড় করেছে মেলায়, মন্দিরে, স্নানের ঘাটে। পোড়ামাতলার মোড়ে বিস্তৃত শামিয়ানার নীচে সভার আয়োজন করেছেন উৎসবের উদ্যোক্তারা। কথকতা করবেন ব্রহ্মচারী সদানন্দ। তিলধারণের স্থান নেই কোনোখানে। সব স্তরের সব বয়সের নরনারী। মিশ্র কোলাহলে ভরে উঠেছে সভাঙ্গন। মঞ্চের উপর শীর্ণকায় দীর্ঘাঙ্গ ব্রহ্মচারীর গৈরিক আভাস দেখা যেতেই সব স্তব্ধ হয়ে গেল। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ঘিরে রয়েছেন তাঁর চারপাশ। ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করে স্মিত মুখে বিশিষ্ট দর্শকদের দিকে ফিরে জানতে চাইলেন কোন্ কাহিনী শুনতে চান তাঁরা। প্রভুর যা অভিরুচি।—বিনীত কণ্ঠে উত্তর দিলেন জনৈক প্রবীণ শিষ্য। কয়েক মুহূর্ত বিশাল জনতার দিকে তাকিয়ে রইল সদানন্দ। তার পর শুরু হল কচ ও দেবযানীর অমর উপাখ্যান। অশ্রান্ত গতিতে এগিয়ে চলল অধ্যায়ের পর অধ্যায়। মহাভারতের মৌলিক বর্ণনার সঙ্গে যুক্ত হল রবীন্দ্র-কাব্যের

মাধুর্য ও কল্পনা, এবং তার মধ্যে জড়িয়ে রইল ব্রহ্মচারীর নিজস্ব ভাষা, ভঙ্গী আর কণ্ঠের লালিত্য।

দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ। দৈত্যগুরুর দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী। যে সঞ্জীবনী বিদ্যা দেবতার অনায়ত্ত, দেবলোকের হিতার্থে তাই তাঁকে অর্জন করতে হবে। সেই দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছেন শুক্রাচার্যের কাছে। সমস্ত দৈত্যকুল তাঁর প্রতিকূল। দৈত্যগুরু তাঁর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, দেবতনয়কে শিষ্যরূপে গ্রহণ করতে তিনি অনিচ্ছুক এবং অসমর্থ। কিন্তু কচকে নিরস্ত করা গেল না। সমস্ত বিপদ-বাধা বরণ করে কঠোর তপস্যায় গুরুর অনুগ্রহ লাভের জন্যে আত্মনিয়োগ করলেন। শুক্রাচার্যের স্নেহধন্যা তরুণী কন্যা দেবযানী। শুধু কন্যা নয়, প্রিয়শিষ্যা এবং আচার্যের দুর্লভ বিদ্যার অধিকারিণী। এই দৃঢ়কাম তরুণ দেবপুত্রের অপূর্ব কান্তি, বিনয়-নম্র সুমিষ্ট আচরণ এবং অনমনীয় অধ্যবসায় তার নারীহৃদয়কে স্পর্শ করল। অবাঞ্ছিত বিদেশীর উপর পড়ল তার প্রসন্ন দৃষ্টির স্নিগ্ধ আলোক। কন্যার অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে কচকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করলেন শুক্রাচার্য। শুরু হল বিদ্যার্থীর কঠোর জীবন। সহস্র-বৎসরব্যাপী দুস্তর সাধনা। নিরলস কর্মে এবং সুদুর্লভ অবসরে দেবযানী রইল তাঁর পাশে প্রীতিময়ী প্রবাসসঙ্গিনী। পাঠগৃহে, প্রাসাদের অলিন্দে, নির্জন বনচ্ছায়ায়, নিরালা নদীতীরে ছায়ার মতো দিল তাঁকে সঙ্গ এবং সাহচর্য।

অকস্মাৎ একদিন রাত্রির অন্ধকারে নিভৃত শয্যায় কচের দৃষ্টি পড়ল তাঁর গোপন অন্তরের পানে। কেউ জানে না, কখন্ কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে তারই উপরে অঙ্কিত হয়ে গেছে এক রূপময়ী দৈত্যবালার

মোহিনী মূর্তি। নিমেষের তরে বিস্ময়ে পুলকে বেদনায় ভরে গেল তাঁর তরুণ মন। পরমুহূর্তেই ফিরে এল সেই কঠোর প্রতিজ্ঞা—যে-ব্রত গ্রহণ করেছি, যে উদ্দেশ্য নিয়ে বরণ করেছি এই শত্রুপুরীর লাঞ্ছনা, তার পরিপূর্ণ সাফল্যই আমার একমাত্র লক্ষ্য। তার পূর্বে নিজের সুখ দুঃখ শুভাশুভ কিছুই জানি না। কর্তব্যের কাছে হৃদয়বৃত্তির স্থান নেই।

এমনই করে কেটে গেল সহস্র বৎসর। গুরু প্রীত হলেন। দান করলেন বহুবাঞ্ছিত সঞ্জীবনী বিদ্যা। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পর যাত্রার আয়োজন করলেন কচ। আচার্যকে প্রণাম করে বিদায় নিতে গেলেন দেবযানীর কাছে। কিন্তু সে বিদায় কি এতই সহজ? সেখানে যে রয়েছে সেই চিরন্তনী নারী, মাতৃরূপে প্রিয়ারূপে কন্যারূপে অনন্তকাল যে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে বহির্মুখী পুরুষের; স্নেহ দিয়ে প্রেম দিয়ে বাঁধতে চেয়েছে প্রিয়জনে, অশ্রু দিয়ে গাঁথা মায়াডোর জড়িয়ে দিয়েছে তার হাতে; কোমল বাহু প্রসারিত করে বলেছে, 'যেতে নাহি দিব'। কিন্তু নির্মম পুরুষ সে ব্যাকুল ডাক কোনোদিন শোনে নি। যে শুনেছে, তাকেও ছিনিয়ে নিয়ে গেছে বৃহত্তর জীবনের প্রবল বাহু। পথপ্রান্তে ফেলে দিয়ে গেছে উপেক্ষিত স্নেহপাশ।

এখানেও তারই পুনরাবৃত্তি হল। সেই বিদায়ের ক্ষণে দেবতার কাছে প্রেম নিবেদন করল দৈত্যকন্যা দেবযানী। যথারীতি ব্যর্থ হল তার আবেদন। নারী সব সইতে পারে। সংসারে এমন কোনো দুঃখ নেই, আঘাত নেই, যা সে যুগ যুগ ধরে বুক পেতে গ্রহণ করে নি। কিন্তু সে সইতে পারে না প্রেমের প্রত্যাখ্যান। সে আঘাত যখন

আসে, কেউ ভেঙে পড়ে, কেউ জ্বলে ওঠে নাগিনীর মতো। দেবযানী জ্বলে উঠল। হৃদয় ভরে অমৃতের ভাণ্ডার সঞ্চয় করে রেখেছিল যার জন্যে, তারই উপরে ঢেলে দিল অভিশাপের বিষ—যে বিদ্যার অভিমানে প্রেমকে অবহেলা করেছ, সে বিদ্যা তোমার ব্যর্থ হবে ; সে শুধু ভার হয়ে থাকবে তোমার জীবনে।

সভাভঙ্গের পর জনতার ভিড় হালকা হয়ে গেছে। অনুরাগী বন্ধু এবং শিষ্যদের কাছে বিদায় নিয়ে গৃহে ফিরছিল সদানন্দ। একাই চলেছিল গলি-পথ দিয়ে। এগিয়ে দিতে চেয়েছিল কেউ কেউ। কাউকে সঙ্গে নেয় নি। কেমন একটা একা থাকবার তাগিদ অনুভব করছিল মনে মনে। আনমনে পথ চলতে চলতে ভাবছিল, এইমাত্র যে কাহিনী সে শুনিয়ে এল, তার একটা ক্ষীণ সুর কোথায় যেন জড়িয়ে আছে তার নিজের জীবনের মধ্যে ; কোথায় যেন একটুখানি মিল। শুধু কচের কথাই সে বলে নি, বলে এসেছে নিজের কথা। আর তারই সঙ্গে—রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সদানন্দ। ঠিক তার সামনে মুখোমুখি যে দাঁড়িয়ে আছে, সে কি সত্য, না শুধু চোখের বিভ্রম? এতদিন পরে আপনার অজ্ঞাতে স্মৃতির কোঠায় যার ছায়া পড়েছিল, সে কায়া হয়ে দেখা দিল কেমন করে! অথবা এ শুধু তার বিভ্রান্ত কল্পনা!

দু হাতে চোখ রগড়ে আর-একবার তাকিয়ে দেখল ব্রহ্মচারী। না, ভ্রান্তি নয় ; সত্যিই সে দাঁড়িয়ে আছে। মুখের বাঁ দিকটা আঁচলে ঢাকা। ডানদিকের যেটুকু প্রকাশ, তার মধ্যে ভুল করবার অবকাশ নেই। কিন্তু এ কি সে, না, তার মুখোশ পরে দাঁড়িয়ে

আছে কোনো প্রেত? কোথায় গেল চোখের সেই বিদ্যুৎ-ঝলক, ওই কালো চোখের তারা থেকে যা ঠিকরে পড়ত একদিন! অপরাঙ্গে দৃষ্টি পড়তেই শিউরে উঠল সদানন্দ। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হল না, এই দেহই একদিন তরঙ্গ তুলেছিল তার রক্তধারায়।

কেমন আছ?—নিস্পৃহ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল চণ্ডী। সে বীণার ঝঙ্কার নয়, কেমন একটা ভাঙা-ভাঙা ধার-ক্ষয়ে-যাওয়া সুর।

ভালো। তুমি?

আমি?—হাসির কুঞ্চনে আরও কুৎসিত দেখাল মুখখানা: যেমন দেখছ। বাসা কোথায়?

মাঝের পাড়ায়।

যাব একদিন।—বলেই এগিয়ে গেল রাস্তার ধার ঘেঁষে।

একবার ইচ্ছা হল ব্রহ্মচারীর, ডেকে ফিরিয়ে বলে, না, আমার বাড়িতে এসো না তুমি। কোনো তরফেই তার আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু বলা হল না।

তিন-চার দিন পরে প্রাতঃসন্ধ্যা সেরে বারান্দায় বেরোতেই একটা অপরিচিত লোক উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। শরীর ও পোশাক দুইই অপরিচ্ছন্ন। কৃত্রিম হাসির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল দুপাটি কদর্য দাঁত।

আপনার কাছে এলাম।

কে আপনি?

আমাকে আপনি ঠিক চিনবেন না। তবে আমার ইয়ে—মানে, ঘরের মানুষটি আপনার অনেক দিনের চেনা।

একটু থেমে ব্রহ্মচারীর সন্দেহ-কুঞ্চিত ভ্রূর দিকে চেয়ে যোগ করল: চণ্ডীর কথা বলছি।

চণ্ডী আপনার স্ত্রী ?

না না।—জিব কেটে মাথা নাড়ল লোকটা : হাজার হলেও বামুনের মেয়ে। শুধু বামুন কেন, গুরুবংশের মেয়ে। তবে হ্যাঁ, এক সঙ্গেই যখন আছি আজ কুড়ি-বাইশ বছর, তখন বুঝতেই তো পারছেন ; জ্ঞানী লোক আপনি।—বলে আবার হেসে উঠল সেই কুৎসিত হাসি।

আমার কাছে আপনার কী দরকার ?—রূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল সদানন্দ।

দরকার সামান্যই। মা মেয়ে তুজনকেই পুষতে হয়। যা দিনকাল। দেখুন না, কার বোঝা কে বয় !

আর কিছু বলবার আছে আপনার ?

না, আর কিছু না। শুধু গোটা পঞ্চাশেক টাকা হলেই আপাতত—

মাপ করবেন। আপনি এবার আসতে পারেন।

আসব বইকি। তবে টাকাটা দিয়ে দিলে পারতেন ঠাকুরমশাই। আপনার ভালোর জন্যেই বলছি।

ব্রহ্মচারী ঘরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল। ফিরে দাঁড়িয়ে রুক্ষদৃষ্টি মেলে জানতে চাইল : তার মানে ?

মানে, আপনার সঙ্গে ওর আসল সম্পর্কটা তা হলে গোপনই থেকে যেত।

কী বলতে চান আপনি ?

আজ্ঞে, সেটা আমার চেয়ে আপনিই ভালো জানেন। এখানে অবিশ্যি এখনও কেউ জানে না। কিন্তু জানতে কতক্ষণ ? ভেবে দেখুন, তারপরে—

জানেন, আপনাকে আমি পুলিসে দিতে পারি?

পুলিস!—বিকট শব্দ করে হেসে উঠল লোকটা: তাতে আপনার বিশেষ সুবিধে হবে না, পণ্ডিতমশাই। তা ছাড়া করালী কুণ্ডু কারও চোখ রাঙানোকে পরোয়া করে না। যাক, এবার তা হলে আসি। পেন্নাম।

হনহন করে বেরিয়ে যাচ্ছিল করালী। ব্রহ্মচারী ডেকে ফেরাল: শোনো। চণ্ডী পাঠিয়েছে টাকার জন্যে?

না, তা ঠিক নয়।—আমতা আমতা করে বলল লোকটা, তবে টাকার দরকার তারই। অসুখে পড়ে আছে। কদিন কাজে বেরোতে পারে নি। আমিও বেকার বসে আছি। সেয়ানা মেয়েটাকে—

কথা শেষ করবার আগেই ঘরের মধ্যে চলে গেল ব্রহ্মচারী। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে পাঁচখানা নোট ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, আর কোনোদিন এসো না।

না না, আর আসতে হবে না।—নোটগুলো কুড়িয়ে নিয়ে কোঁচার খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে বলল করালী, এতেই কাজ হবে।

কিন্তু পাঁচ-সাত দিন না যেতেই আবার এসে দাঁড়াল সেইখানটিতে। গড়গড় করে বলে গেল একঝুড়ি কথা, যার সারমর্ম—মা-মেয়ের কাপড় নেই, ঘরের বার হতে পারে না। গোটা দশেক—ইত্যাদি। দশটা টাকা দিয়ে বিদায় করল ব্রহ্মচারী। তার কদিন পরেই এল মোটা অঙ্কের তাগিদ। ছ মাস থেকে বাড়িভাড়া বাকী। চণ্ডীকে অপমান করে গেছে বাড়িওয়ালা। কুৎসিত ইঙ্গিত করেছে বয়স্থা মেয়েটাকে জড়িয়ে। ভয়ানক কান্নাকাটি করছে ওরা। সন্ধ্যার মধ্যেই যেমন করে হোক বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

সত্যিই তো, ওদেরই বা দোষ দিই কেমন করে।--হাত পা নেড়ে বিজ্ঞের ভঙ্গীতে বলল করালী, আজই না হয় সব গেছে, আসলে তো অত বড় একজন নামকরা পণ্ডিতের মেয়ে! সেই কথা বিবেচনা করে আমিও মশাই ফেলে আসতে পারলুম না। ওদের ওখানে গিয়েই জড়িয়ে পড়লাম। সেই যে চেপে ধরল, আর ছাড়বার নামটি নেই। কী করি, বলুন? ঘাড়ে যখন এসে চাপল, একটা মেয়েছেলেকে তো আর রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া যায় না। আমারও তখন বিশেষ কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। বউ মারা যাবার পর আর সংসার করি নি। আপনার আশীর্বাদে অবস্থাও মন্দ ছিল না। তিনখানা বাড়ি ঢাকা শহরে। ভাড়া যা আসত--তিনটি তো মোটে প্রাণী—হেসেখেলে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হতেই সর্বনাশ ঘটল। তার পরেও অনেক দিন পড়ে ছিলাম। ওই মেয়েটা সেয়ানা হয়ে উঠতেই চলে আসতে বাধ্য হলাম। সে যাক গে। এবার কোনোক্রমে দায় উদ্ধার করে দিন। আর আসব না আপনার কাছে।

ব্রহ্মচারী কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কানে গেল, বলছে করালী, দায়টা তো আসলে আপনারই—

কী বললে?—গর্জে উঠল সদানন্দ।

আজ্ঞে, মানে—

মনে করেছ, কতগুলো মিথ্যা কুৎসার ভয় দেখিয়ে বরাবর এমনই টাকা আদায় করে যাবে, না?

আজ্ঞে না, ভয় দেখাব কেন? আমি বলছিলাম—।

যাও!—মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে দরজার দিকে আঙুল তুলে ধরল সদানন্দ।

কী বলছেন ?

বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।

করালী উঠে দাঁড়িয়ে রক্তচক্ষু মেলে বলল, এইটেই কি আপনার শেষ কথা ?

হ্যাঁ, শেষ কথা। আর কোনোদিন যেন তোমাকে দেখতে না পাই।

আচ্ছা !—লম্বা চুলগুলোয় একটা উদ্ধত ঝাঁকানি দিয়ে বেরিয়ে গেল করালী।

দিন তিনেক পরেই এল আবার বাইরে যাবার নিমন্ত্রণ। বর্ধমান অঞ্চলে পর পর গোটাকয়েক ধর্মসভায় ভাগবত-পাঠ শেষ করে কথকতার বায়না নিয়ে যেতে হল মুর্শিদাবাদ। সেখান থেকে মালদা হয়ে নবদ্বীপ ফিরতে মাস পেরিয়ে গেল।

ফিরে আসবার কয়েকদিন পর। অন্ধকার রাত। দশটা বেজে গেছে। বিশ্রামের আয়োজন করছিল ব্রহ্মচারী। দরজার কড়া নড়ে উঠল। একটু বিরক্তির সঙ্গে খুলে দিয়ে হ্যারিকেনের আলোটা উঁচু করে ধরতেই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—তুমি !

খুব অবাক হয়ে গেছ, না ?—দরজা পার হয়ে ভিতরের দিকে পা বাড়াল চণ্ডী।

তুমি বোধ হয় জান না, এ বাড়িতে আমি একা থাকি।

তার মানে, কেউ দেখে ফেললে দুর্নাম দেবে, এই তো ?

মিথ্যা দুর্নামের ভয় আমি করি না।

একদিন কিন্তু করেছিলে। সে যাক। আজ নিশ্চিন্ত থাকতে

পার। এ রূপ দেখে সে ভুল কেউ করবে না। বড় জোর ভাববে, ভিক্ষা চাইতে এসেছে কোন রাস্তার ভিখিরী। আর সত্যিই তাই। একটা ভিক্ষে চাইতেই এসেছি তোমার কাছে।—বলে বসে পড়তে যাচ্ছিল উঠানের এক পাশে।

ব্রহ্মচারী বাধা দিয়ে বলল, বারান্দায় উঠে বোসো। দাঁড়াও।—বলে ঘরের দিকে পা বাড়াল একটা কিছু এনে পেতে দেবার জন্যে।

থাক, আর কিছু লাগবে না। এই মেঝেতেই বসছি। একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকলেই পা ধরে যায়।—সলজ্জ মৃদু হাসির সঙ্গে বলল চণ্ডী।

ব্রহ্মচারীর একবার ইচ্ছা হল, জিজ্ঞাসা করে, শরীর এ রকম হল কী করে? কী অসুখ করেছিল? তখনই মনে হল করালীর মুখে সেদিন সামান্য যেটুকু জেনেছে তার পরে এ প্রশ্ন নিরর্থক। চণ্ডীই আবার কথা পাড়ল। যেন কতদূর থেকে ভেসে এল তার স্বর: তুমি তো চলে এলে। মাসখানেকের মধ্যে মাও সরে পড়ল। সেই যে বিছানা নিয়েছিল, আর উঠল না। আমার অবস্থা তখনও বাবার নজরে পড়ে নি। মা বলে যেতে পারে নি, হয়তো ইচ্ছা করেই বলে যায় নি। ওই লোকটা এসেছিল বাবাকে পৌঁছে দিতে। তারপর আর নড়তে চায় না। লোকের কাছে বলে বেড়ায়, গুরুকে এই অবস্থায় ফেলে যায় কেমন করে। কিন্তু তার আসল টানটা যে কোথায় আমি প্রথম দিনই টের পেয়েছিলাম। তারই সুযোগ নিলাম। দুর্গা বলে ঝুলে পড়লাম ওই করালীর কাঁধে। তখনও ও সবকিছু জানে না। যখন জানল, লাথি মেরে দূর করে দিতে পারত। কিন্তু দেয় নি। বরং অনেক কিছু করেছে আমার জন্যে—যা আপনার লোকেরা কেউ কোনোদিন করত না।

জ্যাঠামশাই কোথায় আছেন?—চণ্ডী একটু থামতেই প্রশ্ন করল ব্রহ্মচারী।

কী করে জানব? বাড়ি ছাড়বার পর আর খবর পাই নি। এতদিন কি আর বেঁচে আছেন! থাকলেও কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কোনোদিনই জানতে পারব না।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে গলাটা একটু ধরে এল। একটুখানি ছেদ পড়ল কথার মাঝখানে। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে আবার শুরু করল চণ্ডী: যাক, যা বলতে এসেছিলাম, শোনো। বুঝতেই পারছ, তুমি হঠাৎ চলে আসবার পর আমাকে জড়িয়ে অনেক কথাই রটেছিল তোমার নামে। করালীর কানেও গিয়েছিল নিশ্চয়ই। নবদ্বীপে এসে আমার আগে ও-ই জানতে পারে, তুমি এখানে আছ। মাঝে মাঝে বলতেও শুনেছি তোমার কথা। কিন্তু ও যে এখানে আসা-যাওয়া করে, ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি। হঠাৎ একদিন শুনলাম, আমার নাম করে টাকার জন্যে উৎপাত করছে তোমার ওপর। ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জা বল তো?

সদানন্দ প্রতিবাদ করল: না না, উৎপাত করবে কেন? তা ছাড়া টাকা তো সে তোমার হয়ে চায় নি।

আমার হয়ে না চাক, টাকার দরকার যে আমার জন্যেই, সে কথা নিশ্চয়ই বলেছে। তা হলে আর বাকী রইল কী?

যেখান থেকেই হোক, সে দরকারটা যদি আমি জেনে থাকি, সেটা কি তোমার এতই লজ্জার কথা?

হয়তো একটু মৃদু অভিমান প্রচ্ছন্ন ছিল সদানন্দের এই প্রশ্নের অন্তরালে। চণ্ডীর কাছে কি তা ধরা পড়ে নি? পড়লেও সে জানতে

দিল না। স্থির সহজ সুরেই বলল, ঠিকই বলেছ। কারও কাছে হাত পাততেই আজ আর আমার লজ্জা করা চলে না।

কারও কাছে! আহত হল সদানন্দ। কিন্তু কী বলবার আছে! যে দূরে ছিল, সে যদি দূরেই থাকতে চায়, একজনকে সবার থেকে আলাদা করে না দেখতে চায়, নালিশ জানাবে সে কার কাছে! তবু চুপ করে থাকতে পারল না। একটু ক্ষোভের সঙ্গেই বলল, আমার কথাটা তুমি বোধ হয় বুঝতে পার নি।

বুঝে কী লাভ, বলো?—সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল চণ্ডী: টাকা তুমি দিতে পার, দেবার ইচ্ছাও হয়তো আছে, কিন্তু নেবারও তো একটা অধিকার চাই। তা যদি থাকত, করালীর আগে আমি নিজেই আসতাম তোমার কাছে। সে যাক গে। আমার আসল কথাটাই যে এখনও বলা হয় নি। তোমাকে কিন্তু শুনতেই হবে, নন্দদা। বলো, শুনবে?

আমি তো বুঝতে পারছি না, কী বলবে তুমি! সাধ্যমত হলে নিশ্চয়ই শুনব।

চণ্ডী ক্ষণকাল নীরব থেকে বলল, তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।

চলে যেতে হবে! কেন?—অতিমাত্রায় বিস্মিত হল সদানন্দ।

কারণটা যদি না বলি? না হয় মেনেই নিলে আমার একটা কথা।

ব্রহ্মচারী নিরুত্তর। মুখ ফুটে দূরে থাক, মনে মনেও বলতে পারল না, বেশ, তাই নিলাম; মেনে নিলাম তোমার কথা। চণ্ডী কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, যদি জিজ্ঞেস কর, যা বলব, কোনো প্রশ্ন না তুলে চোখ বুজে মেনে নেবার মতো কী পরিচয় আমি তোমাকে

দিয়েছি, আমার কোনো উত্তর নেই। না যদি শোন তা হলেও আশ্চর্য হব না। শুধু ভেবে দেখতে বলব, বড় রকম কারণ না থাকলে এত রাত্রে এই অনুরোধ নিয়ে তোমার কাছে ছুটে আসতাম না।

সদানন্দ তখনও নির্বাক। কী সে বড় কারণ, এত কথার পর জানতে চাওয়াও যেমন সহজ নয়, না জেনে এই অদ্ভুত অনুরোধ রক্ষা করাও তেমনই কঠিন। চণ্ডী অনুনয়ের সুরে বলল, যত শীগগির পার তুমি কোথাও চলে যাও, নন্দদা। ভগবান তোমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন, যেখানে যাবে, লোকে তোমাকে মাথায় তুলে নেবে। যশ বল, অর্থ বল, কোনো দিকেই কোনো ক্ষতি হবে না।

লাভ-ক্ষতিটাই একমাত্র জিনিস নয়।—শুষ্ক গম্ভীর সুরে বলল সদানন্দ, তার চেয়েও অনেক বড় জিনিস আছে মানুষের জীবনে। আমার যা কিছু, সব এইখানে। নবদ্বীপের কাছে আমি অনেকভাবে ঋণী। হঠাৎ তাকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সম্ভব নয়!—ক্ষীণ নৈরাশ্যের সুরে যেন আবৃত্তি করে গেল চণ্ডী। নিশ্বাস ফেলে বলল, তা হলে আর কী করতে পারি আমি?

সদানন্দ একটু ইতস্তত করে বলল, কেন চলে যেতে বলছ, জানাতে বাধা আছে কি? তোমার যদি কোনো সুবিধা হয়, তা হলে বরং—

চণ্ডীর মুখে ফুটে উঠল এক মর্মান্তিক হাসি। বাধা দিয়ে বলল, আমার সুবিধা! আর একদিন যে কাউকে কিছু না বলে গভীর রাত্রে চলে গিয়েছিলে, সেও কি আমার সুবিধার জন্যে?

না, তার মধ্যে নিজের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বলতে পার, পালিয়ে গিয়েছিলাম। অপবাদ, তা সে যত বড় মিথ্যাই হোক, সাহস করে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি নি।

কিন্তু আজ আবার যদি আসে তার চেয়েও বড় কলঙ্কের অপবাদ, তার চেয়েও মিথ্যা, জঘন্য, কুৎসিত ?

ব্রহ্মচারী হাসল, নিরুদ্বেগ প্রশান্ত হাসি। অত্যন্ত সহজ সুরে বলল, তা হলেও আজ আর পালাবার প্রয়োজন নেই। মিথ্যার ভয় আমার ঘুচে গেছে।

তুমি বুঝতে পারছ না, নন্দদা।—আর্তকণ্ঠে বলে উঠল চণ্ডী, ওই করালীকে তুমি চেন না! ও মানুষ নয়, সাপ; সাপের চেয়েও নিষ্ঠুর। কখন কোন পথে, কী ভাবে যে ছোবল মারবে, স্বপ্নেও ভাবতে পার না।

এই জন্যেই কি তুমি আমাকে চলে যেতে বলছ ?

একে তুমি তুচ্ছ করে দেখো না, নন্দদা। তা ছাড়া—

তা ছাড়া, কী বলো ?

বুঝতে পারছি আমিই বোধ হয় ওর অস্ত্র। আমাকে দিয়েই হয়তো শোধ তুলবে তোমার ওপর। অনেক ক্ষতি করেছি তোমার। এতদিন পরে আবার আমার হাত দিয়েই আসবে তোমার চরম ক্ষতি ? না নন্দদা, তোমার পায়ে পড়ি, আমার এই শেষ কথাটা রাখো। নবদ্বীপ ছেড়ে চলে যাও তুমি। দেরি করলে হয়তো সর্বনাশ হয়ে যাবে।

উঠনে নেমে ব্রহ্মচারীর পা দুটো চেপে ধরল। বেদনার্ত চোখ তুলে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে। আজ আর সরে গেল না সদানন্দ; পা দুটোও ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল না। কিছুক্ষণ নির্লিপ্ত দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলল, রাত অনেক হল। এবার তুমি বাড়ি যাও।

চণ্ডী আর কোনো কথা বলল না। পা ছেড়ে দিয়ে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে নির্জন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত সদানন্দের বিনিদ্র চোখের উপর জেগে রইল দুঃখে দৈন্যে লাঞ্ছনায় ভেঙে-পড়া একটি কুরূপা নারীমূর্তি, কানে আসতে লাগল তার উৎকণ্ঠায়-ভরা ব্যাকুল আবেদন। অন্তরের তলদেশ থেকে ভেসে এল একটি স্বর—একদিন যাকে সব দিতে পারতে, আজ তার এই সামান্য কথাটা রাখতে পারলে না! এ ভিক্ষা তো সে নিজের জন্যে চায় নি, চেয়েছে তোমারই জন্যে, তোমারই মঙ্গল কামনায়। সে স্বর ডুবিয়ে দিয়ে জেগে উঠল ক্ষুব্ধ উত্তর—কিন্তু কেমন করে ভুলি, এই নারীই একদিন চরম অভিশাপ নিয়ে এসেছিল আমার জীবনে! কে সে? তার সঙ্গে কী আমার সম্পর্ক যে তারই কথায় ছেড়ে যেতে হবে বহু যত্নে, বহু সাধনায় গড়ে তোলা এই যশ-খ্যাতি, এই বহুবিস্তৃত সামাজিক প্রতিষ্ঠা? এ তো ঠুনকো জিনিস নয় যে একটা মিথ্যা অপবাদের ঘায়ে ভেঙে পড়বে?

তবু ভেঙে পড়ল। কদিন পরেই এল সেই দুর্জয় আঘাত। এল ওই চণ্ডীর দিক থেকে, তারই মেয়ের রূপ ধরে। করালী কুণ্ডুর নিপুণ হাতে সাজানো রঙ্গমঞ্চে প্রধান ভূমিকা নিল ওই ময়না। অত্যন্ত অতর্কিতে তারই হাত থেকে ছুটে এল ব্রহ্মচারীর মৃত্যুবাণ। অমোঘ সে অস্ত্র, এবং তারই আঘাতে মরল ব্রহ্মচারী—কলঙ্কময় অপঘাত মৃত্যু। এত বড় প্রতিষ্ঠা এবং এতদিনের সুনাম তাকে বাঁচাতে পারল না। অত বড় গর্ব ও গৌরবের ধন যে নবদ্বীপ, সেও তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এল না।

চাকর এসে আলোর সুইচটা টিপে দিতেই হঠাৎ খেয়াল হল, ব্রহ্মচারীর মৃদুকণ্ঠ কখন থেমে গেছে, এবং তার পরেও অনেকক্ষণ আমরা দুজনে অন্ধকারে মুখোমুখি বসে আছি, আলো জ্বালবার কথাটাও মনে হয় নি। এবার নড়েচড়ে বসে ডাকলাম, ব্রহ্মচারী। ক্ষীণ অস্পষ্ট কণ্ঠে সাড়া দিয়ে সদানন্দ মুখ তুলে তাকাল। বললাম, সেই দিনটার কথা তোমার মনে আছে ?

ব্রহ্মচারী জবাব দিল না ; জিজ্ঞাসা করল না, কোন্ দিনের কথা জানতে চাইছি আমি। তার মুখের উপর ফুটে উঠল একটি পরিম্লান করুণ হাসি—যার অর্থ প্রশ্নটা কি নিরর্থক নয় ? আমার কণ্ঠেও বোধ হয় শোনা গেল সেই দিনটিতে ফিরে যাবার সুর, জেলখানার আফিসে শেষবারের মতো যেদিন ওর সঙ্গে আমার দেখা। বললাম, একটা নির্দোষ মানুষ জেলে পচতে লাগল, এই ভেবে অনেকখানি ক্ষোভ ছিল আমার মনে। তারই খানিকটা প্রকাশ করতে গিয়েছিলাম। তুমি বাধা দিয়ে বলেছিলে, আমি তো নির্দোষ নই। শুনে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন।

জানি, স্যর্।—মাথা নত করে বলল ব্রহ্মচারী, তবু যা সত্য, না বলে আমার উপায় ছিল না।

অতিমাত্র বিস্মিত হয়ে বললাম, কোন্টা সত্য ? কী বলতে চাও তুমি ? এ কাহিনী যদি মিথ্যা না হয়--

কাহিনী আমার মিথ্যা নয়। শেষটুকু শুধু বাকী আছে। তাই বলেই আজকের মতো বিদায় নেব।

আমি অপেক্ষা করে রইলাম। ব্রহ্মচারী একটু কী চিন্তা করে ধীরে ধীরে শুরু করল : সাধারণভাবে বলতে গেলে নির্দোষ কথাটার

অর্থ—যে দোষ করে নি। আইনের চোখেও তাই। অপরাধ মানে কোনো অপরাধমূলক কাজ। কিন্তু মনুষ্যত্বের দরবারে এইটাই কি দোষ-বিচারের মাপকাঠি? দোষ বলুন, অপরাধ বলুন, তার জন্ম আমার মনের মধ্যে। তাই যদি হয়, যে মুহূর্তে সে জন্মাল, তখন থেকেই কি আমি অপরাধী নই? অপরাধটা আমার কাজের মধ্যে দেখা দেয় নি বলেই সে নেই, দোষের কাজ করি নি বলেই আমি নির্দোষ, তা কেমন করে বলি?

বললাম, তত্ত্ব হিসাবে কথাটা মন্দ লাগছে না, যদিও বেশ জটিল। ও-সব রেখে বরং আসল ব্যাপারটা খুলে বলো।

তাই বলব। শুধু একটা দিনের কথা। আমার জীবনের সেই মহাপরীক্ষার দিন।

প্রাতঃস্নান আমার চিরদিনের অভ্যাস। সেদিন একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি কাপড়-গামছা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছি, উঠনের কোণে নজর পড়তেই চমকে উঠলাম। কুয়োতলায় বাসন মাজছিল একটি মেয়ে। কখনও দেখি নি, তবু তার দেহের প্রতিটি রেখা যেন আমার চিরজীবনের চেনা। মুখ থেকে আপনা হতেই বেরিয়ে গেল—কে তুমি!

আমার নাম ময়না।

কার মেয়ে তুমি?

আমার মায়ের নাম চণ্ডী দেবী।

মায়ের সঙ্গে মেয়ের মিল খুব বেশী নয়। সে রঙ পায় নি, সে গড়ন, সে রূপও পায় নি। তবু সব মিলিয়ে কী ছিল তার দেহে বলতে পারব না। হঠাৎ যেন বাইশ বছর আগে ফিরে গেলাম। বিদ্যুৎ-

ঝলকের মতো আমার সমস্ত চেতনার মধ্যে জ্বলে উঠল এমনই আর একটা মুহূর্ত—যেদিন প্রথম দেখেছিলাম ওর মাকে। সেদিনের কথা আপনাকে আগেই বলেছি। নারীদেহের যে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম সেই প্রথম দিন, যে প্রবৃত্তির তাড়না, তারই তাণ্ডবে মেতে উঠল আমার পঁয়তাল্লিশ বছরের শীতল রক্ত। তারই জ্বালা বোধ হয় ফুটে উঠেছিল আমার চোখের মধ্যে। সেদিকে একবার তাকিয়েই অস্ফুট চিৎকার করে সরে গিয়েছিল মেয়েটা। নিজেকে কোনোমতে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। দরজার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল করালী। আমাকে দেখেই হেসে উঠল তার সেই পৈশাচিক হাসি—কি গো ব্রহ্মচারী, নির্জন বাড়িতে কোন্ ধর্ম-চর্চা হচ্ছিল ওই মেয়েটাকে নিয়ে? চিৎকার করে বলতে গিয়েছিলাম, চুপ করো। পারি নি; জোর পাই নি মনের মধ্যে। হঠাৎ হাসি থামিয়ে আমার মুখের উপর তর্জনী তুলে গর্জে উঠেছিল লোকটা—বলো, টাকা দেবে কি না? সমস্ত শক্তি দিয়ে বলেছিলাম, না। তারপর কোনো দিকে না চেয়ে ছুটে চলে গিয়েছিলাম গঙ্গার ঘাটে।

ব্রহ্মচারীর উত্তেজিত কণ্ঠ আবার নীরব হল। কয়েক মিনিট বিরতির পর শুনতে পেলাম তার নিরুত্তাপ ধীর স্বর: তার পরের ঘটনা তো আপনি জানেন। জল থেকে উঠতেই আমাকে গ্রেপ্তার করলেন থানা-অফিসার। প্রতিবাদ করি নি। ওদের সেই ভয়ঙ্কর অভিযোগও অস্বীকার করতে পারি নি।

কেন? সে অভিযোগ তো সত্য নয়।

না, তা নয়। যে অপরাধে জড়িত হলাম, যে অপরাধ আমার সাব্যস্ত হল আদালতের বিচারে, তা আমি করি নি—

তবে?

তবু, নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে কেমন করে বলি আমি নির্দোষ!

পাঁচ

সোমবার। সাপ্তাহিক জেল-টহলের দীর্ঘ প্রোগ্রাম ঘাড়ে নিয়ে সদলবলে শুরু করেছি পরিক্রমা। এক ওয়ার্ড থেকে আরেক ওয়ার্ড ঘুরছি, আর শুনে চলেছি কয়েদী বাহিনীর হরেক রকম অভিযোগ। কার পৈতৃক সম্পত্তি জোর করে দখল করেছে কোনো দুর্দান্ত জোতদার, প্রতিকার চাই; কে ছ মাস ধরে বাড়ির খবর পায় নি, জানতে চায় কেমন আছে রুগ্না স্ত্রী আর অসহায় অপোগণ্ডের দল; কে হাসপাতালে যেতে চেয়েছিল কাল পেটের ব্যথার 'দাওয়াই' খেতে, মেট নিয়ে যায় নি, বলেছে আগে দেখা কোনখানে তোর দরদ, তারপর বোঝা যাবে।······

ছোকরা-ব্যারাক শেষ করে ফিমেল ওয়ার্ড অর্থাৎ জেনানা ফাটকের গেটের সামনে গিয়ে প্রসেশন থেমে গেল। কপাটের গায়ে ঝুলছে একটা সরু দড়ি। টানতেই ভিতরে বেজে উঠল মিষ্টি ঘণ্টার আওয়াজ। দরজা খুলে সেলাম জানাল ফিমেল ওয়ার্ডার। সিপাই বাহিনী রইল বাইরে। উপর মহলের অফিসারদের নিয়ে ঢুকে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল মেট্রনের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ: এস্কাট আটেনশন। কোনো কালে হয়তো কোনো গ্রাম্য পাঠশালায় মাস কয়েক শ্লেট হাতে যাতায়াত করেছিল গিরিবালা মেট্রন' Squad Attention! এতবড় একটা কটমট বিলাতি কমাণ্ড তার মুখে আসবার কথা নয়। জেলের তরফ থেকে তাতে কোনো লোকসান

হয় নি। কাজ ঠিকই চলে যায়। মানে না বুঝলেও ঐ অভিনব পেটেন্ট বুলি কানে যাওয়া মাত্র সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে মেয়ে-কয়েদীর দল। আজও তারা একই সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। তারপর 'নালিশ' জানাবার পালা। একটি প্রৌঢ়া কয়েদী এগিয়ে দিল একখানা পোস্টকার্ডের চিঠি। বললাম, কী চাই তোমার ?

—পড়ে দেখুন বাবা। বড্ড কষ্ট হচ্ছে ছেলেটার। পরের বাড়িতে ফেলে এসেছি। দেখবার কেউ নেই। আপনি মা-বাপ। দয়া করে হুকুম দিলে কাছে এনে রাখতে পারি। আমার যে খাবার তাই মায়ে-পোয়ে ভাগ করে খাব।

বললাম, তোমাকে তো আগেই বলেছি, সাত-আট বছরের ছেলে জেলখানায় রাখবার আইন নেই; ছ বছর পর্যন্ত যাদের বয়স, তারাই শুধু থাকতে পারে মায়ের সঙ্গে।

মেয়েটি আর কিছু বলল বলল না। দাঁড়িয়ে রইল মাথা নিচু করে। আড় চোখে তাকিয়ে দেখলাম দু চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা। নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম। লাইনের শেষে অনেকটা যেন তাচ্ছিল্যভরে দাঁড়িয়ে আছে একটি তরুণী। রূপ আছে, কিন্তু বিদায় নিয়ে গেছে লাবণ্য। রূঢ় কঠিন মুখের উপর দুটি রুক্ষ ক্লান্ত চোখ। দেখে হঠাৎ মনে হবে, সংসারের যে একটা কোমল দিক আছে, যাকে আমরা বলি দয়া মায়া স্নেহ প্রেম, সে সব যেন সে জানে না কিংবা ভুলে গেছে। একখানা প্রাণহীন পাথরের মূর্তি, যার কোথাও নেই এতটুকু স্নিগ্ধতার স্পর্শ। কৌতূহলহীন শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকাল আমার দিকে। 'কাল এসেছে সেসন কোর্ট থেকে—' বললেন আমার আমদানী সেরেস্তার ডেপুটি জেলর।

জিজ্ঞাসা করলাম, কী নাম তোমার?

মামুলি প্রশ্ন, নবাগত সবাইকে যা করে থাকি। নিতান্ত অবহেলা ভরে হাতের টিকেটখানা বাড়িয়ে ধরে বলল, পড়ে দেখুন না? শুধু নাম কেন, আরো অনেক কিছু পাবেন।

আমার অফিসার মহলে একটা চাপা চাঞ্চল্য দেখা দিল। একজন সাধারণ কয়েদীর মুখ থেকে এই জাতীয় উদ্ধত উত্তরে তাঁরা অভ্যস্ত নন। ডিসিপ্লিন রক্ষার তাগিদে আমারও কঠোর রকমের কিছু একটা করণীয় ছিল। সে দিক থেকে ত্রুটি হল। কোনো 'অ্যাকশন' না নিয়ে টিকেটখানাই শুধু তুলে নিলাম ওর হাত থেকে। চোখ বুলিয়ে দেখলাম, নাম—জ্ঞানদা মল্লিক। ঘরে আগুন দেবার অপরাধে চার বছরের জেল দিয়েছেন সেসন জজ। অজ্ঞাতসারে আর-একবার চোখ পড়ল ওর মুখের দিকে। হঠাৎ মনে হল, নিজের হাতে যে আগুন সে জ্বেলেছে, তার চেয়েও হয়তো কোনো প্রচণ্ড আগুন অদৃশ্য হয়ে ছিল তার বুকের মধ্যে; যার খবর কেউ পায় নি, জজ সাহেবও জানতে চান নি।

টিকেটখানা ফিরিয়ে দিতেই একটা বাঁকা হাসির রেখা ফুটে উঠল ওর পাতলা ঠোঁটের কোণে। তার সঙ্গে শ্লেষ মিশিয়ে বলল, জানতে চাইলেন না আগুন দিয়েছিলাম কেন? কাকে পুড়িয়ে মেরেছি?

এহেন অদ্ভুত প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। তবু বিস্ময়ের ভাব চেপে রেখে বললাম, বলতে চাও সে কথা?

—আপত্তি কী? কতবার তো বললাম। বলে বলে মুখস্থ হয়ে গেছে। প্রথমে পাড়ার লোকের কাছে, তারপর পুলিশের দারোগা, উকিলবাবু আর ছোট হাকিম; শেষটায় জজ সাহেব। সবাইকে

বলেছি। একবার নয়, অনেক বার। চান তো আপনাকেও শোনাতে পারি।

বললাম, আমি শুনতে চাই না। তুমি কী ছিলে বা কী করেছ, তা দিয়ে আমাদের দরকার নেই। তোমাকেও তাই বলি। সে সব কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করো।

জ্ঞানদার ওষ্ঠের কোণে সেই কুঞ্চন-রেখাটা হঠাৎ মিলিয়ে গেল। চোখের তারায় ফুটে উঠল বিস্ময় কিংবা ঐ-জাতীয় অন্য কিছু। আমার এ উত্তর হয়তো সে প্রত্যাশা করে নি।

কয়েকদিন পরেই জজ সাহেবের রায়ের নকল এসে গেল। অন্য সকলের মতো জ্ঞানদাকেও প্রশ্ন করা হয়েছিল— আপীল করবে কিনা। আঙুল দিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী ছাড়া আর কোনো জবাব পাওয়া যায় নি। তবু যদি কদিন পরে আবার মত বদলায়, এই ভেবে আমার ডেপুটি জেলর নথিপত্রগুলো আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তার ভিতর থেকে কাহিনী যা পাওয়া গেল তা যেমন সরল তেমনি সংক্ষিপ্ত।

বছর পনেরো বয়সে বিয়ে হয়েছিল জ্ঞানদার। বাপ মারা গেছেন তার অনেক আগে। বিধবা মায়ের কী একটা দুর্নাম ছিল। প্রতিবেশীদের আনুকূল্যে সেই খবরটা পল্লবিত হয়ে যখন তার শ্বশুর-বাড়ি গিয়ে পৌঁছল, তারপর আর সেখানে তার ডাক পড়ে নি। স্বামী দেবতাটি কদিন পরেই আর-একজনের কপালে সিঁদুর দিয়ে নির্বিবাদে ঘর-সংসার শুরু করেছেন, এ খবর যথাসময়ে পাওয়া গিয়েছিল। তারপরেও অপেক্ষা করে বসে ছিল জ্ঞানদা। কিন্তু তার আসন্ন

যৌবন অপেক্ষা করল না, এবং সেদিকে চেয়ে আশেপাশের মাংসভুক পতঙ্গের দলে চাঞ্চল্য দেখা দিল। সামান্য দু-চার বিঘা ধানের জমি এবং অন্যান্য সম্বল যা ছিল, বরপক্ষের দাবি মেটাতেই তার প্রায় সবটাই উড়ে গিয়েছিল। যা রইল তা দিয়ে দুটি মানুষের পেট চলে না।

এক মুদীর দোকান থেকে ধারে জিনিস আসত। তার পরিমাণ বেড়ে বেড়ে এমন একটা অঙ্কে গিয়ে দাঁড়াল, যা শোধ দেওয়া ওদের পক্ষে কোনো কালেই সম্ভব নয়। সে জন্যে মেয়ের ভাবনার অন্ত ছিল না, কিন্তু মাকে বিশেষ চিন্তিত বলে মনে হত না। কারণটা জ্ঞানদা তখনও বুঝতে পারে নি। বুঝল সেইদিন, যেদিন মুদী-পুত্রের তরফ থেকে তার দেহের দুয়ারে এল সেই ঋণ পরিশোধের দাবি। প্রথমটা ফণা তুলে উঠেছিল, কিন্তু মিইয়ে যেতেও দেরি হয় নি, যখন দেখল, সে দাবির পেছনে রয়েছে মায়ের সমর্থন। শুধু সমর্থন নয়; প্রশ্রয়। জ্ঞানদারা উচ্চবর্ণ, মুদী নীচু জাত। তার পক্ষে ভদ্রপল্লীতে আনাগোনা করা নিরাপদ ছিল না। সুতরাং জ্ঞানদাকেই যেতে হত নৈশ অভিসারে। লোকালয় থেকে খানিকটা দূরে একটা বাগান-বাড়ির নির্জন ঘরে মুদীটি বসে থাকত মিলনের অপেক্ষায়।

লোকটা মুদী হলেও হৃদয়টা ছিল উদার। নারী-মাংসের স্বাদ একা একা উপভোগ করে বেশিদিন তৃপ্তি পেল না। জুটিয়ে ফেলল দু-চারটি বন্ধুবেশী ভাগীদার। কিন্তু জ্ঞানদা এমন বেঁকে বসল যে বহু চেষ্টা করেও তাকে বন্ধুদের আসরে নামানো গেল না। মুদী দমবার পাত্র নয়। শুরু হল পীড়ন ও লাঞ্ছনা। ক্রমে সংসার অচল হয়ে দাঁড়াল, মা চঞ্চল হয়ে উঠলেন, কিন্তু জ্ঞানদা রইল অটল। চরম

দিন এল এক শীতের রাতে। তার দুদিন আগে থেকেই চলেছে উপবাস, তার সঙ্গে মায়ের অকথ্য গঞ্জনা। শেষ পর্যন্ত রাজী হল জ্ঞানদা। খবর পাঠাল মুদী-পুত্রের কাছে, রাত বারোটা নাগাদ বাগানবাড়িতে যাচ্ছি। দয়া করে আজকার রাতটা একাই থেকো। কাল থেকে তোমার বন্ধুরাও থাকবে।

মুদীর আনন্দ আর ধরে না। মাত্রাটা বোধহয় একটু বেশি হয়ে পড়েছিল। রাত তিনটের সময় সুযোগ বুঝে পাশ থেকে ধীরে ধীরে উঠে গেল জ্ঞানদা। আঁচলের তলার লুকিয়ে এনেছিল এক বোতল কেরোসিন, আর একরাশ ছেঁড়া ন্যাকড়া। প্রণয়ীর পকেট থেকে সন্তর্পণে তুলে নিল দেশলাই। তারপর নিঃশব্দে বাইরে এসে দরজার শিকল তুলে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিল জ্বলন্ত কাপড়ের টুকরা। দাউ দাউ করে সেগুলো যখন জ্বলে উঠল, জ্ঞানদার মনে হল, এই আগুনটাই বোধহয় এতকাল চাপা ছিল তার বুক জুড়ে। আজ বাইরে আসতেই নিবে গেল তার অন্তরের জ্বালা। তার পরেই এল মরণাহতের অন্তিম চীৎকার—কে আছ, বাঁচাও। হঠাৎ কোথা থেকে তার সমস্ত দেহ জুড়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহের মতো ছুটে এল একরাশ ভয়। দু হাতে কান ঢেকে ছুটে চলল জ্ঞানদা। নিজের ঘরে পৌঁছতে না পৌঁছতেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝের উপর।

দিনের পর দিন নানা রকম রিপোর্ট আসতে লাগল জ্ঞানদার নামে। কাউকে মানে না। কাজকর্ম যখন খুশি করে, বেশির ভাগই করে না। বলতে গেলে শুনিয়ে দেয় কড়া কথা। মেট্রনকে যখন তখন অপমান করে বসে। সহবন্দিনীরা বোঝাতে এলে নিঃশব্দে চলে যায়

সেখান থেকে, নয়তো ঝাঁঝিয়ে ওঠে, নিজের চরকায় তেল দাও গে। বিচারের জন্যে আমার সামনে যখন হাজির করেন জেলর সাহেব, কোনো প্রশ্নেরই জবাব দেয় না, পীড়াপীড়ি করলে বিরক্তির সুরে বলে ওঠে, আমি আবার কী বলব, ওদের কাছেই তো শুনলেন সব।

একদিন বোঝাতে চেষ্টা করলাম, আর পাঁচজন যেমন চলছে, তেমনি করে চলবার চেষ্টা করো। যারা ভালোভাবে থাকে, নিয়মমতো কাজকর্ম করে, মেয়াদ শেষ হবার অনেক আগেই তারা বেরিয়ে যায়।

কথার মাঝখানেই এল অসহিষ্ণু জবাব—উঃ! আর কত বক্তৃতা করবেন! ও সব রেখে শাস্তি-টাস্তি যা দেবার দিয়ে দিন। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।

এর পরেই আর-একটা কী গুরুতর অপরাধে বেশ কিছুদিনের জন্যে তাকে সেল-এ বন্ধ করতে হল, আমাদের শাস্ত্রে যাকে বলে solitary confinement.

পরের সপ্তাহে অন্য সব মেয়েদের 'ফাইল' পরিদর্শন শেষ করে জ্ঞানদার ছোট্ট নির্জন ঘরটির সামনে গিয়ে যখন থামলাম, জেলের নিয়মমতো তৎক্ষণাৎ তার উঠে দাঁড়াবার কথা। সে ধার দিয়েও গেল না। যেমন ছিল, তেমনি বসে রইল দেয়ালে হেলান দিয়ে। একবার তুলেই নামিয়ে নিল রুক্ষ চোখ দুটো, কপালে দেখা দিল বিরক্তির কুঞ্চন। মিনিট খানেক অপেক্ষা করে বললাম, বই-টই পড়বে?

সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের সুরে বলল, ঠাট্টা করছেন নাকি?

—হচ্ছে কী জ্ঞানদা? ধমকে উঠল মেট্রন। কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলল, হয় নি কিছুই। জানতে চাইছিলাম, 'রিপোর্ট' হলে বই

পড়তে দেওয়া হয় না, এই নাকি আইন। দেখছিও তাই। তাহলে এ কথা জিজ্ঞেস করার মানে কী?

কথাটা মিথ্যা নয়। জেল-লাইব্রেরি কিংবা আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বই পেতে পারে তারাই যাদের স্বভাব ও চালচলন নির্দোষ। কারা-অপরাধে যারা শাস্তি ভোগ করছে, বই পড়বার সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত।

জ্ঞানদার প্রশ্নের উত্তরে বললাম, আমি জানতে চাইছিলাম, তুমি পড়তে চাও কি না। বই দেওয়া হবে কি না হবে, সেটা আমি বুঝব।

—বেশ, দিতে পারেন, নিতান্ত উদাসীন সুরে বলল জ্ঞানদা।

—কী বই পড়বে?

—কী বই আবার! গল্প-টল্প থাকলে দেবেন পাঠিয়ে। আপনাদের ঐ সব ধর্মকথা আর পঞ্চাশ গণ্ডা উপদেশ আমার ভালো লাগে না।

সেটা ছিল লীগ সরকারের আমল। জেল-লাইব্রেরির বই নির্বাচনেও 'রেশিও' মেনে চলতে হত। ফিফটি-ফিফটি। গল্পের বই বলতে যা পড়ে ছিল আলমারির কোণে তার মধ্যে বেশির ভাগই 'ছোলতান ছায়েবের কেরামতি' কিংবা 'লায়লা বিবির কেচ্ছা'। সে সব ও পড়বে না। খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম একখণ্ড শ্রীম-কথিত কথামৃত। কী মনে হল। ঐখানাই দিলাম পাঠিয়ে।

সপ্তাহান্তে আবার যখন গেলাম ওদের ওয়ার্ডে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই কলকণ্ঠে বলে উঠল জ্ঞানদা, খু-ব বই পাঠিয়েছিলেন যা হোক! ঐ বুঝি আপনার গল্পের বই? সেদিনই তো বললাম,

ও-সব ধর্মের বুলি আমার সহ্য হয় না। ও ছাই আমি খুলিও নি। ঐ পড়ে আছে; নিয়ে যেতে পারেন। দিতে চান তো একটা নবেল-টবেল দেবেন। ঐ 'ছোট জমাদারনী' যা পড়ে।

'ছোট জমাদারনী' আমার জুনিয়ার ফিমেল ওয়ার্ডার। তার বয়স তিরিশের নীচে। মেয়ে-স্কুলে ক্লাশ সেভেন না এইট পর্যন্ত পড়েছিল বোধ হয়। ডিউটিতে যখন আসে, স্কার্টের তলায় লুকিয়ে আনে, হয় কোনো লোমহর্ষণ ডিটেকটিভ উপন্যাস, নয় তো কোনো আধুনিক লেখকের চিত্তহরণ প্রেমের গল্প। নাম শুনলেই রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। 'প্রণয়-কণ্টক', 'পরিণয়-জ্বালা' কিংবা 'সচিত্র যৌবন-ফোয়ারা'। প্রাণমাতানো প্রচ্ছদপট। একটি হাবাগোবা গোবর-গণেশ উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের পাশে স্বল্পবসনা চটুলনয়না সুন্দরী যুবতী! সেই সব বই পড়ে ছোট জমাদারনী। জেল লাইব্রেরি তার কদর বোঝে না। তাই অগত্যা কথামৃতের পক্ষেই ওকালতি শুরু করলাম। বললাম, নাম দেখেই ভয় পাচ্ছ কেন? ওটাও গল্পের বই। অনেক মজার মজার কথা আছে। পড়েই দেখো না একবার?

জ্ঞানদা আর কথা বাড়াল না। ভাব দেখে মনে হল, আমার ওকালতির সবটুকুই বোধ হয় মাঠে মারা গেল।

পরের সপ্তাহে কী কারণে রাউণ্ডে যাওয়া হল না। দিন পনেরো পরে আবার যখন দেখা হল ওর সঙ্গে, মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে নিতে ভুলে গেলাম। কোনো সোনার কাঠির মায়াস্পর্শে যেন রাতারাতি বদলে গেছে জ্ঞানদা। সে উগ্রতা নেই, তার জায়গায় এসেছে একটি কোমল শ্রী। সে লজ্জাহীন প্রগলভতা নেই; দু-চোখভরা লাজনম্র মধুর সঙ্কোচ। জড়সড় হয়ে দাঁড়াল আমার বিস্ময়-

মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে। দু গণ্ডে ছড়িয়ে গেল এক ঝলক রক্তিমাভা। মৃদু হেসে সিগ্ধকণ্ঠে বলল, দরজাটা একটু খুলতে বলুন না?

মোটা মোটা গরাদে দেওয়া ভারী দরজাটা খুলে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ-বেগে এগিয়ে এসে আমার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল মেট্রন আর ফিমেল ওয়ার্ডার। মেয়েমানুষ হলেও খুনী তো। কী জানি কী করে বসে! মাথা নত করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল জ্ঞানদা। গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করল আমার পায়ের কাছটিতে। অস্ফুট মৃদু কণ্ঠে যেন আপন মনে বলল, 'আজ ভারী ভালো লাগছে মনটা।' কপালের উপর থেকে রুক্ষ চুলগুলো সরিয়ে আমার মুখের দিকে আয়ত চোখ মেলে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, এসব কি সত্যি? এমনি ছিলেন ঠাকুর? এমনি আত্মভোলা সরল সদাশিব! এমন সুন্দর কথা সত্যিই বলে গেছেন তিনি?'

এগুলো হয়তো প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলেও, উত্তর সে চেয়েছিল তার নিজেরই মনের কাছে। আমি উপলক্ষ মাত্র। তাই চুপ করেই রইলাম। আমার পরিষদ-দলেও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কেটে যাবার পর বললাম, বইটা তাহলে ভালো লেগেছে তোমার?

এ কথার আর উত্তর এল না, শুধু চোখ দুটো বুজে এল, মুখের উপর ছড়িল পড়ল একটি তৃপ্তিময় মৃদু হাসি। কয়েক মুহূর্ত তেমনি তন্ময় ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে ফিরে গেল তার সেলের মধ্যে। -

কয়েকদিন পরে আবার এক রিপোর্ট এল জ্ঞানদা মল্লিকের নামে। গিরিবালাকে ডেকে পাঠিয়ে জানতে চাইলাম, কী ব্যাপার?

বলল, পনেরো দিন পেরিয়ে গেছে বলে কেরানীবাবু বইটা ফেরত চেয়েছিলেন। হুকুম শোনা দূরে থাক, উলটো দশ কথা শুনিয়ে দিয়ে বলেছে, ইচ্ছে হয়, রিপোর্ট করুন গে। আমার যা বলবার আমি বড় সাহেবের কাছেই বলব।

গিরিবালা বেচারীর জন্যে দুঃখ হল। এ রকম চীজ বোধ হয় একটিও জোটে নি তার এতবড় মেট্রন-জন্মে। অথচ কী করা যায়! বললাম, না দিতে চায় থাক না! ওকে ঘাঁটিয়ে কী লাভ? কেরানী-বাবুকে ডেকে আমিই বরং বলে দেব।

বলা বাহুল্য, এই উলটো বিচার মেট্রনের মনঃপূত হল না। তার গম্ভীর মুখ এবং দ্রুত প্রস্থানের ভঙ্গী দেখেই তা বোঝা গেল।

জ্ঞানদার তরফেও অভিযোগ ছিল। সেদিন দেখা হল ওর সেলের দরজায়। যেতেই বলে উঠল, আপনার ঐ কেরানীবাবুটিকে একটু ধমকে দেবেন তো। যখন তখন বলে পাঠায় ঐটুকু বই শেষ করতে কদিন লাগে? শুনুন কথা! এ বই যে কোনোদিন শেষ হয় না, সে কথা ওকে বোঝাই কেমন করে?

ঐ জেলের মেয়াদ আমার শেষ হয়ে এসেছিল। আবার কোথায় গিয়ে ছাউনি ফেলতে হবে, সেই প্রতীক্ষায় দিন গুনছিলাম। হঠাৎ এল সেই অমোঘ আদেশ। শেষ বারের মতো যখন ঢুকলাম জেনানা ফাটকের গেটে, তার অনেক আগেই জ্ঞানদার সেলের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই নিরালা ছোট্ট কুঠরির মায়া ও ছাড়তে চায় নি। মেট্রনকে বলেকয়ে ইচ্ছা করেই বেছে নিয়েছিল নির্জন-বাস। আমাকে দেখে বেরিয়ে এসে প্রণাম করল সেই দিনকার মতো। শুধু

মাটিতে মাথা ঠেকানো নয়, কম্পমান কোমল হাতে তুলে নিল পায়ের ধুলো। উঠে দাঁড়াতেই নজরে পড়ল থমথম করছে মুখ, চোখ দুটো ফুলো-ফুলো; তার কোণে শুকিয়ে আছে জলের রেখা; বোধহয় মুছতে ভুলে গেছে। হঠাৎ বলে উঠল অশ্রুরুদ্ধ করুণ কণ্ঠে, এবার যে ওরা আমার কথামৃত কেড়ে নিয়ে যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে ঝরঝর করে ঝরে পড়ল চোখের জল। যদ্দূর সম্ভব সহজ সুরেই বললাম, নিলেই বা? তার জায়গায় দুখানা নতুন বই পেয়ে যাচ্ছ তুমি। সেগুলো তোমার। কোনোদিন কেউ ফেরত চাইবে না।

—সত্যি! সিক্ত চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল জ্ঞানদার। তারপর বলল, অনেক দয়া করেছেন, অনেক স্নেহ পেয়েছি আপনার কাছে। শেষবারের মতো আর একটা জিনিস চাইব।······দেবেন তো?

—কী জিনিস, বলো।

—ওদের একটু সরে যেতে বলুন।

হাতের ইসারায় অনুচরদের সরিয়ে দিলাম। জ্ঞানদা এগিয়ে এল আমার একান্ত কাছটিতে। ফিসফিস করে বলল, একখানা ঠাকুরের ছবি।

তখনকার জেলের আইনে কয়েদীর পক্ষে কোনো ছবি বা ফোটোগ্রাফ রাখা নিষিদ্ধ। আইন রক্ষার ভার কাঁধে নিয়ে নিজের হাতে তা ভঙ্গ করি কেমন করে? কিন্তু এদিকে যে দুটি সজল চোখ আমার পানে চেয়ে অধীর প্রতীক্ষায় উন্মুখ, তাদের সে কথা বোঝানো যায় না। তার প্রয়োজনও হল না। হঠাৎ কখন আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, দেব।

তারপর দিন জ্ঞানদার কোনো এক কল্পিত আত্মীয়ের তরফ থেকে দুখণ্ড কথামৃত ওর নামে জমা দেওয়া হল। তার মধ্যে লুকানো রইল একখানা ঠাকুরের ছবি।

জ্ঞানদার কাহিনী এইখানেই শেষ হল। এর পরের অংশটুকু আমার। আমারই এক লজ্জার কাহিনী।

সেই দিন থেকে বছরের পর বছর এক জেল থেকে আরেক জেলে ঘুরেছি। মঠে মন্দিরে গৃহস্থের পূজার ঘরে যখনই যেখানে চোখে পড়েছে ঠাকুরের কোনো ছবি, তার পাশটিতে ফুটে উঠত একখানা অশ্রুলাঞ্ছিত নারীর মুখ। লজ্জায় অপরাধে ক্ষোভে অনুশোচনায় সমস্ত অন্তর আমার ভরে যেত। এ আমার কী হল। পরমহংসের পাশে পাপীয়সী! কাকে বলি আমার এ অধঃপতনের ইতিহাস? হঠাৎ একদিন মনে হল, একজনকে বলা যায়। তাই বললাম। হে ঠাকুর, ভুলিয়ে দাও, ঐ মেয়েটার মুখখানা আমাকে ভুলিয়ে দাও।

তারপর একদিন সত্যিই ভুলে গেলাম। আজ বহু চেষ্টা করেও সে মুখ আর মনে আনতে পারি না।

সমাপ্ত